২৪ গণঅভ্যুত্থান ইতিহাসের প্রামাণ্য সংকলন

শহীদদের শেষ মুহূর্তগুলো

১ম খণ্ড

ধারণা, নির্দেশনা ও সংকলন

ড. মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন
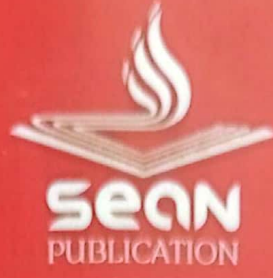
আমরা বই পড়ি কেন? জানার জন্য। নিজেদের জানা, এ পৃথিবীকে জানা, আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে জানা। জ্ঞানের উৎস সর্বজ্ঞ স্রষ্টা। এই জ্ঞানই সভ্যতাকে এগিয়ে নেয়, সমাজকে টিকিয়ে রাখে।

জ্ঞানের আধার বই। জ্ঞানচর্চা আমাদের ঐতিহ্য। কালের বিবর্তনে আজ তা হারিয়ে গেছে। তথ্য বিস্ফোরণে জ্ঞান আজ কোণঠাসা। শিক্ষার দৈন্যতায় অজ্ঞতার মহামারি। জ্ঞানার্জনে অনাগ্রহের পাশাপাশি বইয়ের দুর্বোধ্য ভাষা, মলিন প্রচ্ছদ আর জীর্ণ পৃষ্ঠা পাঠ অনাকাঙ্ক্ষাকে উসকে দেয়। গ্রন্থাকারাগারে বন্দি প্রকৃত জ্ঞান। জ্ঞানের নয়, চারদিকে আজ লঘু বিনোদনের জয়জয়কার।

সিয়ান পাবলিকেশনের স্বপ্ন বিশুদ্ধ জ্ঞানের উপস্থাপন। ধর্ম, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং অন্যান্য বিশেষায়িত ক্ষেত্রগুলোর জ্ঞান।

বিষয়বস্তু নির্বাচনে আমরা জীবনঘনিষ্ঠ এবং তথ্যসূত্রে প্রামাণ্য; আমাদের লক্ষ্য সাবলীল ভাষা এবং নান্দনিক উপস্থাপনা। সময়, শ্রম ও সম্পদ সাশ্রয়পূর্বক সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে যাওয়ার নিমিত্তে আমাদের রয়েছে ই-কমার্স সংযুক্তি www.seanpublication.com ক্লিকেই বই পৌঁছে যাবে আপনার ঘরে।

আমাদের বিশ্বাস, জ্ঞানের এ প্রসার আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে গভীর ও ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে ইনশাআল্লাহ।

মহান আল্লাহর নামে

যিনি পরম করুণাময়, মহান দয়ালু

২৪ গণঅভ্যুত্থান ইতিহাসের প্রামাণ্য সংকলন

শহীদদের শেষ মুহূর্তগুলো

২৪ গণঅভ্যুত্থান ইতিহাসের প্রামাণ্য সংকলন

শহীদদের শেষ মুহূর্তগুলো

ধারণা, নির্দেশনা ও সংকলন

ড. মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন

তথ্য সংগ্রহ ও সহ-লেখক

মোঃ কামরুজ্জামান

মোঃ নাহিদ হাসান সজীব

অন্তর সফিউল্লাহ

সম্পাদনা

আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

শহীদদের
শেষ মুহূর্তগুলো

ড. মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন

স্বত্ব: সংকলক

প্রচ্ছদ © সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ

শা'বান ১৪৪৬ হিজরি, ফেব্রুয়ারি ২০২৫

ISBN: 978-984-3921-06-2

MRP: ৪৮০৳ | $12

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

২য় তলা, ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

+৮৮ ০১৭৫ ৩৩৪৪ ৮১১

ইসলামে গ্রন্থস্বত্বের বিধান

গ্রন্থস্বত্ব ইসলামি শরিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। ইসলাম প্রত্যেক লেখকের রচিত সকল রচনাকে তার ব্যক্তিগত সম্পদ বলে ঘোষণা করেছে এবং এতৎসংশ্লিষ্ট সার্বিক অধিকারও তার জন্য সংরক্ষণ করেছে। পাশাপাশি কেউ যেন গ্রন্থস্বত্ব-আইন লঙ্ঘন করে তার সে-অধিকার হরণ কিংবা রহিত করতে না পারে, সে-নিশ্চয়তাও বিধান করেছে। ইসলামি শরিয়ার সকল দলিল-প্রমাণ ও মূলনীতি সে-প্রমাণই বহন করছে।

গ্রন্থ-রচনা গ্রন্থকারের নিজেরই বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমের ফসল ও অর্জন। এ-অর্জন একান্তভাবে তারই। তার অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ কোনোভাবেই তার এ-সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে না। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

> *কোনো মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ সে নিজে খুশিমনে প্রদান না করলে কারও জন্য কোনোভাবেই তা হালাল হবে না। [সহিহ আল-জামি আস-সাগির, হাদিস: ৭৬৬২]*

অতএব, গ্রন্থকারের অনুমতি ছাড়া তার রচিত গ্রন্থ হতে আংশিক বা পূর্ণ কপি করা, ছাপানো এবং তা বেচাকেনা করা ইসলামি শরিয়তে নিষিদ্ধ ও হারাম; কেননা তা অন্যায় উপার্জন ও ভক্ষণের শামিল। আল্লাহ ﷻ বলেন—

> *...তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না। [আল-কুরআন ০২:১৮৮]*

অধিকন্তু এটা শরিয়ার সীমালঙ্ঘন বলে গণ্য হবে বিধায় শরিয়তের নিষিদ্ধ কাজেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ ﷻ বলেন—

> *...তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না; কেননা আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। [আল-কুরআন ০৫: ৮৭]*

সূচিপত্র

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদ ও আহতদের আত্মত্যাগ লিপিবদ্ধকরণে সহযোগিতার আহ্বান

লোকবল ও অন্যান্য সীমাবদ্ধতার কারণে আমরা এই বইয়ে মাত্র ২৬ জন শহীদের অন্তিম মুহূর্ত লিপিবদ্ধ করতে পেরেছি। তবে শত শত শহীদ ও আহত—যারা অন্ধত্ব ও পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন—তাদের স্মৃতি সংরক্ষণে আমাদের গবেষণা ও ঐতিহাসিক ডকুমেন্টেশনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

এই মহতী উদ্যোগে শহীদ ও আহতদের পরিবার যুক্ত হলে আমাদের কাজ আরও সমৃদ্ধ হবে। যাঁরা শহীদদের অন্তিম মুহূর্তের প্রত্যক্ষদর্শী, তাঁরাও এই ইতিহাস সংরক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হতে পারেন। এছাড়া, গবেষণা ও ডকুমেন্টেশন কার্যক্রমের জন্য রিসোর্স সাপোর্ট (ফান্ডিংসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে) প্রদান করেও আপনিও এই মহৎ প্রয়াসের অংশ হতে পারেন।

জুলাই গণঅভ্যুত্থান গবেষণা টিম

বায়োমেডিকেল রিসার্চ ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ

যোগাযোগের জন্য:

মোবাইল: ০১৩৩৫৩৮৬৯৫৭(WhatsApp)

ইমেইল: julyrevolution36@gmail.com

এই বইটির নেপথ্যে কিছু কথা

৭ই জুলাই, ২০২৪। ক্লাসে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি এত কম কেন জানতে চাইলে তারা জবাব দেয়, 'স্যার, আজকে বাংলা ব্লকেড, ঢাকায় যানবাহন চলছে না।' যারা বসুন্ধরা ও আশেপাশের এলাকায় থাকে, তারাই শুধু ক্লাসে উপস্থিত ছিল। 'বাংলা ব্লকেড' কথাটা প্রথমবারের মতো শুনে ইউনিক লেগেছিল। সেদিন থেকেই মূলত ২০২৪ সালের কোটা আন্দোলন সম্পর্কে বাস্তবিকভাবে অবগত হতে শুরু করি। যদিও এর আগে এ বিষয়ে কিছু খবর দেখেছি, কিন্তু শিক্ষার্থীদের এবারের আন্দোলনের গভীরতা তখনো পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারিনি।

৫ই মে, ২০১২ সালে এক যুগের বেশি সময়ের প্রবাসী জীবন গুটিয়ে দেশে ফেরার পর থেকে তিনটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে (ব্র্যাক, আইইউবি এবং বিইউএইচএস) শিক্ষকতা করেছি। এখানে শিক্ষার্থীদের মাঝে সরকারি চাকরি, বিশেষত বিসিএসের প্রতি তেমন আগ্রহ দেখিনি। মানের দিক দিয়ে উপরের সারির বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রধান লক্ষ্য থাকে প্রবাসে পাড়ি জমানো। কেউ কেউ আবার বিজনেস বা কর্পোরেট জবে আগ্রহী। তাই প্রথমদিকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে কোটা সংস্কার আন্দোলন নিয়ে তেমন কোনো সাড়া দেখা যায়নি।

১৪ জুলাই দিবাগত রাত বারোটা। তখন ১৫ জুলাই মাত্র শুরু হয়েছে। ঘুমানোর আগে ফেসবুকে একটি ভিডিও দেখে রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে যাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মিছিল করছে—'তুমি কে, আমি কে? রাজাকার, রাজাকার।' 'রাজাকার' শব্দটি—যা বরাবরই অত্যন্ত ঘৃণিত এবং বিশেষত ইসলামপন্থীদের ট্যাগিং করতে ব্যবহৃত হতো—সেই শব্দটি শিক্ষার্থীরা প্রচণ্ড ক্ষোভে নিজেদের জন্যই ব্যবহার করছে! এটি আমার কাছে অভাবনীয় লেগেছিল। এরপর সেই রাতে আর ঘুমাতে পারিনি। ফেসবুকে মানুষের প্রতিক্রিয়া পড়তে থাকি এবং পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নিচ্ছে, তা অনুধাবন করার চেষ্টা করি। সেই মুহূর্ত থেকে কোটা আন্দোলনের গভীরতাকে উপলব্ধি করতে থাকি।

দীর্ঘ ফ্যাসিবাদী শাসনামলে হত্যা, গুম, খুন, এবং ভয়-ভীতির পরিবেশে গভীর হতাশায় নিমজ্জিত ছিলাম। ২০১৩ সালের ৫ই মে শাপলা চত্বরে ঘটে যাওয়া গণহত্যার পর থেকে দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক ঘটনার একজন সচেতন প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে উঠেছি। একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে একসময় সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছুটা রাজনৈতিক বিষয়ে লেখালেখি করতাম। তবে দিন দিন এটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে, যখন আমার ফেসবুক পোস্ট দেখে পরিবারের সদস্য এবং শুভাকাঙ্ক্ষীরা শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তারা বারবার আমাকে সাবধান করেছেন, যেন আমি সরকারের রোষানালে না পড়ি। শুভাকাঙ্ক্ষীরা বলতেন, 'তোমার কোনো রাজনৈতিক ব্যাকআপ নেই, তোমার কিছু হলে কেউ এগিয়ে আসবে না।' সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তারা আমাকে চুপ থাকার পরামর্শ দিতেন। এই কারণে আমাকে অনেক পোস্ট মুছে ফেলতে হয়েছে, লিখেও আর পোস্ট করা হয়নি।

ফ্যাসিবাদী শাসনামলের আতঙ্ক এবং দমবন্ধ পরিবেশ কেমন ছিল, তা বোঝাতে আমার একটি ঘটনা তুলে ধরছি। ২৭ আগস্ট ২০২২, সায়েন্টিফিক জার্নালে সাবমিট করা একটি পেপারের রিভিউয়ার ফিডব্যাক জানতে গিয়ে দেখি, তাদের সাইটে অ্যাক্সেস পাচ্ছি না। তখন জানলাম, জার্নালটি আমাকে এলজিবিটি (সমকামিতা) সংক্রান্ত একটি ফর্ম পূরণ করতে বাধ্য করছে। এই ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে ফেসবুকে একটি পোস্ট দিয়েছিলাম 'পৃথিবী আসলে কোন দিকে ধাবিত হচ্ছে'—এই টাইপের পোষ্ট। পোস্টটি ভাইরাল হলে নানা ইস্যু তৈরি হয়। এরপর থেকেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুরক্ষার তাগিদে এবং সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে এলজিবিটি/ট্রান্সজেন্ডারবাদের বিষয়ে সচেতনতা তৈরির জন্য ফেসবুকে নিয়মিত লেখালেখি শুরু করি।

২০২৩ সালের মার্চের প্রথম সপ্তাহে ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুকে কেন্দ্র করে ডিজিএফআই-এর পক্ষ থেকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। সেই মেসেজ পাওয়ার পর থেকেই এক ধরনের আতঙ্ক গ্রাস করে। ডিজিএফআই-এর এন্টি-টেরোরিজম বিভাগের একটি টিম ক্যাম্পাসে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। সেই দিন থেকেই আমি সরকারের কঠোর নজরদারির আওতায় চলে আসি।

২০২৪ সালের জানুয়ারী মাসে সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে শরীফার (ট্রান্সজেন্ডার) ইস্যুকে কেন্দ্র করে আমাকে 'জঙ্গি' তকমা দিয়ে চাকরিচ্যুত করার চেষ্টা করা হয় এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আসিফ মাহতাবকে বরখাস্ত করা হয়। এক প্রভাবশালী মন্ত্রীর চাপে আমাকে ৩ মাসের বেতন গ্রহণ করে পদত্যাগ করতে চাপ দেয় আইইউবি'র টপ ম্যানেজমেন্ট। নিরুপায় হয়ে ডিজিএফআই-এর সেই কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করি, যাকে ভালো মন-মানসিকতার মানুষ হিসেবে মনে হতো। অবশেষে তিনি আমাকে 'জঙ্গি' তকমা থেকে মুক্তি দিয়ে আইইউবি কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করেন। উল্লেখ্য যে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো স্বাধীন নয়; তারাও এক ধরনের চাপের মধ্যে কাজ করেন। খেয়াল করলে দেখবেন, যারা শুধুমাত্র বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক শিক্ষকতায় জড়িত, তাদেরকে মূলধারার মিডিয়াতে রাজনীতি সম্পর্কিত টক-শো'তে সচারাচর অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় না।

এমন আতংকের পরিবেশে অবচেতন মনে এক ধরনের চিন্তা ভীড় করত— অঘটনের মধ্য দিয়ে হলেও দেশে একটা ইতিবাচক পরিবর্তন আসুক। এ কারণে 'অঘটনের' প্রত্যাশায় সোশ্যাল মিডিয়ায় আপডেট নেয়া রীতিমত অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। এই সময়টাতে গণমাধ্যমের ওপর আস্থা আমার পুরোপুরি উঠে গিয়েছিল।

সেই ঢাবি ক্যাম্পাসের 'রাজাকার' শ্লোগানটি আমার মনোজগতে বিশাল তোলপাড় সৃষ্টি করে। কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রবাসী দুই ভাইকে তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাটি শেয়ার করে জানাই, দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হতে চলেছে। তারাও বিষয়টি শুনে বিস্মিত হয়। দেশের তথাকথিত 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'র সংস্কৃতি তৈরীর অন্যতম কারিগর প্রথম আলো পত্রিকার সাংবাদিক এবং বিশিষ্ট লেখক আনিসুল হক ঢাবির ক্যাম্পাসে রাজাকার শ্লোগান নিয়ে হতাশা ব্যক্ত করে ফেসবুক পোষ্ট দেন। আমি সেটির স্ক্রিনশট যুক্ত করে জবাবে রাতে পোষ্ট দিলাম (রাত ১২টা ৩৩ মিনিটে, ১৫ জুলাই ভোরে)।

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে একাত্মতা প্রকাশ করে ১৪ জুলাই রাত থেকে ১৮ জুলাই ইন্টারনেট বন্ধ হওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত জনপরিসরে নৈতিকতা জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচেষ্টা চালিয়েছি। বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে পেশাজীবীদেরকে শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছি। ফেসবুকে পোস্টগুলো লেখার সময় যে আবেগ কাজ করেছিল, তা এখন সেভাবে আর প্রতিলিপি (রেপ্লিকেট) তৈরী করা সম্ভব নয়।

তখনকার ভয়াবহ এবং শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি, বিশেষ করে ১৫ জুলাই থেকে শিক্ষার্থীদের ওপর বর্বরোচিত আক্রমণ এবং আবু সাঈদের শহীদ হওয়ার মর্মস্পর্শী ঘটনা, ভাষার মাধ্যমে পুরোপুরি তুলে ধরা সত্যিই কঠিন। ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে সেই সময়ের কিছু পোস্ট এই বইয়ে সংরক্ষিত করা হয়েছে। এসব পোস্টের মাধ্যমে পাঠকরাও হয়তো কিছুটা উপলব্ধি করতে পারবেন যে, এই গণঅভ্যুত্থানে শহীদদের নিয়ে ঐতিহাসিক ডকুমেন্টেশন করার ক্ষুদ্র প্রয়াস শুধুমাত্র তথ্যের সন্নিবেশ নয়; বরং এখানে লেখকের আবেগও গভীরভাবে মিশে আছে।

মেয়েদের গায়ে হাত তুললে তার ফল ভাল হয় না। তারা মা জাতি। সন্তানের মাধ্যমে ঘৃনা পরবর্তী জেনারেশনে স্থানান্তরিত হতে পারে। এরা আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, সহজে ভুলবে না। যারা মেয়েদের গায়ে হাত তুলেছে তাদের সামাজিক গ্রহনযোগ্যতা কমে যাবে, এটা নিশ্চিত। এখন সবার নামধাম পরিচয় ফেসবুকে চলে আসছে।
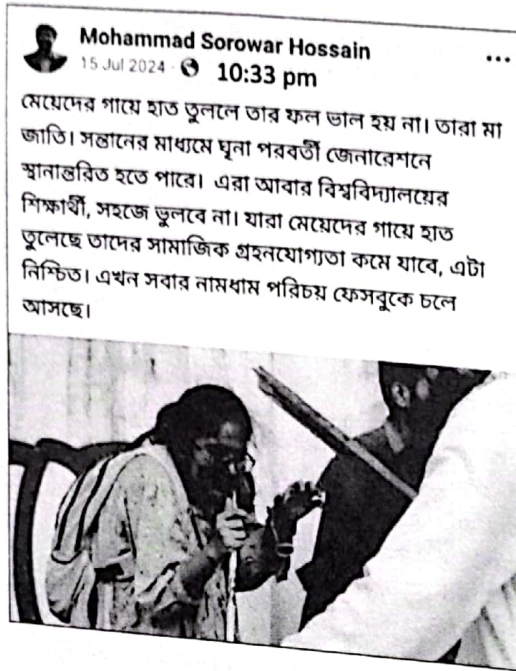
ছবি- স্ক্রিনশটের অডিও রেকর্ড QR Code স্ক্যান করে শুনা যাবে
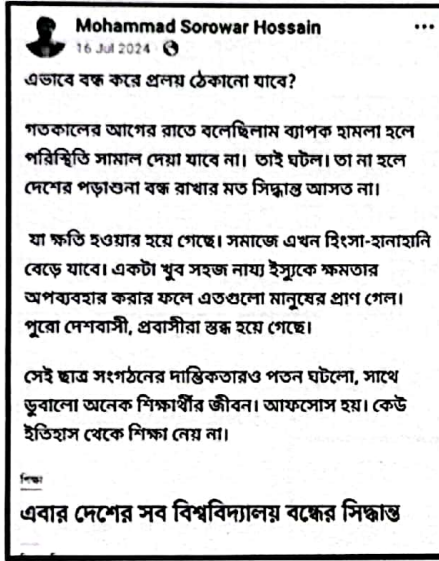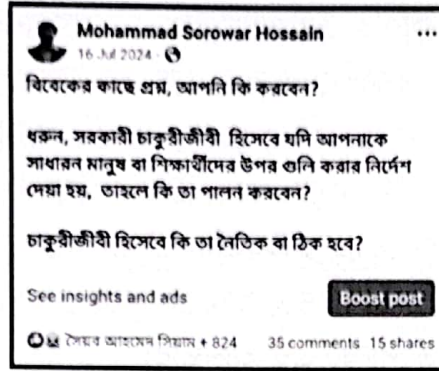
১৭ জুলাইয়ের রাতের মধ্যে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলগুলো বন্ধ করে শিক্ষার্থীদের জোরপূর্বক বের করে দেওয়া হয়। ১৮ জুলাই ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে এক রক্তাক্ত দিন। আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়েই যখন সন্দেহ তৈরি হয়, তখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহসী শিক্ষার্থীরা নিজেদের রক্ত এবং জীবন দিয়ে ঝিমিয়ে পড়া আন্দোলনকে পুনর্জীবিত করে।

সেই দিন দুপুর এগারোটা-বারোটার দিকে ডিজিএফআই-এর পক্ষ থেকে ফোন করে আমাকে সতর্ক করা হয়, আমি যেন শিক্ষার্থীদের সমর্থনে পোস্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকি। এতদ্‌সত্ত্বেও মানসিক ভয়কে পাশ কাটিয়ে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত লিখে গেছি।

যখন খবর আসল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নির্বিচারে গুলি খাচ্ছে, তখন আমার কর্মপ্রতিষ্ঠান আইইউবিতে সশরীরে গিয়ে টপ ম্যানেজমেন্টকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করি, যাতে আহত শিক্ষার্থীদের পাশে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দাঁড়ায়, যাতে চিকিৎসা এবং আইনি সহায়তা করে।

আসিফ মাহতাবের সঙ্গে বসুন্ধরা গেট-কুড়িল ফ্লাইওভারের নিচে অবস্থানরত নর্থ-সাউথ, আইইউবি আর এআইইউবি শিক্ষার্থীদের সমাবেশে সশরীরে যোগ দিতে বের হয়েছিলাম। এমন সময় কয়েকজন সহকর্মী বললেন, আপনি আড়ালে থাকেন, আপনি সরকারের টার্গেটে আছেন। দুপুর আড়াইটা-তিনটার দিকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আহত শিক্ষার্থীদের খোঁজে আইইউবির টিমের সঙ্গে যোগ দিতে রিকশায় উঠেছিলাম। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তারা ভয়ে আমাকে সঙ্গে নেয়নি—সরকার আইইউবির ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে, এই আশঙ্কায়।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে নিরুপায় হয়ে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ভয়েস বার্তা পাঠিয়ে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করলাম যেখানে ঢাবিসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র প্রফেসর, রিটায়ার্ড আর্মি পার্সন, এমনকি বর্তমান অর্থ উপদেষ্টাও (সালেহ উদ্দিন আহমেদ) ছিলেন। কোনো সাড়া না পেয়ে আসিফ মাহতাবের সঙ্গে আলাপচারিতায় আমরা দুজনে ফোনে কান্নায় ভেঙে পড়লাম। আসিফ আমার অজান্তে শিক্ষকদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পাঠানো আবেগঘন, কান্নারত ভয়েস রেকর্ড সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে দেয়।

ছবি- স্ক্রিনশটের অডিও রেকর্ড QR Code স্ক্যান করে শুনা যাবে

১৮ জুলাই শিক্ষকদের নির্লিপ্ততায় সন্ধ্যার দিকে এক ফেসবুক পোস্টে লিখেছিলাম, বই লিখে সব জানিয়ে দেব। সেই দায়বদ্ধতাও এই বই লেখার অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের পর ভিপিএন দিয়ে ফেসবুকের ইনবক্সে দেখলাম একটা মেসেজ। একজন শুভাকাঙ্ক্ষী (যিনি অপরিচিত ফেসবুক ফলোয়ার) ইনফর্মার জানালেন, ডিবি হারুন ও প্রদীপ কুমার আমাকে গ্রেপ্তার করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কেন আমার প্রতি তাদের এত ক্ষোভ, তা জানতে চাইলাম। সেই

ইনফর্মার ভাই ডিবি হারুনকে জিজ্ঞাসা করে আমাকে পরের দিন আবার মেসেজ দিলেন। আমি নাকি শিক্ষার্থীদের উসকানি দিয়েছি, এমনকি আন্দোলনে অর্থায়নও করেছি। এর প্রমাণ হিসেবে তাদের কাছে আমার ভয়েস রেকর্ড সংরক্ষিত আছে—ডিবি হারুন এই কথা জবাবে বলেছেন।

আসল কাহিনি হচ্ছে—ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের সময় গুলিবিদ্ধ এক আহত গরিব শিশু এবং হাসপাতালের মর্গে পড়ে থাকা এক রিকশাওয়ালার লাশকে বাড়ি পাঠাতে ২৯ হাজার টাকা দিয়েছিলাম। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আহতদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করছিল। ফোন ট্যাপের কারণে বিষয়টি ডিবি পুলিশের কানে পৌঁছে যায়।

সেই শুভাকাঙ্ক্ষী ইনফর্মার বললেন, ৮-১০ দিন আত্মগোপনে থাকতে এবং ফোনের সিম বন্ধ রাখতে। বাসা থেকে বের হওয়ার আগ মুহূর্তে স্ত্রীর ফোন থেকে আসিফ মাহতাবকে জানালাম, তাকেও হয়তো গ্রেপ্তার করা হবে। এর দুদিন পর আসিফ মাহতাবকে গ্রেপ্তার করে এবং রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করে।

আত্মগোপনের দিনগুলো খুবই দুঃসহ ছিল, খুবই অস্থিরতা কাজ করত, গিল্টি ফিলিংস হত। ছাত্র-জনতা মারা যাচ্ছে, আমি তো কিছুই করতে পারলাম না। যেদিন ফেসবুকের প্রোফাইল পিকচার লাল করার আহ্বান করা হলো, সেদিন সন্ধ্যায় আমার প্রোফাইল কিছুক্ষণের জন্য লাল ছিল। কিন্তু আমার জেন-জি বয়সী কন্যা এটা দেখে ডিলিট করে দেয়। অবশেষে মনকে শান্ত করতে আত্নগোপনের সময় উত্তরা সেক্টর-৫ এর এক মসজিদে জুম্মার সালাত (২ আগস্ট) আদায় করে আন্দোলনে শরিক হতে বের হয়েছিলাম আবু বক্কারের সাথে (জুনিয়র বন্ধু, যার বাসায় ৮ দিন ছিলাম)। দুজনে উত্তরা ১৩ নং সেক্টরে গরীবী নেওয়াজ রোড ধরে জমজম টাওয়ারের সামনে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারীদের সাথে শরিক হতে। মিছিল হচ্ছিল, কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম এটি ছিল আওয়ামী-যুবলীগের কর্মীদের মিছিল, যারা হাউজ বিল্ডিং এলাকায় পৈশাচিকভাবে শিক্ষার্থীদের হত্যা করেছে।

আত্মগোপনে যাওয়ার আগে আমার ফেসবুক পাসওয়ার্ড মেয়েকে জানিয়ে গিয়েছিলাম, যদি কোনো দুঃসংবাদ ঘটে, তবে সে যেন ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে শুভাকাঙ্ক্ষীদের জানিয়ে দেয়। মেয়ে টেলিগ্রামে কল করে আমাকে বোঝাল, ‘বাবা, তুমি যদি বেঁচে থাকো, তবে দেশের জন্য অনেক কিছু করতে পারবে’। স্ত্রী বোঝাল, ‘যদি ফ্যাসিবাদী সরকারের পতন হয়, তবে তোমার পজিটিভ অবদান রাখার সুযোগ আসবে, শুধু কয়েকদিন ধৈর্য ধরো।’ আত্মগোপনের সময়গুলোতে সারা দিন-রাত তথ্য সংগ্রহ করতাম, যেন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ঐতিহাসিক ডকুমেন্টেশন করতে পারি।

৫ আগস্ট ফ্যাসিবাদী সরকার প্রধান শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে যাওয়ার খবর শুনে বিজয় উল্লাস করতে করতে উত্তরা থেকে পায়ে হেঁটে বাসায় ফিরেই উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে কাজে নেমে যাই; পাঁচ মাস চলে গেলেও এখন পর্যন্ত একটুও ফুসরত পাইনি। সামনের সময়গুলোতে উপদেষ্টা নিয়ে কী কী ইস্যু তৈরি হতে পারে, তা নিয়ে সচেতনতা করার চেষ্টা করেছি। কী কী ভুল করতে পারে, তা নিয়েও লিখেছি। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সেই অনুমানগুলোর কিছু ইতিমধ্যে ঘটে গেছে। পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন নিয়ে কয়েকটি কলাবোরেটিভ সায়েন্টিফিক পেপার প্রস্তুত করে জমা দিয়েছি, যেগুলো এখন রিভিউতে রয়েছে। এই পেপারগুলোর শিরোনাম থেকে টপিক সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে—

1. Eye Injuries in Bangladesh's 2024 Student-Led Mass Uprising: A Public Health Crisis Unfolds.
2. 89 Young Lives Lost: Tragedy in Bangladesh's 2024 Anti-Quota Movement.
3. Mental Health Challenges during Mass Trauma: Insights from the Monsoon Revolution in Bangladesh.

ঐতিহাসিক ডকুমেন্টেশনে চ্যালেঞ্জ

দুই-তিন মাসের মধ্যে সাধারণ মানুষের স্মৃতি ক্রমান্বয়ে বিলীন হতে শুরু করে। মর্মান্তিক হৃদয়বিদারক ঘটনাও সময়ের সাথে স্বাভাবিক হয়ে যায়। প্রসঙ্গত, কোভিড প্যান্ডেমিকের শুরুর দিকে আমরা সবাই খুব ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলাম, ভয়ে ঘরে বন্দি ছিলাম। মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে সেই আবেগ ও অনুভূতি নিঃশেষ হয়ে গেছে। কোভিড যে হয়েছিল, হয়তো আমরা এটাই ভুলে গিয়েছি। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সেই দুঃসহ স্মৃতিও আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে আসছে। আন্দোলনে শহীদ, অন্ধত্ব বা পঙ্গুত্ববরণকারীদের কথাও আমরা মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে ভুলে যাচ্ছি।

শুনতে রূঢ় মনে হলেও এটাই স্বাভাবিক। এ কারণেই গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্ত ঐতিহাসিকভাবে মানুষের স্মৃতিকে জাগ্রত করে রাখে। এগুলো একাডেমিয়া এবং নীতিনির্ধারণ পর্যায়ে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এভাবেই গণঅভ্যুত্থানের চেতনা জীবিত থাকে।

গত ২৫ বছর ধরে দেশ-বিদেশে মলিকিউলার বায়োলজি এবং জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কোয়ান্টিটেটিভ (সংখ্যায় পরিমাপযোগ্য) গবেষণা করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে আহতদের নিয়ে গবেষণার প্রস্তাবনা তৈরি করেছিলাম: 'Public Health Impact of Injuries from the July ২০২৪ Uprisings in Bangladesh: An In-Depth Analysis of Health Outcomes and Response Strategies'।

এই ধরনের জনস্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণার জন্য ডেটা সংগ্রহ করতে IRB (Institutional Review Board) অনুমোদন থাকতে হয়। মানুষের তথ্যের ক্ষেত্রে আইআরবি অনুমোদন ছাড়া কোনো গবেষণা ফলাফল জার্নালে প্রকাশ করা সম্ভবই নয়। বায়োমেডিকেল রিসার্চ ফাউন্ডেশনের (BRF) এই প্রকল্পের জন্য ডেটা সংগ্রহের জন্য IRB অনুমোদন দিয়েছিল।

আন্দোলনে হাজার হাজার মানুষ আহত হলেও আমার কাছে কোনো তালিকা ছিল না। যে সমস্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আহতদের সহযোগিতা করছিল, তাদের সাথেও এই গবেষণার গুরুত্ব বুঝিয়ে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলাম। অন্যদিকে, যেকোনো মানসম্পন্ন গবেষণা করতে ভালো ফান্ডিং প্রয়োজন। কারো কাছ থেকে কোনো সহযোগিতা না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়ি।

পরে চিন্তা করলাম, সেই কাঙ্ক্ষিত রিসোর্স সাপোর্টের জন্য চাতক পাখীর মত অপেক্ষা না করে যতটুকু পারা যায় চেষ্টা করা উচিত। যারা মস্তিষ্কে গুলিবিদ্ধ বা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন, তাদের নিয়ে আরেকটি প্রস্তাবনা তৈরি করলাম: 'Neurological Injuries in the July ২০২৪ Uprising in Bangladesh: An In-Depth Analysis of Short-Term and Long-Term Consequences and Clinical Outcomes'। এই প্রস্তাবনা নিয়ে নিউরোসায়েন্স হাসপাতালের ক্লিনিসিয়ানদের সাক্ষাত করেছিলাম। রোগীর সন্ধান পেলেও গবেষণার জন্য ন্যূনতম ফান্ড সংগ্রহ সম্ভব হয়নি। ফান্ডিং ছাড়া মানসম্মত ডেটা সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং ম্যানুস্ক্রিপ্ট লেখা খুবই কঠিন কাজ। কেউ কেউ আগ্রহ দেখালেও তাদের গবেষণার যথাযথ দক্ষতা ছিল না।

তখন খুবই খারাপ লাগছিল। মনে হচ্ছিল, এতগুলো যুবক তাদের জীবন ও রক্তের বিনিময়ে এত বড় ইতিবাচক পরিবর্তন আনল, কত পেশাজীবীর ভাগ্যের উন্নতি হলো (বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি, প্রো-ভিসি, ও গুরুত্বপূর্ণ পজিশনে পরিবর্তন), কিন্তু আন্দোলনের ঐতিহাসিক ডকুমেন্টেশন করার জন্য বাংলাদেশে কাউকে পাওয়া গেল না। এ থেকেই বোঝা যায়, আমাদের দেশের গবেষণার দৈন্যদশা।

অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলাম, আন্দোলনে শহীদ হওয়া ব্যক্তিদের জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো তথ্য আকারে লিপিবদ্ধ করব। সীমিত রিসোর্স দিয়ে যতটুকু পারি, শুরু করব। এই কাজের জন্য শহীদদের বাড়িতে গিয়ে তাদের পিতামাতা এবং এলাকাবাসীর সাক্ষাৎকার নিতে হবে।

ডেটা সংগ্রহে জনবলের প্রয়োজন ছিল। আন্দোলনের পর পর বায়োমেডিকেল রিসার্চ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ক্যাম্পাস ও কমিউনিটি ভিত্তিক সমাজসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য BRF Youth Club গঠন করা হয়। এই ক্লাবের তিনজন শিক্ষার্থী (মো: কামরুজ্জামান, মোঃ নাহিদ হাসান সজীব এবং অন্তর সফিউল্লাহ) শহীদদের ডেটা সংগ্রহে আগ্রহ দেখায়। আমাদের কোনো ফান্ড ছিল না। তারা জানায়, স্বেচ্ছাসেবী হিসেবেই এই কাজ করতে আগ্রহী।

সিদ্ধান্ত নিলাম, ডেটা সংগ্রহকারীদের জন্য ট্রান্সপোর্ট ও থাকা-খাওয়ার খরচ ব্যক্তিগতভাবেই বহন করব। তাদের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা করা হয়, যাতে শহীদদের পরিবার আস্থা পায়। ডেটা সংগ্রহকারীদের ট্রেনিং দেওয়া হয় এবং এথিক্যাল বিষয়াবলি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়। তথ্যের গোপনীয়তা নিশ্চিত করা হয় এবং শুধুমাত্র যেসব পরিবার স্বেচ্ছায় রাজি হয়, তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। প্রতিটি শহীদের স্টোরি তৈরি করার পর পিতামাতার কাছ থেকে অনুমোদন নেওয়ার পরই তা বইতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সাক্ষাতকারের অডিও রেকর্ড সংরক্ষণ করা হয়েছে। এই ধরনের সাক্ষাতকারে অনেক আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তাই জনপরিসরে প্রকাশ করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, ডেটা সংগ্রহ করতে গিয়ে টিমের শিক্ষার্থীরা শহীদদের স্মৃতি রোমন্থনের সময় নিজেদের আবেগ ধরে রাখতে পারেনি, শহীদদের মাতাপিতার সাথে তারাও কেঁদেছে।

যেভাবে শহীদদের কেইস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে

ডেটা সংগ্রহের প্রাক্কালে আমরা দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম—কোন শহীদের ঘটনাগুলো আমাদের বইতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে? আমাদের রিসোর্স (ফান্ড ও জনবল) ছিল সীমিত। আমরা চাইলেও অনেক শহীদের তথ্য লিপিবদ্ধ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলাম, সেসমস্ত শহীদের জীবনের শেষ মুহূর্ত লিপিবদ্ধ করব, যাদের সক্রিয় ফেসবুক প্রোফাইল রয়েছে। আন্দোলনের সময় তাদের ফেসবুক-ভিত্তিক কার্যক্রম থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব বলে মনে হলো। এই নির্ধারিত ক্রাইটেরিয়ার ওপর ভিত্তি করে আমরা শহীদদের কেইস লিপিবদ্ধ করা শুরু করলাম।

শহীদদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে গিয়ে দেখা গেল, তাদের কেউ কেউ অনুরোধ করলেন, অন্য পরিচিত শহীদদের ঘটনাগুলোও অন্তর্ভুক্ত করতে। এভাবেও নতুন কিছু কেইস অন্তর্ভুক্ত হলো। আন্দোলনের সময়ে আবু সাঈদসহ যাদের ঘটনা মিডিয়াতে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল, তাদের পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগের চেষ্টা করা হলো। এইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট প্রকাশের পর জানা গেল, কিছু শহীদ এইচএসসি পাস করেছে, কিন্তু তারা আর এই পৃথিবীতে নেই। এভাবেও কয়েকটি কেইস যুক্ত হলো।

তথ্য সংগ্রহের সময় দেখা গেল, কিছু পরিবার বইতে তাদের শহীদ সন্তানের ঘটনা অন্তর্ভুক্ত করতে তেমন আগ্রহী নন। কেউ কেউ হয়ত এখনো ভয়ে আছেন, যদি ভবিষ্যতে সমস্যা হয়—এই ভেবে। আবার, কিছু পরিবারের কাছ থেকে আশানুরূপ তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এমন আংশিক তথ্যের ভিত্তিতে থাকা কেইসগুলো এই বইতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, সুযোগ তৈরী হলে এই বইয়ের পরবর্তী খণ্ডে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

অনেক দিক বিবেচনা করে এবং সীমিত সময় ও রিসোর্সের কারণে এই বইতে ২৬ জন শহীদের জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই বইটি প্রথম পর্ব হিসেবে প্রকাশিত হলো। ভবিষ্যতে আরও শহীদের ঘটনা লিপিবদ্ধ করার পরিকল্পনা রয়েছে, ইনশাআল্লাহ।

ঐতিহাসিক ডকুমেন্টেশনের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এটি কোয়ান্টিটেটিভ গবেষণার মতো সংখ্যাগতভাবে পরিমাপ করা যায় না; বরং এটি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির ভিত্তিতে লিপিবদ্ধ করা হয়। তাই বর্ণনাকারীর ব্যাখ্যা ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। তবে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে শহীদদের জীবনবোধ এবং তাদের শেষ মুহূর্তগুলোর সম্পর্কে ভালো ধারণা পাওয়া সম্ভব। উপরোক্ত সীমাবদ্ধতাগুলো মেনে নিয়েই বিশ্বব্যাপী ঐতিহাসিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়। বইতে তথ্যগত ভুল থাকলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেওয়া হবে।

কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকে জুলাই গণঅভ্যুত্থান

২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের বীজ বপন হয়েছিল ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে। সেই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে দেশব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসগুলো আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠে। পুলিশের বেপরোয়া হামলা এবং ছাত্রলীগের হিংস্র আক্রমণে অসংখ্য শিক্ষার্থী গুরুতর আহত হয়। সময়ের প্রবাহে আমরা অনেকেই ২০১৮ সালের সেই বিভীষিকাময় পরিস্থিতি ভুলে গেছি। সেই আন্দোলনের বিভীষিকাময় দৃশ্যপট এবং তৎকালীন পরিস্থিতি পুনরুজ্জীবিত করতে গণমাধ্যমে সংরক্ষিত কিছু তথ্য ও প্রতিবেদন তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করছি। এটি শুধুমাত্র অতীতকে স্মরণ করিয়ে দেয়া নয়; বরং কীভাবে সেই আন্দোলন ভবিষ্যতের এক বৃহত্তর গণঅভ্যুত্থানের ভিত্তি তৈরি করেছিল, তার যোগসূত্র নিয়েও আলোকপাত করা।

২০১৮ কোটা সংস্কার আন্দোলন

সরকারি চাকরিতে ৫৬ শতাংশ পদ বিভিন্ন কোটার আওতায় সংরক্ষিত হওয়ায় মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য সুযোগ সংকুচিত হয়ে যায়। নিয়োগের ক্ষেত্রে এই বৈষম্যের অবসান ঘটাতে ২০১৮ সালে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন শুরু করে। এই পদ্ধতির সংস্কার দাবি করে শিক্ষার্থীরা পাঁচ দফা দাবি দেয়। এর মধ্যে অন্যতম প্রধান দাবী ছিল কোটার সংখ্যা ৫৬ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশে নামানো, শূন্য পদে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া এবং চাকরিতে সবার জন্য অভিন্ন বয়সসীমা নিশ্চিত করা।

এই দাবিগুলোকে সামনে রেখে ৮ এপ্রিল, ২০১৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনের মূল সূচনা হয়। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে থেকে শিক্ষার্থীরা বিশাল মিছিল বের করে টিএসসি, নীলক্ষেত এবং কাটাবন হয়ে শাহবাগ মোড়ে এসে অবস্থান নেয়। শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি চলাকালীন রাত ৮টার দিকে পুলিশের

একটি দল আন্দোলনকারীদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। কাঁদানে গ্যাস, জলকামান এবং রাবার বুলেটের আঘাতে আন্দোলনকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, ঢাবি ক্যাম্পাস হয়ে উঠে রণক্ষেত্র। পুলিশের এই দমন-পীড়ন আন্দোলনকারীদের আরও ক্ষুব্ধ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তোলে।

এই ঘটনার বিবরণ 'ক্যাম্পাস যেন এক যুদ্ধক্ষেত্র' শিরোনামে ১০ এপ্রিল ২০১৮ সালে প্রথম আলো প্রতিবেদন ছাপে[১]-

সড়কে ইটের টুকরা, কাঠ, বাঁশের ছড়াছড়ি। জায়গায় জায়গায় ধোঁয়ার কুণ্ডলী। কাঁদানে গ্যাসের শেলের খালি কৌটাগুলোও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। কার্জন হল থেকে ঝাঁঝালো ওই শেলের গন্ধ ছড়াচ্ছিল পুরো ক্যাম্পাসে। যেন পরিত্যক্ত যুদ্ধক্ষেত্র। কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রোববার রাত থেকে শুরু হওয়া সহিংস ঘটনার পর গতকাল সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোরের পরিবেশটা ছিল এ রকমই।

রাত ২.৩০: ছাত্রলীগের ধাওয়া-গুলি

রাত আড়াইটার দিকে নীলক্ষেতের দিক থেকে 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে ছাত্রলীগের কয়েক শ নেতা-কর্মী লাঠিসোঁটা ও রড নিয়ে ক্যাম্পাসে ঢোকেন। তাঁদের অধিকাংশই ঢাকা কলেজসহ মহানগর ছাত্রলীগের সঙ্গে যুক্ত বলে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের নেতারা পরে জানান। তাঁরা ঢুকে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে জড়ো হওয়া আন্দোলনকারীদের মারধর করেন, ধাওয়া দেন। ছাত্রলীগের মিছিল থেকে এ সময় গুলিও ছোড়া হয় বলে অন্তত পাঁচজন প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন। একই সময় পুলিশও ক্যাম্পাসের ভেতরে আন্দোলনকারীদের ওপর কাঁদানে গ্যাসের শেল, রাবার বুলেট ছোড়া শুরু করে। পুলিশ ও ছাত্রলীগের যুগপৎ হামলায় ছত্রভঙ্গ হয়ে ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়েন আন্দোলনকারীরা। ছাত্রীদের একটা বড় অংশ টিএসসিতে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

ভোর ৪টা: ছাত্রলীগ-আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যৌথ অবস্থান

ভোর পৌনে চারটার দিকে প্রায় ৬০টি গাড়ি নিয়ে ক্যাম্পাসে ঢোকে র‍্যাব। তার আগেই অবশ্য পুলিশ ও ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবনে আসেন ঢাকা মহানগর পুলিশের

---

[১] ক্যাম্পাস যেন এক যুদ্ধক্ষেত্র' প্রথম আলো (১০ এপ্রিল ২০১৮)

কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়া। উপাচার্যের বাসভবনের বাইরে পুলিশ ও র‍্যাবের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পাশাপাশি লাঠিসোঁটা, রড, পাইপ নিয়ে অবস্থান করছিলেন ছাত্রলীগ-যুবলীগের নেতা-কর্মীরা।

উপাচার্যের বাসভবনের ভেতরে তখন জাহাঙ্গীর কবির নানক, কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়াসহ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ছিলেন। বাসভবনটি ততক্ষণে গিজগিজ করছে ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীদের ভিড়ে। জাহাঙ্গীর কবিরের সঙ্গেই এসেছিলেন মোহাম্মদপুর, আদাবর, শ্যামলী এলাকার কয়েক শ ছাত্রলীগ-যুবলীগের নেতা-কর্মী। এ ছাড়া ঢাকা কলেজ, তেজগাঁও কলেজের ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদেরও সেখানে পাওয়া যায়।

ভোর সাড়ে ৪টা: ভিসির বাসভবনের ভেতরে যা চলছিল

ভিসির বাসভবনের বাগানে তখন আলোচনা করছিলেন জাহাঙ্গীর কবির, আছাদুজ্জামান মিয়াসহ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, শিক্ষক সমিতির নেতা মাকসুদ কামাল, কবি আবদুস সামাদসহ অন্যরা এবং ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। এ সময় উপাচার্যের বাসভবন থেকে হামলাকারীদের বিতাড়িত করার জন্য ছাত্রলীগের প্রশংসা করেন তাঁরা। ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক গভীর রাতে হল থেকে ছাত্রীদের বের হতে দেওয়ার জন্য ছাত্রী হলগুলোর প্রভোস্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। জাহাঙ্গীর কবির নানক সোমবার দিনের বেলায় যেভাবে হোক, ক্যাম্পাস নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার জন্য বলেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের।

ভোর ৬টা: আবারও গুলি

ভোর ছয়টার দিকে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে উপাচার্যের বাসভবন থেকে একটি মিছিল বের হয়ে টিএসসি হয়ে কার্জন হলের দিকে যায়। মিছিলকারীদের হাতে লাঠিসোঁটা ছিল। সেই মিছিলটি কার্জন হল এলাকায় আন্দোলনকারীদের ওপর চড়াও হতে যায়। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁরাই আন্দোলনকারীদের ধাওয়া খেয়ে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতারাসহ পিছু হটেন। ওই মিছিলে থাকা নেতা-কর্মীরা শহীদুল্লাহ্ হলের ক্যানটিনে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের উপসম্পাদক খাদেমুল বাশারকে বেধড়ক মারধর করেন। সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে রক্তাক্ত অবস্থায় খাদেমুলকে হাসপাতালে নেওয়া হয়।

সকাল পৌনে ৭টা: রাস্তায় হলের ছাত্ররা

কার্জন হল এলাকা থেকে ছাত্রলীগ আন্দোলনকারীদের হটাতে ব্যর্থ হওয়ার পর সেখানে সাঁজোয়া যান নিয়ে চড়াও হয় পুলিশ। কার্জন হলের পেছন দিকটা থেকে শুরু করে শহীদুল্লাহ্ হলের দিকে শতাধিক কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়া হয়। ছাত্রলীগের হামলা ও পুলিশের এলোপাতাড়ি কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপের প্রতিবাদে সকাল পৌনে সাতটার দিকে শহীদুল্লাহ্ হলের কয়েক শ ছাত্র দোয়েল চত্বর এলাকার রাস্তায় নেমে আসেন। এ সময় মহানগর পুলিশ কমিশনার, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল দলের সদস্যরা সেখানে গিয়ে ছাত্রদের শান্ত করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। ঘণ্টাখানেক সেখানে থাকার পর পুলিশ ছাত্রদের হটিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ পর ছাত্ররা আবার ক্যাম্পাসে আসেন।

৮-৯ এপ্রিলে ঘটনায় অনেক শিক্ষার্থী আহত হয়[২]:

কারও মাথায় ব্যান্ডেজ, কারও শরীর রক্তাক্ত। বন্ধুদের কেউ ছুটছেন খাবারের খোঁজে, কেউ আবার ওষুধ সংগ্রহে ব্যস্ত। এটি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (ঢামেক) রাত তিনটার চিত্র। ওই সময় পর্যন্ত সেখানে কেবলই আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা নিতে দেখা গেছে। জরুরি বিভাগের পক্ষ থেকে প্রথম আলোকে জানানো হয়, সন্ধ্যা থেকে রাত তিনটা পর্যন্ত ১১০ জন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী চিকিৎসা নিয়েছেন। হলে ফিরতে না পেরে এঁদের বেশির ভাগকেই রাতভর হাসপাতালে অবস্থান করতে দেখা গেছে।

সর্বজনকথা নামক পোর্টালে 'কোটা সংস্কার আন্দোলনঃ ২০১৮ ঘটনাপ্রবাহ' শিরোনামে (আগস্ট-অক্টোবর) কোটা আন্দোলন নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন রাহাতিল আশেকিন। ১০ এপ্রিল, সচিবালয়ে সরকারের সাথে আলোচনার পর পরিষদ একটি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আন্দোলন স্থগিত করার ঘোষণা দেয়। তবে তাদের শর্ত ছিল, কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরীর বিতর্কিত বক্তব্য বিকাল ৫টার মধ্যে প্রত্যাহার করতে হবে। এই বক্তব্যে তিনি বলেন, 'মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানরা সুযোগ পাবে না, রাজাকারের বাচ্চারা সুযোগ পাবে?' যা আন্দোলনকারীদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়িয়ে দেয়। অনেক আন্দোলনকারী পরিষদের ঘোষণাকে প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়[৩]।

---

[২] 'মাথায় ব্যান্ডেজ, রক্তাক্ত শরীর', প্রথম আলো, ৯ এপ্রিল ২০১৮

[৩] কোটা সংস্কার আন্দোলন: ২০১৭ ঘটনাপ্রবাহ' সর্বজনকথা, আগস্ট-অক্টোবর ২০১৮

এই সময় আন্দোলন শুধু কোটা সংস্কারের দাবিতে সীমাবদ্ধ ছিল না; এটি ছাত্রলীগের হামলা এবং হলগুলোর দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধেও এক বিস্তৃত প্রতিবাদে রূপ নেয়। ঢাকার বিভিন্ন প্রান্তের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও আন্দোলনে যোগ দেয়। বিকালে মতিয়া চৌধুরীর বক্তব্য প্রত্যাহার না করায় পরিষদ আবার রাজপথে আন্দোলনে ফেরার সিদ্ধান্ত নেয় এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট ও ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের ডাক দেয়।

১০ এপ্রিল রাতে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে সুফিয়া কামাল হলে আন্দোলনকারীদের ওপর ছাত্রলীগের সভাপতি ইফফাত জাহান এশা নির্যাতন চালিয়েছেন। গুজব রটে, তার আঘাতে একজন শিক্ষার্থীর পায়ের রগ কেটে গেছে, যদিও পরে জানা যায় যে এটি একটি দুর্ঘটনা। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আন্দোলন আরও তীব্র হয়। আন্দোলনকারীদের দাবির মুখে এশাকে বহিষ্কার করা হলেও তিন দিন পর তাকে পুনর্বহাল করা হয়, যা প্রশাসনের নির্লজ্জ অবস্থানকে প্রকাশ করে[৪]।

১১ এপ্রিল, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদে কোটা পদ্ধতি সম্পূর্ণ বাতিলের ঘোষণা দেন। যদিও শিক্ষার্থীদের দাবি ছিল কোটার সংস্কার, সম্পূর্ণ বাতিল নয়, এটি আন্দোলনকারীদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

কোটা সংস্কার আন্দোলন ২০১৮ সালের এপ্রিলে সরকার প্রজ্ঞাপন প্রকাশের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অপেক্ষা হিসেবে আন্দোলন সাময়িকভাবে স্থগিত করে। তবে ১৬ এপ্রিল আন্দোলনের তিন নেতাকে (ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক নুরুল হক নুর, যুগ্ম আহ্বায়ক ফারুক আহমদ ও যুগ্ম আহ্বায়ক রাশেদ খান) সাদা পোশাকধারীরা আটক করে, যা আন্দোলনকারীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে[৫]। আটক নেতাদের সেদিনই মুক্তি দেওয়া হলেও তাদের ওপর নজরদারি বজায় থাকে।

২০ এপ্রিল সুফিয়া কামাল হলে নারী শিক্ষার্থীদের বের করে দেওয়ার অভিযোগে শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদে সরব হয়। একই সময়ে স্যার এ এফ রহমান হল থেকে আরেক ছাত্রকে বের করে দেওয়ার প্রতিবাদেও সমাবেশ হয়। অবশেষে বিতাড়িত শিক্ষার্থীরা হলে ফিরে আসতে সক্ষম হয়।

---

[৪] 'রগ কাটা'র গুজব নিয়ে যা বললেন মোর্শেদা', বাংলা ট্রিবিউন, ২০ এপ্রিল ২০১৮

[৫] কোটা সংস্কার আন্দোলনের তিন নেতাকে তুলে নেওয়ার অভিযোগ', বাংলা ট্রিবিউন, ১৬ এপ্রিল ২০১৮

প্রজ্ঞাপন জারির দেরিতে ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থী পরিষদ ১৪ মে ধর্মঘটের ডাক দিলেও পরে সেশনজট ও রমজান মাস বিবেচনায় কর্মসূচি শিথিল করা হয়। কিন্তু জুনে আন্দোলন আরও সহিংস হয়, যখন ছাত্রলীগের কর্মীরা আন্দোলনকারীদের ওপর ধারাবাহিক হামলা চালায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনকারী নেতা তরিকুল ইসলাম তারেক (ইসলামিক স্টাডিজের শিক্ষার্থী) হাতুড়ি দিয়ে নির্মমভাবে আঘাত করা হয়। হাতুড়ি দিয়ে তার ডান পায়ের দুটি হাড় ভেঙে দেওয়া হয়। মাথায় আটটি সেলাই পড়ে। ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার মেরুদণ্ড। এই হামলার ছবি-ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। এই ঘটনার পর থেকে 'হাতুড়ি লীগ' ট্যাগিং পরিচিত সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচিত লাভ করে। অনেক আহত নেতাদের হাসপাতালে চিকিৎসা দিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়, এবং আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।[৬]

২০১৮ সালের ২ জুলাই কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরতদের ওপর ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা হামলা (হাতুড়িপেটা) চালালে গুরুতর আহত হন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজের শিক্ষার্থী তরিকুল ইসলাম তারেক।– ডেইলি স্টার

এই সহিংসতা এবং দমন-পীড়নের কারণে অনেক আন্দোলনকারী আত্মগোপনে চলে যায় বা নিখোঁজ হয়। আন্দোলন ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে পড়লেও এটি বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের একটি স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে রয়েছে।

আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভা ২০১৮ সালের ৪

---

[৬] 'হাতুড়ির আঘাতে 'জীবনের আশা ছেড়ে দেওয়া' তরিকুল!', ডেইলি স্টার, ৫ জুলাই ২০১৮

অক্টোবর সরকারি চাকরিতে নবম থেকে ১৩তম গ্রেডে (যেসব পদ আগে প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর চাকরি বলে পরিচিত ছিলো) নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা ব্যবস্থা বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করে।

উক্ত পরিপত্রের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ২০২১ সালে অহিদুল ইসলামসহ সাতজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হাই কোর্টে রিট আবেদন করেন। ২০২৪ সালের ৫ জুন বিচারপতি কে এম কামরুল কাদের ও বিচারপতি খিজির হায়াতের হাইকোর্ট বেঞ্চ এই পরিপত্র বাতিলের রায় দেন। এতে আগের কোটা সিস্টেম পুনরায় বহাল হয়[৭]। কোটা পুনর্বহাল রাখার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদেই তৈরী হয় জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট।

২০২৪ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন থেকে গণঅভ্যুত্থান

হাইকোর্টে রায়ের মাধ্যমে সরকারি চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধা কোটা পুনর্বহাল করার প্রতিবাদে ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ ও সমাবেশ করার মাধ্যমে ২০২৪ বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন শুরু হয় (৬ জুন ২০২৪)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদ মিনারে সমাবেশ করে তারা 'কোটা নয়, মেধা চাই' শিক্ষার্থীরা স্লোগান দেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা প্রতীকী অবরোধ করে হুঁশিয়ারি দেন, কোটা বাতিল না হলে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মিছিল শেষে বাহাদুর শাহ পার্কে সমাবেশ করেন। শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন করে কোটা বাতিলের দাবি জানান। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও রাতে প্রধান ফটকের সামনে বিক্ষোভ করেন। শিক্ষার্থীরা হাইকোর্টের রায় প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলন অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেন[৮]। এরপর থেকে আন্দোলন দানা বাধতে থাকে। শিক্ষার্থীদের ওপর দমন-পীড়নের কারনে ধাপে ধাপে বেগবান হয়ে ৫ আগস্টে দীর্ঘদিনের ফ্যাসিবাদী সরকারের পতন হয়। ঐতিহাসিক তথ্য হিসেবে লিপিবদ্ধ করতে আন্দোলনের ৩৬ দিনের (৬ জুন থেকে ৫ আগস্ট) ঘটনাপ্রবাহ বইয়ের শেষে (চেকলিস্ট- ৩) সংযুক্ত করা হয়েছে

[৭] ২০১৮-এ বাংলাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলন, উইকিপিডিয়া

[৮] 'কোটা পুনর্বহালের প্রতিবাদে ৬ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ', দ্য ডেইলি ক্যাম্পাস, ৬ জুন ২০২৪

সংঘাত ছড়িয়ে পড়ার পূর্বাভাস

কোটা বিরোধী আন্দোলন যে ছড়িয়ে পড়তে পারে তা নিয়ে গোয়েন্দা সংস্থা সরকারকে সতর্ক করেছিল। সরকারী দলে নেতাদের উসকানিমূলক বক্তব্য এবং ছাত্রলীগের বেপারোয়া আচরণ যে সংঘাতের দাবানল জ্বালাতে পারে তা পুলিশের প্রতিবেদন ইঙ্গিত। এ বিষয়ে ৭ জুলাই পুলিশ সদর দপ্তরের বার্তা গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। মানবজমিনে প্রকাশিত সেই বার্তায় বলা হয়[৯]-

> *'২০১৮ সালে কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় সরকারি দলের কোনো কোনো নেতার মন্তব্যে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। শিক্ষার্থীদের যেকোনো ধরনের আন্দোলন একটি স্পর্শকাতর বিষয় হওয়ায় সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের মন্তব্য প্রদানের ক্ষেত্রে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন।*
>
> *প্রতিবেদনে বলা হয়, শিক্ষার্থীরা আন্দোলনের নামে বিশৃঙ্খলা করলে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগ বাধা দিতে পারে এতে উভয়পক্ষে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। এতে অতীতের মতো দায়ভার ছাত্রলীগের ওপর চাপিয়ে কোটা আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করতে পারে। প্রতিবেদনে সুপারিশ হিসেবে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও সন্নিহিত এলাকা, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বড় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করা, সরকারবিরোধী চক্র ও স্বার্থান্বেষী মহল যাতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার সুযোগ না পায় সে ব্যাপারে সতর্কতা বাড়ানো, আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারীসহ সরকারবিরোধী ছাত্র সংগঠন বিশেষ করে ছাত্রদল, ছাত্রশিবির, ছাত্র অধিকার পরিষদ ও বাম ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের গতিবিধির প্রতি নজরদারি, 'মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড' ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা যাতে আন্দোলনে মুখোমুখি অবস্থানে না যায় সে ব্যাপারে সতর্কতা বাড়ানো, শিক্ষার্থীদের চলমান আন্দোলনের ব্যাপারে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের সতর্ক অবস্থান নিশ্চিত করা এবং অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় না জড়ানোর জন্য নির্দেশনা প্রদান করা, সড়ক-মহাসড়কে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীদের যেকোনো ধরনের*

---

[৯] 'কোটা বিরোধী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে পারে', মানবজমিন, ৭ জুলাই ২০২৪

কর্মসূচি পালন রোধ এবং যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে ফোর্স মোতায়েন, মোতায়েনকৃত ফোর্সের যথাযথ ব্রিফিং এবং যেকোনো ধরনের উস্কানিতেও সর্বোচ্চ পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন নিশ্চিতকরণ, শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ রোধে নজরদারি বাড়ানো, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপপ্রচার ও গুজব রোধে সাইবার প্যাট্রোলিং জোরদার এবং সব গোয়েন্দা সংস্থার সমন্বিত নজরদারি বাড়ানো।

প্রতিবেদনের পর্যবেক্ষণে বলা হয়, ২০১৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারা দেশের শিক্ষার্থীরা সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের নিয়োগে কোটা ব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। সে সময় কোটা সংস্কার দাবির আন্দোলনের প্রতি সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যাপক সমর্থন লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই আন্দোলনে স্বল্পসংখ্যক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা গেলেও যথাযথ পদক্ষেপ গৃহীত না হলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেতে পারে। ফলে এই আন্দোলন সারা দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়সহ বড় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বুয়েট, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কলেজসহ ঢাকার বড় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা যোগ দিলে তারা শাহবাগ, নীলক্ষেত, কাঁটাবন, সায়েন্সল্যাব মোড়, জাতীয় প্রেস ক্লাব, মৎস্য ভবন ইত্যাদি এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে পারে। উত্তেজিত শিক্ষার্থীরা আন্দোলনকালে রাস্তা অবরোধ, যানবাহন ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও পুলিশের ওপর হামলার চেষ্টা চালাতে পারে।

পর্যবেক্ষণে কয়েকজন ছাত্র নেতার নাম উল্লেখ করে বলা হয়, তারা কোটা সংস্কার আন্দোলনের ন্যায় বর্তমান আন্দোলনকেও সাধারণ শিক্ষার্থীদের মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে। কোটা বাতিলের আন্দোলনটি শিক্ষার্থীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হওয়ায় ছাত্রদল, ছাত্রশিবির ও বিভিন্ন বাম ছাত্র সংগঠনের পাশাপাশি ছাত্রলীগের পদ-পদবি বঞ্চিত কিছু নেতা এই আন্দোলনের পিছনে রয়েছে। ফলে তারা এবং ছাত্রলীগের অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত কিছু নেতাকর্মী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে আন্দোলন জোরদার করার চেষ্টা চালাতে পারে।'

গনঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট যেভাবে তৈরী হয়

শুরুতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ছিল অরাজনৈতিক। তবে ১৪ থেকে ১৮ জুলাইয়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের ওপর নির্মম নির্যাতন ও গুলি করে হত্যার ঘটনায় সাধারণ মানুষ প্রতিবাদে রাস্তায় নামে, যা পরবর্তীতে সরকার পতনের আন্দোলনে রূপ নেয়।

জুলাই মাসে কোটা সংস্কার আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করে টানা কর্মসূচি চালান। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, আবাসিক হল ও বিভাগভিত্তিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা সংগঠিত হন। এই বিষয়ে ১২ জুলাই বিবিসি একটি সরেজমিনে প্রতিবেদন প্রকাশ করে[১০] -

> *'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আবাসিক হলগুলোতে আন্দোলনের সমর্থনে প্রচারপত্র বিলি করতেও দেখা গেছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এ আন্দোলনে প্রথম থেকেই সোচ্চার হয়েছে। কেন্দ্রীয় কর্মসূচির সঙ্গে সমন্বয় করে ঢাকা আরিচা মহাসড়কে ধারবাহিক অবস্থান নিয়ে আন্দোলন করে যাচ্ছে তারা। সরেজমিন গিয়ে জানা গেছে ছাত্রছাত্রীদের সংগঠিত করতে গঠিত হয়েছে আহ্বায়ক কমিটি। আন্দোলনের প্রচারে নানা কৌশল তারা কাজে লাগিয়েছে। ক্যাম্পাসে মাইকিং, হলে হলে গণসংযোগ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এ আন্দোলনে সড়ক অবরোধ এবং অবস্থান কর্মসূচির নাম দিয়েছে 'বাংলা ব্লকেড'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে খুলনা থেকে চট্টগ্রামে, বরিশাল থেকে সিলেট, রাজশাহী-কুমিল্লাসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে।'*

১১ জুলাই কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মিছিলে পুলিশ প্রথম গুলি চালায়। প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক রাত ১১টা অবধি অবরোধ করে রাখে। দুই পাশ মিলিয়ে প্রায় ২০০ কিলোমিটারে যানজটের সৃষ্টি হয় সেদিন[১১]।

'রাজাকার, রাজাকার' শ্লোগানে উল্টে গেলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রচলিত বয়ান

১৪ জুলাই বিকালে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে সম্প্রতি চীন সফর প্রসঙ্গে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে কোট বাতিল ইস্যুতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন

---

[১০] 'বিবিসি-কোটা বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে কারা?' বিবিসি বাংলা, ১২ জুলাই ২০২৪

[১১] 'কোটা আন্দোলন থেকে সরকার পতন' প্রথম আলো, ৪ নভেম্বর ২০২৪

প্রসঙ্গে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে ফ্যাসিস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপহাস করে বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে এত ক্ষোভ কেন? মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি-পুতিরাও পাবে না? তাহলে কি রাজাকারের নাতি-পুতিরা পাবে? ...এখন মুক্তিযোদ্ধাদের কথা শুনলে ভালো লাগে না, গায়ে জ্বর আসে'।

ঢালাওভাবে শিক্ষার্থীদের 'রাজাকার' ট্যাগিং করায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ তৈরি করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন শিক্ষার্থী (লিমন এবং সৌরভ) নিজের ক্ষোভ প্রশমনে সন্ধ্যার দিকে বিপ্লবী শ্লোগানটি তৈরী করে হলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দিতে থাকেন। সেই স্লোগানের ভিডিও বানিয়ে ফেসবুকে আপলোড করেন। হলের ছাত্রলীগ কর্মীরা বিষয়টি জানতে পেরে তাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করে ভিডিওটি সরিয়ে ফেলার জন্য। বাধ্য হয়ে তারা ভিডিওটি মুছে ফেলেন, যদিও ততক্ষণে তা ক্যাম্পাসজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল[১২]।

ছবি- ঢাবির শিক্ষার্থী লিমন এবং সৌরভ- বিখ্যাত 'রাজারকার' শ্লোগান তৈরী করেন। এটিএন নিউজের সাক্ষাতাকার QR code স্ক্যান করে দেখা যাবে।

১৪ জুলাই দিবাগত রাত ১০টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি জসীম উদদীন হলের প্রতিটি রুম থেকে বারান্দায় বেরিয়ে আসেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। উত্তর পাশের ইউনিট থেকে শিক্ষার্থীরা সমস্বরে প্রশ্ন তোলেন 'তুমি কে আমি কে'। দক্ষিণ পাশের ইউনিট থেকে সমস্বরে উত্তর ভেসে আসে 'রাজাকার রাজাকার'। একে একে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি হলে ধ্বনিত হতে থাকে 'তুমি কে আমি কে- রাজাকার রাজাকার।' কিছুক্ষণের মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে সেই ভিডিও। রাত সাড়ে ১১টায় হলগুলো থেকে মিছিল নিয়ে শিক্ষার্থীরা জড়ো হতে থাকেন রাজু ভাস্কর্যে। এ সময় শিক্ষার্থীরা সেই শ্লোগান ছাড়াও ছাড়াও 'এই

[১২] 'তুমি কে আমি কে, রাজাকার রাজাকার', শ্লোগানের প্রবক্তা কারা ? Tumi Ke Ami Ke Rajakar Rajakar Slogan

বাংলার মাটি, রাজাকারের ঘাঁটি'- ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন। হল থেকে বেরিয়ে আসার সময় বিজয় একাত্তর হলের গেটে ছাত্রলীগের হল কমিটির প্রার্থীদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের বাগবিতণ্ডা হয়। এক পর্যায় ছাত্রলীগ নেতারা গেট থেকে সরে গেলে শিক্ষার্থীরা বের হয়ে টিএসসিতে আসেন। এছাড়াও রাত ১০টার পর মেয়েদের হল থেকে বের হওয়া নিষিদ্ধ হলেও তাদের দাবির মুখে হল প্রশাসন গেটে তালা খুলে দিতে বাধ্য হয়[১৩]। এই শ্লোগান রাতেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়ে।

সরকারের দমন-পীড়ন, গুম-খুনের মাধ্যমে ভয়-ভীতির যে পরিবেশ তৈরী করা হয়েছিল, তা এই শ্লোগানের মাধ্যমে দুরীভূত হওয়া শুরু হয়। এই অভাবনীয় শ্লোগানের মাধ্যমেই মূলত সরকারের নৈতিক পরাজয় ঘটে। ফ্যাসিবাদের সহযোগী বুদ্ধিজীবীরা যারা এতদিন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ফেরি করত, তাদের জন্য সেই শ্লোগান হজম করা সত্যিই অনেক কঠিন ছিল।

ছবি- ১৪ জুলাই রাতে রাজাকার, রাজাকার শ্লোগান দিয়ে ঢাবির শিক্ষার্থীরা রাজু ভাস্কর্য প্রাঙ্গণে যাচ্ছে

এই শ্লোগানের তীব্র প্রতিক্রিয়ায় ১৫ই জুলাই দেশের এক সময়ের বিশিষ্ট লেখক এবং তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধের 'চেতনা' ফিল্টারের কারিগর, প্রফেসর জাফর ইকবাল আবেগতাড়িত মন্তব্য করে মুহূর্তেই ভিলেন বনে যান—পতন হয় নক্ষত্রের, যিনি দুই যুগ ধরে নিজের খেয়াল-খুশিমতো চেতনার নামে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল ক্ষুব্ধ হয়ে চিরকুটে লিখেছেন—

[১৩] 'তুমি কে আমি কে, রাজাকার রাজাকার' স্লোগানে প্রকম্পিত ঢাবি' বাংলা ট্রিবিউন, ১৪ জুলাই ২০২৪

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমার বিশ্ববিদ্যালয়, আমার প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়। তবে আমি মনে হয় আর কোনো দিন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে চাইব না। ছাত্র-ছাত্রীদের দেখলেই মনে হবে, এরাই হয়তো সেই রাজাকার।'

তিনি আরও লেখেন—

'আর যে কয়দিন বেঁচে আছি, আমি কোনো রাজাকারের মুখ দেখতে চাই না। একটাই তো জীবন। সেই জীবনে আবার কেন নূতন করে রাজাকারদের দেখতে হবে?'
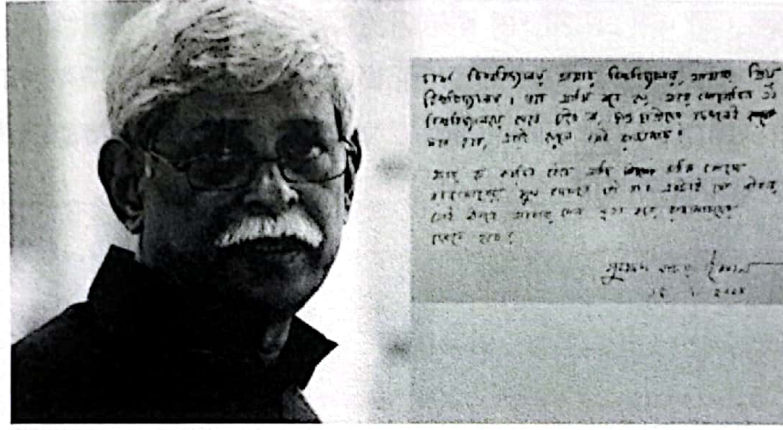
ছবি- রাজাকার শ্লোগান ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ায় প্রফেসর জাফর ইকবালের চিরকুট

জেন-জি জেনারেশনের যারা তার বই পড়ে বড় হয়েছে, তারাই ক্ষোভে ফেটে পড়ে। শিক্ষার্থীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে তার বই পোড়ানোর ভিডিও পোষ্ট করে। যে শাহজালাল প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন, সেখানের শিক্ষার্থীরা তাকে চিরতরে ব্যান করার ঘোষণা দেয়। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের বয়কটের ডাকে সাড়া দিয়ে দেশের সবচেয়ে বড় বই বিক্রেতা প্লাটফর্ম, 'রকমারি ডটকম' জাফর ইকবালের বই বিক্রি করবে না বলে ঘোষণা দেয়।

আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ১৫ই জুলাই বলেন, দলীয় ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ শিক্ষার্থীদের 'উচিত জবাব' দেবে। ওই নির্দেশের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা হামলা চালায়। এ হামলায় নির্বিচারে পিটিয়ে অন্তত ৩০০ বিক্ষোভকারীকে আহত করা হয়[১৪]।

---

[১৪] ' ছাত্র-জনতার জুলাই অভ্যুত্থানের কালপঞ্জি' বিএসএসনিউজ, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪; https://www.bssnews.net/bangla/national/১৬৯৩৫৮

ছাত্রলীগের কর্মীরা মেয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর চড়াও হয়ে এক অবর্ণনীয় অবস্থা তৈরী করে। এর ফলে শিক্ষার্থী এবং দেশের মানুষের মাঝে চরম ক্ষোভ তৈরী হয় এবং তা আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করে। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে হেলমেট পরা ছাত্রলীগ কর্মীরা রড ও চাইনিজ কুড়াল নিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে প্রবেশ করে। তারা আহত বিক্ষোভকারীদের ওপর হামলা চালায় এবং ভেতরে পার্ক করা অ্যাম্বুলেন্সগুলো ভাঙচুর করে।
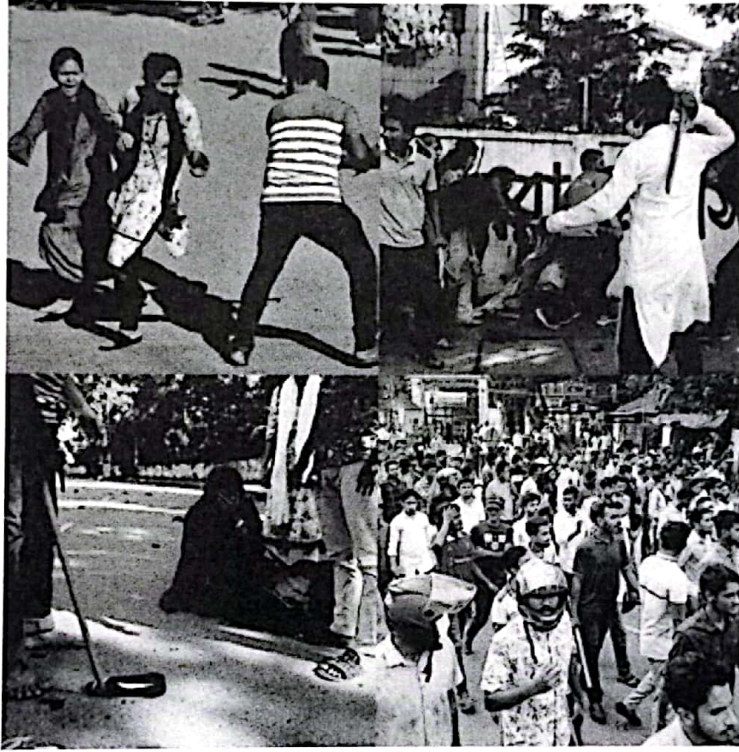
ছাত্রলীগের সাথে কয়েক ঘণ্টার সংঘর্ষের পর আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি ছাত্রাবাস—ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল, ফজলুল হক মুসলিম হল ও অমর একুশে হলের নিয়ন্ত্রণ নেয়।

এদিকে, একই রাতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের হামলায় ছয় শিক্ষার্থী আহত হয়। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ককে ডেকে নিয়ে লাঞ্ছিত ও মারধর করা হয়। আন্দোলনের উত্তাল পরিস্থিতির মধ্যে শিক্ষার্থীরা ১৬ জুলাই বিকাল ৩টায় দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেশব্যাপী বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের ডাক দেয়।

১৬ জুলাই: গণঅভ্যুত্থানের মহানায়কের আবির্ভাব

এই দিন ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং রংপুরে সংঘর্ষ আরও তীব্র আকার ধারণ করে। সারাদেশে শিক্ষার্থীদের ব্যাপক বিক্ষোভ চলাকালে ছাত্রলীগ, যুবলীগসহ ক্ষমতাসীন দলের কর্মীরা বিভিন্ন স্থানে হামলা চালায়। ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং রংপুরে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংঘর্ষে অন্তত ছয়জন নিহত হন।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদ পুলিশের গুলির সামনে বুক চিতিয়ে শহীদ হওয়ার ফুটেজ ও ছবি দ্রুত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হলে সারা দেশের মানুষের মাঝে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। রাতে সাধারণ শিক্ষার্থীরা পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রলীগকে ধাওয়া করে তাড়িয়ে দেয়। তারা ছাত্রলীগ নেতাদের কক্ষ ভাঙচুর করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগ আবাসিক হলের নিয়ন্ত্রণ নেয়। এর প্রতিক্রিয়ায় সরকার সারাদেশে স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে। তবে আন্দোলন থামেনি; পরদিন শিক্ষার্থীরা গায়েবানা জানাজা ও কফিন মিছিলের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করে।
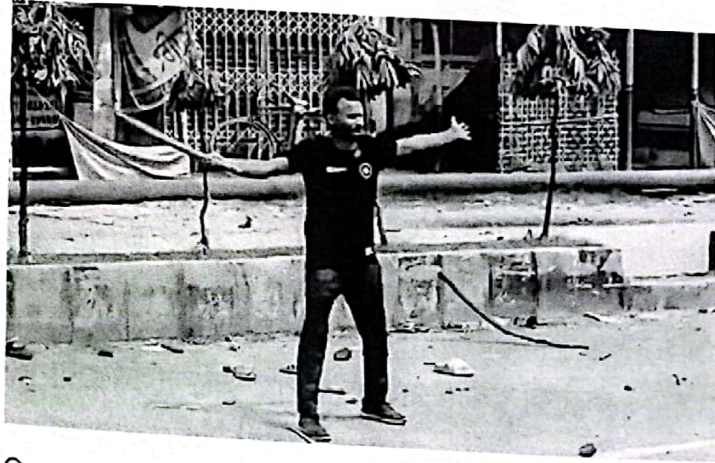
ছবি- পুলিশের গুলির সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়ানো শহীদ আবু সাঈদ

১৭ জুলাই সকালের দিকে আন্দোলনকারীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন ক্যাম্পাস থেকে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের তাড়িয়ে দেয় এবং ক্যাম্পাসকে 'রাজনীতিমুক্ত' ঘোষণা করে। ছাত্ররা নিহতদের জন্য 'গায়েবানা জানাজা' আদায় করার চেষ্টা করে, কিন্তু পুলিশ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের সমাবেশে হামলা চালায়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাস বন্ধ করে শিক্ষার্থীদের জোরপূর্বক ছাত্রাবাসগুলো খালি করে দেয়।

আবু সাঈদের বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগ ছিল আন্দোলনের টার্নিং পয়েন্ট যা পরবর্তীতে গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। এই মৃত্যু শিক্ষার্থীদের মাঝে অন্তর্নিহিত মৃত্যুর ভয় দূর করতে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের হল থেকে উচ্ছেদের পর মনে হচ্ছিল, আন্দোলন সম্ভবত সরকার নিয়ন্ত্রণ করে ফেলেছে। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে ১৮ জুলাই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সহপাঠীদের ওপর নির্মম অত্যাচারের প্রতিবাদে মাঠে নামে এবং এতে আন্দোলন আরেক ধাপে উন্নতি হয়, যুক্ত হয় আমজনতা। উল্লেখ্য যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সরকার চাকুরি বা বিসিএস জবের প্রতি আগ্রহ নেই।

এই দিনের সম্পূর্ণ শাটডাউন কর্মসূচির সময় ঢাকাসহ ৪৭টি জেলায় ব্যাপক সহিংসতা ঘটে। পুলিশের গুলি ও হামলায় কমপক্ষে ৪২ জন নিহত এবং ১৫০০ জন আহত হন। হাজারো শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন গোষ্ঠী শাটডাউন কার্যকর করতে রাস্তায় নেমে আসে। বিক্ষোভকারীরা বিটিভি ভবন, সেতু ভবনসহ সরকারি স্থাপনায় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। পুলিশের পাশাপাশি ছাত্রলীগের কর্মীরাও শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায়। ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) মোতায়েন করা হয়। সারা দেশে ইন্টারনেট বন্ধ এবং মেট্রোরেল অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়। সরকারি স্থাপনা, বাস, কার, ও টোল প্লাজায় অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে[১৫]।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর অবর্ণনীয় হামলার ফলে সারাদেশে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। ইন্টারনেট বন্ধ থাকার মধ্যে ১৯ থেকে ২১ জুলাই পর্যন্ত ঢাকার যাত্রাবাড়ী, রামপুরা, শনিরআখড়া, মিরপুর, উত্তরাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এবং দেশের বিভিন্ন জেলায় তীব্র সংঘর্ষ হয়। প্রথম আলোর মাঠপর্যায়ের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, এই তিন দিনে অন্তত ১৮৭ জন নিহত হয়, যদিও পরবর্তী সময়ে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়।

---

[১৫] 'ছাত্র-জনতার জুলাই অভ্যুত্থানের কালপঞ্জি' বিএসএসনিউজ, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪;

গনঅভ্যুত্থানের পূর্বের কয়েকদিন (২৩ জুলাই থেকে ২ আগস্ট)

আন্দোলন ক্রমেই তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। ২৩ জুলাই সরকার কোটাপ্রথা সংস্কার করে প্রজ্ঞাপন জারি করে এবং রাতেই সীমিত পরিসরে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট চালু করে, যা উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল। ২৬ জুলাই সরকার আন্দোলন দমনে সারা দেশে 'ব্লক রেইড' চালায় এবং ৫৫৫টি মামলা দায়ের করে। পরদিন, ২৭ জুলাই ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) আন্দোলনের শীর্ষ সংগঠক সারজিস আলম ও হাসনাত আবদুল্লাহকে হেফাজতে নেয়, আর গ্রেপ্তারের সংখ্যা ১১ দিনে ৯ হাজার ছাড়িয়ে যায়। ২৮ জুলাই ১০ দিন বন্ধ থাকার পর মোবাইল ইন্টারনেট পুনরায় চালু হয়, কিন্তু পরদিন ২৯ জুলাই আন্দোলনের ৬ জন সমন্বয়ককে ডিবি হেফাজতে নেওয়া হয়।

৩০ জুলাই শিক্ষার্থীদের আহ্বানে অনেকেই ফেসবুকে লাল প্রোফাইল ছবি ব্যবহার করেন, যা প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে ওঠে। ফেসবুকে লাল প্রোফাইল করার আইডিয়া ছিল অভূতপূর্ব যার মাধ্যমে সাধারন মানুষের জন্য নৈতিক সমর্থন দেয়া সহজ হয়। ৩১ জুলাই 'মার্চ ফর জাস্টিস' কর্মসূচির মাধ্যমে আন্দোলন আরও বেগবান হয়, যার ধারাবাহিকতায় ১ আগস্ট 'রিমেম্বারিং আওয়ার হিরোজ' কর্মসূচি পালিত হয়। একই দিনে, ডিবি হেফাজতে থাকা আন্দোলনের ৬ সমন্বয়ককে মুক্তি দেওয়া হয়। এরপর, ২ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে জুমার নামাজের পর দেশজুড়ে 'প্রার্থনা ও ছাত্র-জনতার গণমিছিল' অনুষ্ঠিত হয়, যা ২৮টি জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলন ধাপে ধাপে আরও বৃহত্তর পরিসরে ছড়িয়ে যেতে থাকে, প্রতিদিন নতুন মাত্রা যুক্ত হয়।[১৬]

লংমার্চ, গনঅভ্যুত্থান, শেখ হাসিনার পলায়ন (৩-৫ আগস্ট)

৩ আগস্ট ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জমায়েত হন শিক্ষার্থীসহ হাজারো জনতা। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে রাজধানীসহ দেশের ৩৩টি জেলা ও মহানগরে বিক্ষোভ। কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী নাহিদ ইসলাম ঘোষণা করেন যে তাদের সরকারের সাথে আলোচনার কোন পরিকল্পনা নেই এবং হাসিনার

[১৬] '৩৬ দিনের আন্দোলন, সরকারের পতন' প্রথম আলো, ৬ আগস্ট ২০২৪

পদত্যাগ এবং জাতীয় সরকার' গঠনের দাবিতে লংমার্চ টু ঢাকা কর্মসূচি ঘোষণা করেন।হাসিনা আলোচনার প্রস্তাব দিলেও শিক্ষার্থীরা তা প্রত্যাখ্যান করে। রাজশাহী, চট্টগ্রাম, গাজীপুর, রংপুর, সিলেট, কুমিল্লা ও বগুড়ায় সংঘর্ষ হয়, গুলি ও হামলায় বহু শিক্ষার্থী আহত হয়।

৪ আগস্ট সরকার পদত্যাগের এক দফা দাবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা সর্বাত্মক অসহযোগ কর্মসূচির প্রথম দিনে সারা দেশে ১৮ জেলায় ব্যাপক সংঘাতের খবর পাওয়া যায়। ১১৪ জনের মৃত্যু। সরকার কারফিউ জারি করে ও ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়। সেনাবাহিনী ও পুলিশ কারফিউ মানার আহ্বান জানায়, তবে শিক্ষার্থীরা 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচির ঘোষণা দেয়।

৪ আগস্ট সরকার পদত্যাগের এক দফা দাবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা সর্বাত্মক অসহযোগ কর্মসূচির প্রথম দিনে সারা দেশে ১৮ জেলায় ব্যাপক সংঘাতের খবর পাওয়া যায়। ১১৪ জনের মৃত্যু। সরকার কারফিউ জারি করে ও ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়। সেনাবাহিনী ও পুলিশ কারফিউ মানার আহ্বান জানায়, তবে শিক্ষার্থীরা 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচির ঘোষণা দেয়।

৫ আগস্ট কারফিউ অমান্য করে হাজারো মানুষ ঢাকায় প্রবেশ করে। আওয়ামী লীগ আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালায়। দুপুরে গণভবন ঘেরাও হলে বিকেলে হাসিনা পদত্যাগপত্র দেন ও ভারতে পালিয়ে যান।

'গুলি করি মরে একটা...বাকিডি যায় না স্যার'

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে শিক্ষার্থী ও সাধারণ জনতা মৃত্যুভয়কে জয় করে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে এবং এর ফলে গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালালেও আন্দোলনকারীরা পিছিয়ে যায়নি, যা সত্যিই বিস্ময়কর। উল্লেখ্য, ২৮ অক্টোবর ২০২৩ সালে বিরোধী রাজনৈতিক দল লক্ষ লক্ষ মানুষের অংশগ্রহণে এক মহাসমাবেশ আয়োজন করেছিল, যা দেশের রাজনীতির 'টার্নিং পয়েন্ট'হিসেবে আখ্যায়িত হয়। তবে পুলিশ ও আওয়ামী লীগের ক্যাডার বাহিনীর যৌথ আক্রমণে সেই মহাসমাবেশ পণ্ড হয়ে যায়। সাউন্ড গ্রেনেড ও গুলির আঘাতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সমাবেশস্থল ফাঁকা হয়ে যায়।[১৭]

[১৭] 'ডেটলাইন ২৮ অক্টোবর: যা যা হলো' বাংলা ট্রিবিউন, ২৮ অক্টোবর ২০২৩

এর কয়েক মাস পর, বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে পুলিশ সরাসরি গুলি চালিয়ে শত শত মানুষ হত্যা করলেও শিক্ষার্থী ও সাধারণ জনতা মাঠ ছাড়েনি। এই অবিশ্বাস্য প্রতিরোধে পুলিশ নিজেই বিস্মিত হয়ে পড়ে। সে সময় একটি ভিডিও ভাইরাল হয়, যেখানে দেখা যায়, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে গুলি চালানোর বিষয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) এক সদস্য সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান খান কামালকে অবহিত করছেন এবং একটি ভিডিও দেখিয়ে বলছেন—

> *'স্যার, গুলি করি। মরে একটা, আহত হয় একটা। একটাই যায় স্যার। বাকিডি (বাকিগুলো) সরে না। আগায়ে আসে। এইটা হইলো স্যার সবচেয়ে বড় আতঙ্কের'।*[১৮]

আবু সাঈদের বীরত্বপূর্ণ মৃত্যু এবং এর পরবর্তী পুলিশি নির্যাতন, বিশেষ করে ১৮ জুলাই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালানো ও হত্যার ঘটনা জনমনে মৃত্যু-ভয় জয় করার সাহস জাগিয়ে তোলে।
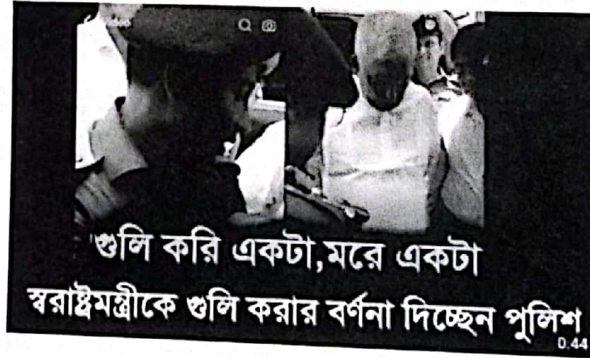
গণঅভ্যুত্থানে কত মানুষের মৃত্যু হয়েছে?

গণঅভ্যুত্থানে কত মানুষের মৃত্যু হয়েছে, তা এখনও অজানা। আন্দোলনে হতাহতের বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো গবেষণাধর্মী ও পদ্ধতিগত (সিস্টেম্যাটিক) প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়নি। ১০ সেপ্টেম্বর গণমাধ্যমে প্রকাশিত স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, এ আন্দোলনে ৬৩১ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা দরকার, বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালগুলোর মেডিকেল তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল আর সেকেলে। একজন জনস্বাস্থ্য গবেষক হিসেবে গত ১২ বছরে এ বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন জার্নালে

[১৮] 'গুলি করি মরে একটা...বাকিডি যায় না স্যার' ডেইলি স্টার বাংলা, ১৩ আগস্ট ২০২৪

বহু আলোচনা করেছি। আন্দোলনের সময় হাসপাতালের মেডিকেল রেকর্ড পুলিশ নিয়ে গেছে বলে পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

নিহত সংখ্যা	আহত সংখ্যা	সোর্স	প্রকাশকাল (২০২৪)	ডেটা সংগ্রহের পদ্ধতি
১,৫৮১	৩১,০০০+	বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের স্বাস্থ্য বিষয়ক উপ-কমি-টি	২৮ সেপ্টে-ম্বর[১৯]	তালিকা প্রণয়নের কাজে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন, হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি সহ অন্যান্য বেশ কয়েকটি সংস্থা সহায়তা করেছে।
৬৩১	১৯,০০০	স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের খসড়া তালিকা	১০ সেপ্টে-ম্বর[২০]	সারাদেশের সর-কারি-বেসরকারি হাসপা-তাল থেকে তথ্য নিয়ে এ তালিকা করা হয়েছে
৮৫৮	১১,৫০০+	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের গণঅভ্যুত্থান সং-ক্রান্ত বিশেষ সেল	২২ ডিসে-ম্বর[২১]	৬৪ জেলায় গঠিত জেলা কমিটি ও গণ-অভ্যুত্থান-সংক্রান্ত বিশেষ সেল

এছাড়া, অনেকের মরদেহ ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ছাড়াই নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে রিপোর্ট পাওয়া গেছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের গণঅভ্যুত্থান সংক্রান্ত বিশেষ সেল তাদের প্রাথমিক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, এ আন্দোলনে নিহতের সংখ্যা ৮৫৮ জন। অন্যদিকে, অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের স্বাস্থ্য উপকমিটির তথ্যানুযায়ী, নিহতের সংখ্যা ১,৫৮১।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের স্বাস্থ্য উপকমিটি তাদের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন, হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি, রেড জুলাইসহ অন্যান্য সংগঠনের তথ্যের ওপর নির্ভর করেছে। উল্লেখ্য, আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন

[১৯] 'ছাত্র আন্দোলনে নিহত ১৫৮১, আহত ৩১ হাজারের বেশি' -সময় নিউজ

[২০] 'ছাত্র আন্দোলনে নিহত ৬৩১ আহত ১৯ হাজার' -যুগান্তর

[২১] 'প্রথম ধাপের খসড়ায় ৮৫৮ নিহত ও সাড়ে ১১ হাজার আহতের নাম' -বণিক বার্তা

নিহত পরিবারের জন্য কয়েক কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে এবং তারা নিহত ও আহতদের শনাক্ত করতে তথ্য যাচাই-বাছাই (ভেরিফাই) করেছে। ফলে, তাদের তথ্য তুলনামূলকভাবে নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে।

বাংলাদেশের তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা (হেলথ সিস্টেম) এবং গবেষণা কাঠামোর দুর্বলতার কারণে গণঅভ্যুত্থানে প্রকৃত হতাহতের সংখ্যা কখনোই জানা সম্ভব হবে না।

প্রথম আলোর প্রতিবেদন প্রাথমিক (২৮ আগস্ট ২০২৪) তথানুসারে ৯১ জন শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। সেই প্রতিবেদনে ৭৫৭ ছাত্র-জনতার মৃত্যু করা উল্লেখ করা হয়। মৃত্যুর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে- [২২]

> *'সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে ১৮ ও ১৯ জুলাই এবং ৪ আগস্ট। ১৮ জুলাই ২৫ জন, ১৯ জুলাই ২৩ জন এবং ৪ আগস্ট ১৫ জন শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়। তাঁদের মধ্যে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদরাসা পড়ুয়া শিক্ষার্থী রয়েছেন।*
>
> *আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে (১৬ জুলাই থেকে ৩ আগস্ট) ঢাকায় মৃত্যু বেশি হয়েছে। এ সময়ে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় মৃত্যু হয় ২৪৬ জনের। একই সময়ে রাজধানীর বাইরে নিহত হন কমপক্ষে ৯৫ জন। দ্বিতীয় পর্যায়ে (৩ আগস্ট–পরবর্তী সময়ে) মৃত্যুর তথ্য–উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এই সময়ে ঢাকার চেয়ে ঢাকার বাইরে মৃত্যুর ঘটনা বেশি। ঢাকায় মৃত্যু হয়েছে ১২৬ জনের। ঢাকার বাইরের বিভিন্ন জেলায় মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ২৯০ জনের"।*

অন্যদিকে সমকাল পত্রিকা নিহত শিক্ষার্থীর পরিবার কিংবা সহপাঠীর সঙ্গে কথা বলে 'ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ১৩৫ শিক্ষার্থীর প্রাণক্ষয়' প্রতিবেদন প্রকাশ করে (২৮ সেপ্টম্বর ২০২৪)। মৃত্যুর তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ১৬ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত ঢাকায় ৯৬ এবং অন্যান্য জেলা ৩৯ শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। প্রতিবেদনে প্রকাশ-

> 'সাভার, উত্তরা, বাড্ডা, রামপুরা, মিরপুর-১০, যাত্রাবাড়ী, শনির আখড়া, কাজলা– এই কয়েকটি স্পটে বেশি হত্যাকাণ্ড হয়েছে। এ ছাড়া মোহাম্মদপুর, চানখাঁরপুল, আজিমপুর, ফার্মগেট, কারওয়ান বাজার এলাকায়ও কিছু হত্যার ঘটনা ঘটে।

---

[২২] 'ছাত্র–জনতার আন্দোলন: মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে, এখন পর্যন্ত ৭৫৭' প্রথম আলো, আগস্ট ২০২৪

অনুসন্ধানে পাওয়া তথ্যানুযায়ী, সিংহভাগ শিক্ষার্থী পুলিশের গুলিতে মারা গেছেন। সময়ের হিসাবে অধিকাংশ হত্যাকাণ্ড ১৮, ১৯ ও ২০ জুলাই এবং ৪ ও ৫ আগস্টে ঘটেছে। মৃত্যুর মিছিল শুরু হয় ১৬ জুলাই; সেদিন সায়েন্স ল্যাবে দু'পক্ষের সংঘর্ষে প্রথম ঢাকা কলেজের ছাত্র সবুজ আলীর মৃত্যু হয়। সর্বোচ্চ ২০ শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন যাত্রবাড়ী ও শনির আখড়ায়।

প্রতিষ্ঠান হিসেবে তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসার সর্বোচ্চ ৫ শিক্ষার্থী জীবন দিয়েছেন। সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি, রাজধানীর সরকারি কবি নজরুল কলেজ এবং নারায়ণগঞ্জের তোলারাম কলেজের চারজন করে শিক্ষার্থীকে হত্যা করা হয়েছে। সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের ৩, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, মিরপুর বাঙলা কলেজ, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি), বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিউপি) ও সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটির দু'জন করে ছাত্র নিহত হয়েছেন।'
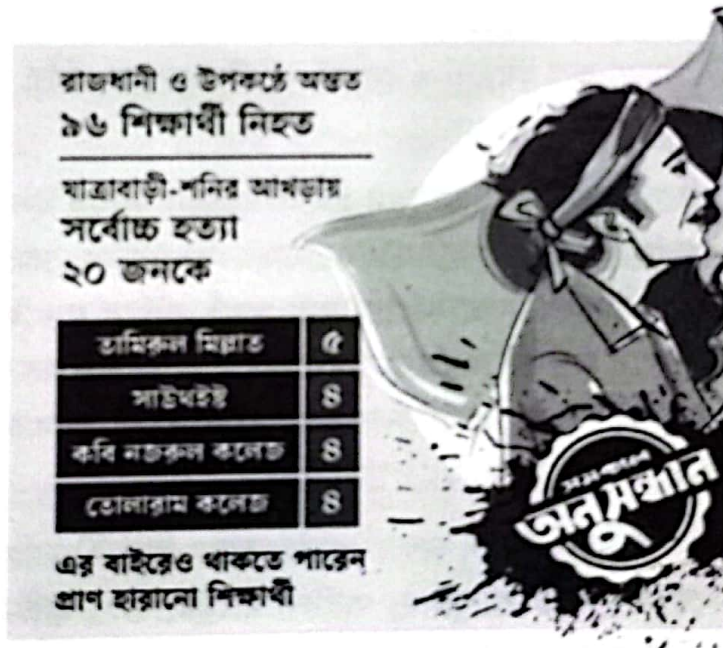
উল্লেখ্য যে, আমাদের এই বইতে ২৫ জন শহীদের কেইস স্টোরি লিপিবদ্ধ হয়েছে, এছাড়াও ঢাকার বাইরের বেশ কয়েকটি কেইস রয়েছে যা সমকালের রিপোর্টে আসেনি।

সমকাল,[২৩] এবং বণিক বার্তার[২৪] প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, অন্তত ২৮ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী প্রাণ দিয়েছেন। এর মধ্যে ৫ জন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের (২ জন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ২ জন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১ জন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ১ জন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, এবং ১ জন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়) বাকি ২১ জন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী (শহীদদের সম্পর্কে জানতে বইয়ের শেষে চেকলিস্ট-১ দেখুন)।

গণঅভ্যুত্থানের নেপথ্যে 'মাস্টারমাইন্ড' ছিল না কেউ

বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকায় একক কোনো মাস্টারমাইন্ড বা মুখপাত্র ছিলো না, তাছাড়া প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারের পতন ঘটানোও এর লক্ষ্য ছিল না। শুরু থেকেই আন্দোলনটি ছিল ছাত্রদের, পরে তা ছাত্র-জনতার আন্দোলনে রূপ নেয় এবং গণ–অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটে। ৮ জুলাই কোটা আন্দোলন বাস্তবায়নে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে ৬৫ সদস্যবিশিষ্ট সমন্বয় কমিটি ঘোষণা করা হয়।[২৫] ৩ আগস্ট কমিটির আকার বর্ধিত করে ১৫৮ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

৭ জুলাই ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম বাংলা ট্রিবিউনকে বলেছিলেন, 'আমরা এই আন্দোলন সাংগঠনিক কোনো জায়গা থেকে করছি না। এটা একটা ওপেন প্ল্যাটফর্ম। সবাই এখানে যুক্ত হচ্ছে, হবে। আমাদের আন্দোলনে অনেকে আছে, যাদের কেউ কেউ ছাত্রলীগের রাজনীতিও করেছেন। আমরা দলীয় পরিচয়ে আসিনি। চাকরিতে বৈষম্য নিরসনের জন্য 'ওপেন প্ল্যাটফর্ম'-এর মাধ্যমে দাবি জানাচ্ছি।' [২৬]

সমন্বয়ক কমিটির মধ্যে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নাহিদ ইসলাম, সারজিস আলম, হাসনাত আব্দুল্লাহ, আসিফ মাহমুদ, মো. মাহিন সরকার, আব্দুল কাদের, আবু বাকের মজুমদার, আব্দুল হান্নান মাসুদ, আদনান আবির,

[২৩] ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ১৩৫ শিক্ষার্থীর প্রাণক্ষয়' সমকাল, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪

[২৪] 'গুলিতে প্রাণ হারান বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭ শিক্ষার্থী' বণিক বার্তা, ৩০ আগস্ট ২০২৪

[২৫] 'কোটা আন্দোলনকারীদের ৬৫ সদস্যের সমন্বয় কমিটি ঘোষণা', ইত্তেফাক, ৮ জুলাই ২০২৪

[২৬] 'সমন্বয়কেরা কে কোন দলের, গোয়েন্দা নজরে 'ইন্টেলেকচুয়াল এক তরুণ'বাংলা ট্রিবিউন, ২ আগস্ট ২০২৪

জামান মৃধা, মোহাম্মদ সোহাগ মিয়া, নুসরাত তাবাসসুম, রাফিয়া রেহনুমা হৃদি, মুমতাহীনা মাহজাবিন মোহনা, আনিকা তাহসিনা, উমামা ফাতেমা, আলিফ হোসাইন ও কাউসার মিয়া।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আরিফ সোহেল, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসেল আহমেদ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আসাদুল্লাহ আল গালিব, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের, মো. তৌহিদ আহমেদ আশিক, ইডেন মহিলা কলেজের সাবিনা ইয়াসমিন।

সহ-সমন্বয়ক হিসেবে যারা ছিলেন—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিফাত রশিদ, হাসিব আল ইসলাম, আব্দুল্লাহ সালেহীন অয়ন, নিশিতা জামান নিহা, রেজোয়ান রিফাত, মেহেদী হাসান, মো. আবু সাঈদ, নুমান আহমাদ চৌধুরী, রিজভি আলম, সানজানা আফিফা অদিতি, ফাহিম শাহরিয়ার, গোলাম রাব্বি, কুররাতুল আন কানিজ, মিনহাজ ফাহিম, মো. মহিউদ্দিন, মেহেদী হাসান মুন্না, সরদার নাদিম সরকার শুভ, রিদুয়ান আহমেদ, নূরুল ইসলাম নাহিদ, রাইয়ান ফেরদৌস, সাব্বির উদ্দিন রিয়ন, হামজা মাহবুব, এবি যুবায়ের, তানজিলা তামিম হাফসা, বায়েজিদ হাসান, শাহেদ, মুসাদ্দিক আলী ইবনে মোহাম্মদ, দিলরুবা আক্তার পলি, ঈশী সরকার, ফাতিহা শারমিন এনি, সামিয়া আক্তার, মাইশা মালিহা, সাদিয়া হাসান লিজা, তারেক আদনান। ঢাকা কলেজের আফজালুল হক রাকিব, কবি নজরুল সরকারি কলেজের মো. মেহেদী হাসান, সরকারি তিতুমীর কলেজের মো. সুজন মিয়া, বোরহান উদ্দিন ডিগ্রি কলেজের ইব্রাহীম নিরব, নর্দার্ন ইউনিভার্সিটির আতিক মুন্সি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের এস এম সুইট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের খান তালাত মাহমুদ রাফি, খুলনার বি এল কলেজের সাজিদুল ইসলাম বাপ্পি।

কোটা পুনর্বহালের প্রতিবাদে জুনের শুরুতে 'গণতান্ত্রিক ছাত্রশক্তি' নেতাদের উদ্যোগে কোটা সংস্কার বিরোধী ছাত্র শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ভিত্তিক (মূলত ঢাবি) এই সংগঠনটি ২০২৩ সালের ৪ অক্টোবরে আত্মপ্রকাশ করে। ছাত্রশক্তির সবাই আগে ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের সংগঠন ছাত্র অধিকার পরিষদের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। পরে ২০২৩ সালে ৩ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশটি গঠনতন্ত্র-বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ একযোগে পদত্যাগ করে। এরপর ৪ অক্টোবর ডাকসুর সাবেক সমাজসেবা বিষয়ক সম্পাদক আখতার হোসেনের নেতৃত্ব নতুন করে আত্মপ্রকাশ করে গণতান্ত্রিক ছাত্রশক্তি। সেখানে সদস্যসচিব হিসেবে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন

নাহিদ ইসলাম। ছাত্রশক্তির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক হন আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। এই দুইজন বর্তমানে অন্তর্বর্তী ড. ইউনূস সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছেন। ২৩ জনের মধ্যে ১০ জন সমন্বয়ক ছাত্রশক্তির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা। আন্দোলনের সমন্বয়কদের মধ্যে না থাকলেও কোটা সংস্কারের দাবিতে বিভিন্ন বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন গণতান্ত্রিক ছাত্রশক্তির আহ্বায়ক আখতার হোসেন। তিনি সমন্বয়ক প্যানেলে না থাকলেও আন্দোলনকারীদের নানা পরামর্শ দিতেন। [২৭]

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে যাদের কথা মিডিয়ায় বেশি আলোচনা হয়েছে এবং গ্রেফতার হয়েছেন, তাদের মধ্যে রয়েছে নাহিদ ইসলাম, সারজিস আলম, হাসনাত আব্দুল্লাহ, আবু বাকের মজুমদার, আসিফ মাহমুদ, নুসরাত তাবাসসুম, আরিফ সোহেল, আখতার হোসেন এবং মাহফুজ আলম (তিনি গ্রেফতার হননি, সমন্বয় টিমেও ছিলেন না)। আন্দোলনে শুরু থেকেই বুদ্ধিবৃত্তিক ও দিকনির্দেশনামূলক ভূমিকায় ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের দুই শিক্ষার্থী মাহফুজ আলম ও আখতার হোসেন।

২০১৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘ ইউনিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আলোচনায় আসা আখতার হোসেন পরের বছর ডাকসুর সমাজসেবা সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। আখতার হোসেনের পাশাপাশি নাহিদ ইসলাম ও আসিফ মাহমুদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের নির্যাতনের বিরুদ্ধে ও শিক্ষার্থীদের অধিকারের পক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচিতে সক্রিয় থাকায় বেশ আগে থেকেই পরিচিত মুখ ছিলেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এখনকার আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ রেজিস্টার ভবনে অনিয়ম ও শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি নিয়ে আন্দোলন করে আলোচনায় এসেছিলেন। সাবেক সমন্বয়ক সারজিস আলম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি হিসেবে আন্দোলনে যুক্ত হন। তিনি অমর একুশে হল সংসদের নির্বাচিত সদস্য (ছাত্রলীগের প্যানেল থেকে) ও বিতার্কিক হিসেবে ক্যাম্পাসে পরিচিত ছিলেন।[২৮]

---

[২৭] 'সবাইকে একত্র করতে পেরেছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' প্রথম আলো, ৭ নভেম্বর ২০২৪

[২৮] 'সবাইকে একত্র করতে পেরেছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' প্রথম আলো, ৭ নভেম্বর ২০২৪
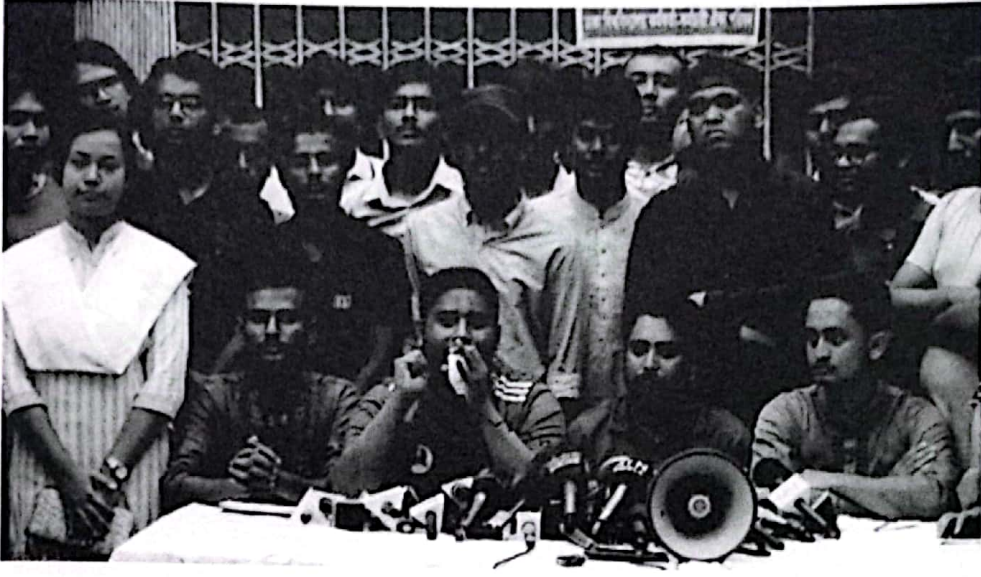
ছবি: সমন্বয়কদের একাংশ

ঢাকার বাইরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক তালিকায় নাম না থাকলেও অনেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আবু সাঈদ এমনই এক অনুপ্রেরণার নাম, যার পদাঙ্ক অনুসরণ করে অনেকে জীবন উৎসর্গ করেছেন। তবে ঢাকার বাইরে আন্দোলনের অবদান গণমাধ্যমে তেমন গুরুত্ব পায় না। সর্বশেষ তথ্যমতে, রংপুরে অন্তত ২২ জন ও চট্টগ্রামে ১০ জন নিহত হন, যার মধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) দুই শিক্ষার্থীও রয়েছেন।

ছবি: চবি শিক্ষার্থীদের বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের তথ্যচিত্র

১১ জুলাই, খান তালাত মাহমুদ রাফি পুলিশের সামনে বুক পেতে আলোচনায় আসেন। রাফির সাহসিকতায় অনুপ্রাণিত হয়ে ১২ জুলাই চট্টগ্রাম শহরে প্রায় ১০ হাজার শিক্ষার্থী বিক্ষোভে অংশ নেন। ১৫ জুলাই ছাত্রলীগের হামলায় চবির সিএসই বিভাগের মাহবুবুর রহমান গুরুতর আহত হলে আন্দোলন আরও বেগবান হয়। ১৬ জুলাই শান্ত, ওয়াসিম ও ফারুক শহীদ হন, যাদের মধ্যে শান্ত ও ওয়াসিমের ঘটনা এই বইয়ে তুলে ধরা হয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হৃদয় চন্দ্র তাড়ুয়া আন্দোলনে নিহত হলে শিক্ষার্থীরা বিক্ষুব্ধ হন।

৭ জুন "চবিয়ান দ্বীনি পরিবার" সংগঠনের শূরা সদস্যরা "কোটা পুনর্বহাল প্রত্যাহার চাই, চট্টগ্রাম" নামে একটি ফেসবুক গ্রুপ চালু করেন, যা পরে "বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, চট্টগ্রাম" নামে পরিচিত হয়। বর্তমানে গ্রুপটির সদস্যসংখ্যা ৭১,০০০+। সৈয়ব আহমেদ সিয়াম, আব্দুর রহমান ও আবরার ফারাবী শুরুতে এডমিন ছিলেন; পরে সমন্বয়ক খান তালাত মাহমুদ রাফি ও রাসেল আহমেদও এডমিন প্যানেলে যুক্ত হন। এই গ্রুপ চট্টগ্রামের আন্দোলনকে অনলাইনে সংগঠিত করতে ভূমিকা রাখে।

আন্দোলনে শিক্ষকদের ভূমিকা

হাতেগোনা কয়েকজন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের দাবির পক্ষে সোশ্যাল মিডিয়ায় নৈতিক সমর্থন দিলেও কার্যত তারা এই ইস্যুতে মাঠে নেমেছেন আন্দোলনের শেষের দিকে। দীর্ঘদিনের ফ্যাসিবাদী শাসনামলে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগে ব্যাপক রাজনীতিকরণ হয়েছে। এখানকার শিক্ষকরা নীল (সরকারি দল) এবং সাদা (বিরোধী দল, বিএনপি ও জামাত ঘরানা) দলের ব্যানারে বিভক্ত হয়ে রাজনৈতিক লেজুরবৃত্তি করেন। বাম ঘরানার শিক্ষকরা আদর্শগত কারণে কোনো ইস্যুতে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেও, সাধারণত তারা আওয়ামী সরকারের সমর্থনকারী হিসেবেই পরিচিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫ জুলাই সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর যে মাত্রায় নির্যাতন এবং তাণ্ডব চালানো হয়, সে তুলনায় ঢাবির শিক্ষকরা কার্যত কোনো পদক্ষেপ নেননি। রূঢ় সত্য হলো, গত কয়েক যুগ ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সত্যিকারের শিক্ষক হয়ে উঠতে পারেননি। তারা শিক্ষকসুলভ নৈতিকতা থেকে বিচ্যুত।

'নিপীড়নবিরোধী শিক্ষক' ব্যানারে শিক্ষক নেটওয়ার্কের সদস্যরা ১৭ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সমাবেশ করেন। সেদিন সাদা দলের শিক্ষকেরাও তাতে যোগ দেন। সমাবেশ শেষে শিক্ষকরা শাহবাগ থানায় গিয়ে দুই শিক্ষার্থীকে ছাড়িয়ে আনেন। ২৭ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২ জন শিক্ষক মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) কার্যালয়ের সামনে হাজির হন। তাঁরা ডিবির হেফাজতে থাকা শিক্ষার্থীদের পরিবারের কাছে হস্তান্তরের দাবি জানান। এই আন্দোলনে শিক্ষকদের মধ্যে সবার আগে রাস্তায় নেমে আসেন ব্র্যাকের সাবেক আলোচিত শিক্ষক আসিফ মাহতাব, যাকে পাঠ্যপুস্তকে ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুতে প্রতিবাদ করায় চাকরিচ্যুত করা হয়। তিনি ১৬ই জুলাই (তখনো আবু সাঈদ শহীদ হননি) নর্থ-সাউথ, আইইউবি এবং এআইইউবি শিক্ষার্থীদের জমায়েতে (বসুন্ধরা গেট-কুড়িল ফ্লাইওভার) কঠোর ভাষায় সরকারের নিন্দা করেন এবং মারমুখী ভূমিকায় অবতীর্ণ পুলিশদের 'সন্ত্রাসী', 'জঙ্গি' বলে আখ্যায়িত করেন। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের হল থেকে জোরপূর্বক বের করে দেওয়ার কারণে আন্দোলন অব্যাহত থাকবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছিল। সেই সময় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আন্দোলনের হাল ধরে।

আসিফ মাহতাব

YOUTUBE.COM
কোটা সংস্কার আন্দোলনে রাস্তায় শিক্ষক আসিফ মাহতাব | Asif Mahtab | Quota Movement | Kalbela
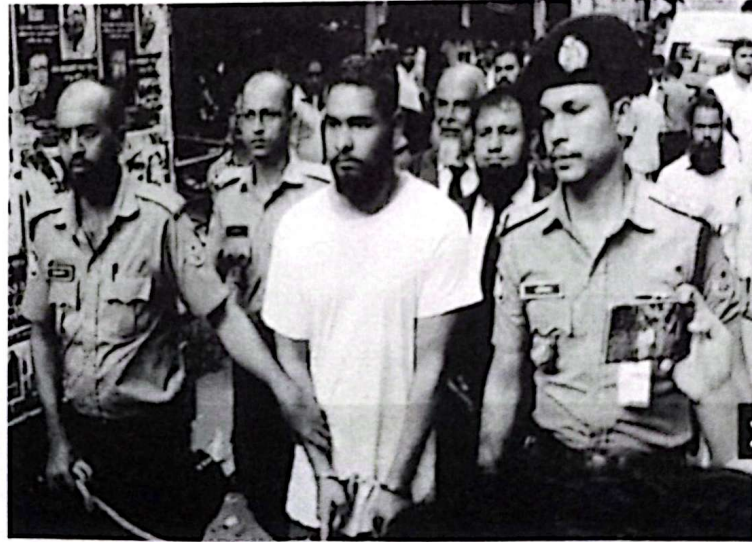
ছবি: আসিফ মাহতাবের বক্তব্য (১৬ জুলাই ২০২৪) QR code স্ক্যান করে দেখা যাবে

সেদিন আসিফ মাহতাব রাস্তায় নেমে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করেন। উল্লেখ্য, তিনি নর্থ-সাউথের প্রাক্তন শিক্ষার্থী এবং আইইউবি ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে তার গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। তাছাড়া, শরীফার ইস্যুতে প্রতিবাদ করায় সাধারণ মুসলিম শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কাছে আসিফ মাহতাব আস্থাভাজন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকার কারণে পরবর্তীতে তাকে গ্রেফতার করে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছিল।

আন্দোলনে মাদরাসার শিক্ষার্থী-শিক্ষকরা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন

বাংলাদেশের মাদ্রাসা ব্যাকগ্রাউন্ডের মানুষগুলোর অবদানকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয় না; তারা মূলধারার সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত। ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মাদ্রাসার শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো। এই কারণে গণঅভ্যুত্থানে মাদ্রাসার শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের ভূমিকাকে আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হচ্ছে। সমকাল পত্রিকা আন্দোলনে নিহত শিক্ষার্থীদের নিয়ে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন প্রকাশের পাশাপাশি মাদরাসা শিক্ষার্থীদের মৃত্যু নিয়ে 'প্রাণ ঝরেছে মাদরাসার ৪৫ শিক্ষার্থীর' শিরোনামে আরেকটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে (২৮ ডিসেম্বর ২০২৪)। সমকাল প্রতিবেদনে লিখেছে—

শহীদের ক্যাটেগরি	শহীদের সংখ্যা
মাদরাসার শিক্ষার্থী	৪৫ জন
প্রাক্তন মাদরাসা শিক্ষার্থী	২৩ জন
মাদরাসা শিক্ষক	৭ জন
মোট শহীদ	৭৫ জন

'ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে জীবন দিয়েছেন ৪৫ মাদরাসা শিক্ষার্থী। যাদের ১৬ জন শিশু। ৭ মাদরাসা শিক্ষকের প্রাণ গেছে স্বৈরাচার পতনের আন্দোলনে। জীবন উৎসর্গ করেছেন প্রাক্তন ২৩ মাদরাসা শিক্ষার্থী। সব মিলিয়ে গণঅভ্যুত্থানে নিহতদের মধ্যে ৭৫ জনের সঙ্গেই মাদরাসার সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ২১ জন ছিলেন পবিত্র কোরআনের হাফেজ। তবে নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন।

'তরুণ আলেম প্রজন্ম' নামের একটি সংগঠন এই তালিকা করেছে। এতে ৭৭ জনের নাম ছিল। সমকাল তথ্য বিশ্লেষণে ৭৫ জনের মাদরাসা-সংশ্লিষ্টতা পেয়েছে।

তামিরুল মিল্লাত মাদরাসার সর্বোচ্চ ৫ শিক্ষার্থী জীবন দিয়েছেন অভ্যুত্থানে। ৪৫ শিক্ষার্থীদের মধ্যে তিনজন বাসায় বা পথে গুলিতে নিহত হয়েছেন, বাকিরা জীবন দিয়েছেন সরাসরি আন্দোলনে নেমে। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন আখতার হোসেন বলেছেন, মাদরাসার শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা জনতার সঙ্গে রাজপথে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।'

সমকাল সেই প্রতিবেদনে ৩৮ জনের নাম ঠিকানা এবং মৃত্যুর তারিখ প্রকাশ করেছে (বইয়ের শেষে চেকলিস্ট-২ দেখুন)। এর মধ্যে ১৮-২০ জুলাইয়ে ১৫ জন শিক্ষার্থী শহীদ হন। সবমিলে জুলাই মাসে ২০ জন শিক্ষার্থী আন্দোলনে প্রাণ দেন। বাকিদের বেশিরভাগ ৪-৫ আগস্টে নিহত হন।

তখনো স্পষ্ট অনুমান করা যাচ্ছিলো না যে শেখ হাসিনার সরকার পতন হবে কিনা, সেই সময় (২৯ জুলাই ২০২৪) বিডিনিউজ২৪ 'যাত্রাবাড়ীতে ৫ দিনের সংঘাতে ওরা কারা?' শিরোনামে বিস্তারিত অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে আন্দোলনে মাদরাসার শিক্ষার্থীদের ভূমিকা নিয়ে লিখেছে-

> *'সরকারি চাকরিতে কোটা নিয়ে আন্দোলনে বড় আকারের সংঘাতের আগেই উত্তপ্ত হয়ে উঠে ঢাকার যাত্রাবাড়ী এলাকা, সংঘাতপূর্ণ অন্যান্য এলাকা শান্ত হতে থাকলেও অনেক বেশি সময় লেগেছে ওই এলাকা নিয়ন্ত্রণে আসতে। কারফিউয়ের মধ্যেও সব মিলিয়ে সংঘাত চলেছে পাঁচ দিন। যাত্রাবাড়ী থেকে প্রতিদিনই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এসেছে মরদেহ, শেষ পর্যন্ত সংখ্যাটি কত দাঁড়াল, সেই হিসাব অবশ্য মেলেনি।*
>
> *কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচির আগেই উত্তাপ- ১৮ জুলাই রাজধানীর বাড্ডা ও উত্তরা এলাকায় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের আগের দিনই উত্তপ্ত হয়ে উঠে যাত্রাবাড়ী। মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারের টোলপ্লাজায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়, সেই আগুন নেভাতে ফায়ার সার্ভিসের গাড়িও যায়নি ভয়ে। পুলিশ সেই রাতে আর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি, বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। ঢাকা-চট্টগ্রাম আর ঢাকা সিলেট তো বটেই, ঢাকার সঙ্গে নারায়ণগঞ্জে যাতায়াতও অসম্ভব হয়ে পড়ে। পরদিন ওই সংঘাত যাত্রাবাড়ী থেকে সাইনবোর্ড হয়ে ছড়িয়ে যায় চিটাগাং রোডের দিকে। আরেক সড়কে ডেমরা রোড ধরে ডেমরা, স্টাফ কোয়ার্টার এলাকাতেও ছড়ায় সংঘাত।*
>
> *আবার এমন ভাষ্যও পাওয়া গেছে যে, সংঘাতে স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি ছিল স্থানীয় শ্রমজীবী, কওমি মাদরাসার শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য।*
>
> *সংঘাতে যারা: রাজধানীর উপকণ্ঠ এই এলাকাটি শ্রমজীবী মানুষদের বসবাসের জন্য পরিচিত। সেখানে আছে বহু কওমি মাদরাসা। এলাকাবাসী ও প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, এই সংঘাতে তারা 'অচেনা' মানুষদের*

দেখেছেন. একই কথা বলছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীও। স্থানীয়রা বলছেন, ১৭ ও ১৮ জুলাই সংঘাতে স্থানীয় কিছু তরুণকে দেখা গেছে যারা ছাত্র নন, সেটা 'দেখেই বোঝা যায়' আশপাশের কওমি মাদরাসার ছেলেরাও সেখানে ছিল। স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা রাতে বাড়ি ফিরে গেলেও 'অছাত্ররা' রাতেও সংঘাত চালিয়ে গেছে।

গত ১৯ ও ২০ জুলাই ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগের সামনে দাঁড়িয়ে দেখা গেছে হতাহতদের বেশিরভাগই নিম্ন আয়ের। তাদের মধ্যে আছে ফুটপাথের ব্যবসায়ী, মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক, অটো চালক, কারখানা কর্মী, রিকশা চালক বা দোকান কর্মী। স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা কমই দেখা গেছে এই দুই দিনের পর্যবেক্ষণে।

সংঘাত থামলেও এলাকার মানুষদের মধ্যে এখনও সেই পাঁচ দিন নিয়ে আলোচনা থামেনি। শনিবার আর কুতুবখালী, রসুলবাগ, মাতুয়াইল মেডিকেল এলাকা ঘুরে স্থানীয়দের নানা বক্তব্য জেনেছে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম। অটো গ্যারেজের এর পরিচালক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলন, 'স্থানীয় ফুটপাথের ব্যবসায়ী, খাবার বিক্রেতা, অটো চালক, মাছের আড়তের কর্মীদের অনেকে ওই সংঘাতে অংশ নেয়। মাদরাসার ছেলেরাও ছিল।'

পুলিশের ওয়ারী বিভাগের একজন কর্মকর্তা বলছেন, 'যাত্রাবাড়ী থেকে কদমতলী এলাকায় প্রচুর মাদরাসা থাকার বিষয়টা সবসময় আমাদের হিসাবের মধ্যে থাকে। সংঘাতে মাদরাসা ছাত্ররা অংশ নিয়েছিল, পাশাপাশি আরও কিছু লোকজন ছিল যারা ছিল ভীষণ বেপরোয়া।'

১৮ জুলাই ঘটনাস্থল ঘুরে আসা সাংবাদিক শেখ আবু তালেব বলছেন, 'সেখানে ছাত্ররা ছিল, মাদরাসা ছাত্ররাও ছিল। আর ছিল কিছু কিশোর-তরুণ যারা ভীষণ বেপরোয়া। তাদের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই তেড়ে আসে। 'গুলি-গ্যাসের মুখেও মাঠ ছাড়ছিল না তারা। তাদের কথাবার্তায় শোনা গেছে যাত্রাবাড়ী থানায় আগুন দেওয়ার উদ্দেশ্যের কথা।'

২১ জুলাই পর্যন্ত রায়েরবাগ, মাতুয়াইল, সাইনবোর্ড, চিটাগাং রোড, ডেমরা, স্টাফ কোয়ার্টার এসব এলাকায় থেমে থেমে সংঘাত চলে। পুলিশের পাশাপাশি র‍্যাব, বিজিবি ও সেনাবাহিনীর অবস্থান ছিল সেখানে। আকাশে অনেকটা নিচু দিয়ে হেলিকপ্টার চক্কর দিতে দেখেছেন স্থানীয়রা।

বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে তীব্র গণ জোয়ার তৈরী হয় আগস্টের ৪ এবং ৫ তারিখে। এই সময়টাতে মাদ্রাসার হাজার হাজার শিক্ষার্থী রাজপথ দখল করে। মাদ্রাসার ভিত্তিক আন্দোলনে একটা বিশেষ দিক হচ্ছে শিক্ষার্থীরা ফজর সালাত আদায় করেই রাস্তায় নেমে পড়ে। এজন্য দেখা যায় ঢাকাবাসী ঘুম থেকে জেগে উঠার আগেই রাজপথ লোকে লোকারণ্য। রাজপথে অনেক লোকের সমাগম হলে সাধারন মানুষের মধ্যে এক ধরণের সাহস তৈরী হয়। ২০১৩ সালের হেফাজত আন্দোলনের সময়ও এমন ঘটেছিলো।

ছবি- আগস্ট ৪ তারিখে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের রাজপথ (ঢাকা, চট্রগ্রাম এবং ময়মনসিংহ) দখলের কিছু স্ন্যাপশট

নতুন নতুন শ্লোগান ছিল ঐক্যবদ্ধের অনুপ্রেরণা

আন্দোলনের ভাষা হলো স্লোগান, যা সাধারণত মিছিল, সমাবেশ কিংবা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি হয়। স্লোগানগুলো আন্দোলনের দাবির প্রতীক হয়ে ওঠে এবং একে অপরকে ঐক্যবদ্ধ করতে টনিকের মত কাজ করে। আন্দোলনের ভাষা কখনো শ্লেষপূর্ণ, কখনো আবার তীব্র প্রতিবাদমূলক হয়ে ওঠে, এবং এটি আন্দোলনের গতি ও আবেগের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে কাজ করে।

কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকে শুরু করে সরকার পতনের দাবিতে স্লোগানগুলোর রূপ পরিবর্তিত হয়েছে। প্রথমদিকে আন্দোলনের স্লোগান ছিল শ্লেষপূর্ণ প্রতিবাদ, যেমন 'আমি কে তুমি কে, রাজাকার, রাজাকার; কে বলেছে, কে বলেছে, স্বৈরাচার, স্বৈরাচার'—এটি কোটা সংস্কার নিয়ে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার বিদ্রুপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ছিল। এই শ্লোগানের মাধ্যমে মূলত মুক্তিযুদ্ধের তথাকথিত 'চেতনা'কে উপজীব্য করে গড়ে ওঠা ট্যাগিং সংস্কৃতির অবসান ঘটে এবং ছাত্র আন্দোলন নতুন মাত্রা লাভ করে। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন সরকারের অপশাসনের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল, তেমনি আন্দোলনকারীদের মধ্যে একাত্মতার অনুভূতি গড়ে তুলেছিল।

সময়ের সাথে সাথে আন্দোলনের ভাষাও বদলেছে। 'এক দুই তিন চার, শেখ হাসিনা গদি ছাড়'—এই শ্লোগানটি ছিল এক ধরনের প্রতীকী প্রতিবাদ, যেখানে আন্দোলনকারীরা সরকার পরিবর্তনের দাবি তুলে। অন্যদিকে, কিছু স্লোগান যেমন 'চাইলাম অধিকার, হয়ে গেলাম রাজাকার' বা 'আপস না সংগ্রাম, সংগ্রাম সংগ্রাম' ছিল সরকারের দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে এক সুস্পষ্ট প্রতিবাদ, যা আন্দোলনকারীদের দৃঢ় সংকল্প এবং অধিকার অর্জনের দৃঢ় প্রত্যয়কে ফুটিয়ে তোলে।

আন্দোলনকারীদের সাহসিকতার বহিঃপ্রকাশে 'বুকের ভেতর অনেক ঝড়, বুক পেতেছি গুলি কর'—এই স্লোগানটি ছিল অত্যন্ত হৃদয়বিদারক এবং আন্দোলনকারীদের প্রাণহানির যন্ত্রণা ও শক্তির প্রতীক। ১৬ জুলাই আবু সাঈদের তিনি পুলিশের গুলিতে শহীদ হলে পুরো দেশের মানুষের আবেগকে নাড়া দেয়। তাঁর এ বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগ ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। এছাড়া নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ করতে 'লাশের ভেতর জীবন দে, নইলে গদি ছাইড়া দে'—এমন স্লোগান ব্যবহার করছিলেন, যা তাদের ক্ষুব্ধ মনোভাব এবং আন্দোলনকে জোরাল করার লক্ষ্যে তৈরি হয়েছিল। স্লোগানগুলোর মধ্যে এখানে জনতার প্রাণহানির মর্ম যাতনা এবং পরিবর্তনের জন্য আত্মবিশ্বাসী করেছিল।

আন্দোলন যত এগিয়ে চলে, ততই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এসব স্লোগান ভাইরাল হতে শুরু করে। 'নাটক কম করো পিও'—এটি সৃষ্টি হয়েছিল শেখ হাসিনার ভাষণের পর, যেখানে তিনি শহীদদের প্রতি কোনো সমবেদনা দেখাননি। 'ইন্টারনেট বন্ধ করি নাই, একা একা বন্ধ হয়ে গেছে'- এই স্লোগানটি সরকারের ইন্টারনেট বন্ধ করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ক্ষোভ প্রকাশ এবং ব্যঙ্গ করতে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। কিছু স্লোগান হাসির খোরাক জুগিয়েছিল। যেমন 'মুরুব্বি মুরুব্বি, উঁহু উঁহু' এবং 'যার যার অবস্থান থেকে পালাও'—এগুলো রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের মাঝে কিছুটা স্বস্তি আনছিল, বিনোদন দিয়েছিল।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের জাতীয় নির্বাচনের আগে এক জনসভায় শেখ হাসিনার প্রশংসায় বলেছিলেন, শি হ্যাজ মেড আস স্ট্যান্ড টলার। সেই বক্তব্যে ভুল ইংরেজিতে আরও কিছু কথা বলেন কাদের। শেখ হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার পর সেই বক্তব্যের স্যাটায়ার করে ছাত্র-জনতা তৈরি করে নতুন স্লোগান— 'শি হ্যাজ মেইড আস ফ্লাই ফাস্টার।' উনার বক্তব্যকে কেন্দ্র করে আরেকটি স্লোগান ভাইরাল হয়, পালাব না...প্রয়োজনে ফখরুল সাহেবের বাড়িতে যাব।' আওয়ামী লীগ বেশিদিন টিকবে না, এমন কথার পরিপ্রেক্ষিতে কাদের মজা করে বলেছিলেন। হাসিনা ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর এই স্লোগানটি জনপ্রিয় হয়েছিল, 'শেখ হাসিনা পালায় না।'

গণঅভ্যুত্থানে সাধারণ জনতার অংশগ্রহণের নেপথ্যে অনুপ্রেরণা কী হতে পারে?

কোটা সংস্কার আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল সরকারি চাকরির নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বৈষম্যের নিরসন। এখানে কার্যত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্বার্থ জড়িত ছিল। অর্থাৎ এটি সাধারণ জনতার ইস্যু ছিল না।

গণঅভ্যুত্থানে হতাহতের প্রাথমিক পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তুলনায় সাধারণ জনতা তাৎপর্যপূর্ণভাবে বা অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে (disproportionately) বেশি হতাহত হয়েছেন, এমনকি মাদরাসার শিক্ষার্থীদের মধ্যে শহীদের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ। এতগুলো মানুষ কি শুধু ভোটাভুটি বা নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার পালাবদলের জন্য আত্মত্যাগ করেছেন? তাঁদের অন্তর্নিহিত অনুপ্রেরণার নেপথ্যে গভীর বিশ্লেষণ জরুরি।

এই অঞ্চলের মানুষের মনস্তত্ত্ব গভীরভাবে অনুধাবন করতে হলে ইতিহাসে ফিরে যেতে হবে। ব্রিটিশ শাসকরা ভারতীয় উপমহাদেশে প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলার জন্য ১৮৭১-৭২ সালে প্রথম জনসংখ্যা জরিপ পরিচালনা করে, যেখানে ধর্মীয় পরিচয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেই জরিপ অনুযায়ী, পশ্চিম বঙ্গ (কলকাতা, বিহার) হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় কলকাতাকে প্রশাসনিক কেন্দ্র ঘোষণা করা হয়, আর পূর্ব বঙ্গ (বাংলাদেশ, আসাম) মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায়, ঢাকাকে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়। সেই সময় ঢাকা, সিলেট ও চট্টগ্রামে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৬০% এর বেশি, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের সংখ্যা ছিল ৭০% এর বেশি[২৯]। ১৯৪৭ সালের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার ফলে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর ধর্মভিত্তিক অভিবাসন (migration) ঘটে। অবশেষে, ব্রিটিশদের উপমহাদেশ ত্যাগের সময় ধর্মের ভিত্তিতে দুটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বহিঃশত্রুর (কলোনাইজার) বিরুদ্ধে লড়াই করে টিকে থাকা এই ব-দ্বীপের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠী গত দুই শতাব্দী ধরে রক্ত ও প্রাণ বিসর্জন দিয়ে আসছে। এই জনপদের মানুষ যুগের পর যুগ ইংরেজদের শোষণ ও দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে—বুলেটের বিপরীতে বাঁশের লাঠি হাতে নিয়ে ইতিহাস রচনা করেছে। অসংখ্য প্রাণ ও রক্তের বিনিময়ে ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম হয়। মুসলিম পরিচয় (Religious Identity) শুধুই রাষ্ট্রগঠনের ভিত্তি ছিল না; এটি একটি ঐতিহাসিক প্রতিরোধের চেতনার প্রতিফলন।

এত ত্যাগের বিনিময়ে তাদের চাওয়া ছিল সামান্য—ইনসাফ (মুসলিম হিসেবে অধিকার, সুবিচার, সুশাসন) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এমন এক সমাজ, যেখানে তারা স্বাধীনভাবে জীবন-জীবিকা গড়তে পারবে এবং নিজেদের মানোন্নয়নে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হবে। কিন্তু নতুন দেশেও সাধারণ মুসলমানদের স্বপ্নভঙ্গ ঘটে। ক্ষমতা-কেন্দ্রিক রাজনীতির কারণে ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন, অথচ ভারতবেষ্টিত পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) মানুষ জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে নানাভাবে বৈষম্যের শিকার হয়। এরই ফলশ্রুতিতে, অনেক মানুষের আত্মত্যাগের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে এই জনপদ নতুন দেশ হিসেবে স্বাধীনতা অর্জন করে।

---

[২৯] Henry Waterfield , (1875), Memorandum on the Census of British India 1871-72 London , Eyre and Spottiswoode

স্বাধীন দেশের সংবিধান রচনার সময়, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনসংখ্যার এই দেশে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে সেক্যুলারিজম (যা অনুবাদ করা হয় 'ধর্মনিরপেক্ষতা' হিসেবে) অন্তর্ভুক্ত করা হয় বামপন্থী লিডারশিপ এবং ভারতের প্রভাবে। সাধারণ মানুষ তখন এই শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পারেনি।

এই দেশের মুসলিম পরিচয় যে প্রাণের ইস্যু, তা উপলব্ধি করে শেখ মুজিবুর রহমান ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য হন যে, সেক্যুলারিজম মানে ধর্মহীনতা নয়, বরং সকল ধর্মের সহাবস্থান। কার্যত, তিনি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ থেকে সরে আসেন। ১৯৭৯ সালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সংবিধান সংশোধন করে

'আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেন। অর্থাৎ, তিনি এই ভূখণ্ডের মুসলিম পরিচয় তথা ইসলামি চেতনাকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।[৩০]

১৯৭২-১৯৭৯	**ধর্মনিরপেক্ষতা**
১৯৭৯-২০১১	**আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস**
২০১১-২০২৫	**ধর্মনিরপেক্ষতা**

জাতীয়তাবাদী বিএনপি একটি জনপ্রিয় দলে পরিণত হওয়ার নেপথ্যে প্রো-ইসলামিক চেতনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সংবিধানে মুসলিম পরিচয় বিষয়ক ইস্যুটি ১৯৭৯ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত বলবৎ ছিল। ২০০০ সালের আগ পর্যন্ত আওয়ামী লীগও সেক্যুলারিজম ইস্যুকে বিশেষভাবে লালন করেনি।

১৯৭১ সালের পর থেকে বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা এবং তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গণমাধ্যম সেক্যুলারিজমকে মূলনীতি হিসেবে প্রচার করে আসছে এবং তারা ১৯৭১-কে ইসলামিক আইডেন্টিটির পরাজয় হিসেবে উপস্থাপন করেছে।

মজার বিষয় হলো, ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগ ইসলামিক আইডেন্টিটি ইস্যু নিয়ে শঙ্কায় ছিল। দলটি যে ইসলামবিরোধী নয়, তা প্রমাণ করতে শেখ হাসিনা নির্বাচনী প্রচারাভিযানে হিজাব পরিধান করতেন এবং হাতে তাসবিহ রাখতেন। সেই সময় আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম। অনেক মানুষ শেখ হাসিনার এই বার্তায় বিশ্বাস করে তাকে ভোট দিয়েছিল। ১/১১ এর পর ২০১৪ সালে ক্ষমতায় ফিরে হাসিনা প্রথম ভাষণে বলেছিলেন, দেশ মদিনা সনদে চলবে। এটা ছিলো বিরাট ধোঁকা।

---

[৩০] Islam, Politics and Secularism in Bangladesh: Contesting the Dominant Narratives, Soc. Sci. 2018, 7(3), 37; https://doi.org/10.3390/socsci7030037

ফ্যাসিবাদ শাসনামলে ইসলামোফোবিয়ার পরিবেশ

সেপ্টেম্বর ইলেভেন পরবর্তী প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের 'ওয়ার অন টেরর' ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, শেখ হাসিনার সরকার বাংলাদেশে ইসলামের প্রভাব কমিয়ে ফেলার (de-Islamization) কৌশল গ্রহণ করে, যার অন্যতম লক্ষ্য ছিল, পশ্চিমা শক্তির সমর্থন অর্জন করা। এই কৌশলটি বাস্তবায়িত করার দুটি প্রধান পন্থা গ্রহণ করা হয়—প্রথমত, ইসলামি দল ও প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া এবং দ্বিতীয়ত, ইসলামি চর্চা সীমিত করা। ইসলামি প্রতীক, দল ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর ধর্মনিরপেক্ষকরণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

এই প্রকল্পের ভিত্তি স্থাপিত হয় ২০০৮ সালে হার্ভার্ড ইন্টারন্যাশনাল রিভিউতে প্রকাশিত 'Stemming the Rise of Islamic Extremism in Bangladesh' প্রবন্ধে, যা লিখেছিলেন শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় এবং সাবেক মার্কিন সামরিক কর্মকর্তা কার্ল জে. চিওভাকো। প্রবন্ধে দাবি করা হয় যে, বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ করতে হলে মাদরাসা শিক্ষা, সামরিক বাহিনী ও প্রশাসনকে ধর্মনিরপেক্ষীকরণ করতে হবে এবং আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনতে হবে। এই নীতির আওতায় ইসলামি প্রতিষ্ঠান ও প্রতীকগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। সরকার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ব্যবহার করে বাংলাদেশকে ইসলামি সন্ত্রাসীদের হাতে পতনের ঝুঁকিতে থাকা দেশ হিসেবে চিত্রিত করে ইসলামকে রাজনীতি ও সমাজ থেকে নির্মূল করার চেষ্টা করেছে।

সরকারের গৃহীত কিছু পদক্ষেপের মধ্যে ছিল—ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে জঙ্গিবাদের অভিযোগ আনা, যুদ্ধাপরাধের বিচার নিয়ে নতুন আলোচনা তৈরি করা। ইসলামি দল ও নেতৃত্বের ওপর দমন-পীড়ন। ইসলামি প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করা এবং শিক্ষা ব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষ করা।

সরকারের ইসলামি প্রতীক ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি আক্রমণের উদাহরণ হিসেবে, ১ এপ্রিল ২০০৯ সালে তৎকালীন আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ বলেন, কওমি মাদরাসাগুলো ধর্মভিত্তিক সন্ত্রাসবাদের প্রজনন কেন্দ্র হয়ে উঠছে। ১৬ জুলাই ২০১০-এ তৎকালীন ডেপুটি স্পিকার কর্নেল (অব.) শওকত আলী মেয়েদের পোষাক বোরকার বিরুদ্ধে বলেন, 'যাদের চেহারা কুৎসিত, তারাই ধর্মকে ব্যবহার করে মুখ ঢাকে'। সজীব ওয়াজেদ জয় দাবি করেন যে, ২০০১-২০০৬ সালে বোরকার বিক্রি ৫০০ শতাংশ বৃদ্ধি পায় এবং এটিকে 'ইসলামপন্থার উত্থানের ইঙ্গিত' হিসেবে উল্লেখ করেন (Ciovacco & Wazed, ২০০৮)।

ফলস্বরূপ, ২০১৩ সালে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম নার্সিং কলেজ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ নিকাব নিষিদ্ধ করে। চট্টগ্রাম নার্সিং কলেজের ছাত্রীদের অভিযোগ ছিল যে, কলেজের অধ্যক্ষ হোসনে আরা নামাজ আদায় করতেও বাধা দেন। তিনি বলেন, 'ভালো নার্স হলে নামাজ লাগবে না।'

এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে সিংগাপুরের Nanyang Technological University গবেষকদের উদ্যোগে প্রকাশিত সোস্যাল সায়েন্স জার্নালে প্রকাশিত নিবন্ধ থেকে ভালো ধারণা পাওয়া যেতে পারে—

Islam, Politics and Secularism in Bangladesh: Contesting the Dominant Narratives, Soc. Sci. 2018, 7(3), 37; https://doi.org/10.3390/socsci7030037

২০০৯-২০১০ থেকে অনলাইনে ব্লগিংয়ের মাধ্যমে ইসলামবিরোধী মিথ্যাচার এবং বিষেদগার বাড়তে থাকে। তখন আমি সিংগাপুর ন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি শেষ করে ডিইউক এনইউএস গ্রাজুয়েট মেডিকেল কলেজে পোস্টডক শুরু করেছিলাম। প্রফেট মুহাম্মাদ (সা) সম্পর্কে ইসলামবিদ্বেষ এতই বেড়ে গিয়েছিল যে, আমরা দেশ-বিদেশে একাডেমিশিয়ান-ব্লগাররা প্রতিবাদ হিসেবে তাদের মিথ্যাচারের উন্মোচন করেছি। পরবর্তীতে অনলাইনের সেই প্রকাশ্য ইসলাম বিরোধী গ্রুপটি শাহবাগ মুভমেন্ট তৈরি করে, যুদ্ধপরাধীদের বিচারের দাবিতে।

এই দেশের মানুষ ধর্ম-কর্মে যত্নবান না হলেও অবচেতনভাবে ইসলামিক চেতনা লালন করে, এবং ইসলামিক পরিচয় দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। এর পক্ষে একটি শক্তিশালী প্রমান হচ্ছে শাহবাগ ইস্যু। ২০১৩ সালে শাহবাগ আন্দোলন যখন তুঙ্গে, সারাদেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে, তখন আমি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করি। ইসলামবিদ্বেষী ব্লগার 'থাবা বাবা'র হত্যাকাণ্ডের পর শাহবাগে তার জানাজার নামাজ পড়া হয় এবং তাকে দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহীদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

ইনকিলাব এবং আমার দেশ পত্রিকায় মুহাম্মাদ (সা)-এর বিরুদ্ধে শাহবাগীদের অশ্লীল মিথ্যাচার সম্পর্কে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে সারাদেশের মুসলিমরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে।

যুদ্ধপরাধী বিচারের শুরুতে সাধারণ মুসলিম এবং মাদরাসা ব্যাকগ্রাউন্ডের মানুষরা নীরব ছিল। কিন্তু যখন শাহবাগকে ইসলামিক পরিচয়ের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর চেষ্টা হলো, তখন মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এতে শাহবাগের নৈতিক পরাজয় ঘটে।

সেই ইস্যুতে ৫ মে ২০১৩ সালে শাপলা চত্বরে গণহত্যা ঘটে। শত শত মাদরাসা শিক্ষার্থী এবং সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। দেশের বামপন্থী মিডিয়ার মাধ্যমে জঙ্গিবাদকে চিত্রিত করে হাজার হাজার আলেম-উলামাকে গ্রেফতার করা হয়। এক লক্ষ মানুষকে আসামী করে সরকার মামলা করে।

২০১৬ সালে জঙ্গি বিরোধী অভিযানে চার দিনে মোট ১১ হাজার ৬৪৭ আলেম-উলামা, ইসলামপন্থী মানুষকে গ্রেফতার করে।[৩১] জঙ্গির নাটক সাজিয়ে অনেকে নিরীহ মানুষকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গত ১৫ বছরে ৩০০০ থেকে ৪০০০ গুমের ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।[৩২]

শেখ হাসিনা সরকার বিরোধী দল বিএনপি যেন ক্ষমতার বাইরে থাকে এজন্য হাজার হাজার কর্মীকে জেলে ভরেছে, হত্যা-গুম করেছে। ২০০১ সালের নির্বাচনে ইসলামিক চেতনার বিএনপি এবং ইসলামপন্থী দল জামাতে ইসলামি জোট করায় নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে। ভারত সবসময়ই বিএনপির বিপক্ষে ছিল। ভারতের প্রভাবের কারণে ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪-এর ভুয়া নির্বাচন করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে আওয়ামী লীগ।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় জোর করে থাকার জন্য ভারত তোষণ নীতি গ্রহণ করে। একারণে ভারতের আধিপত্যবাদী আচরণকে তুষ্ট করতে সরকারি প্রশাসন, বিশ্ববিদ্যালয়—সব জায়গায় হিন্দু আইডেন্টিটির মানুষকে বিশেষভাবে প্রমোট করা হয়েছে, যা দৃষ্টিকটু পর্যায়ে চলে গিয়েছে।

২০২১ সালে ভারতের আধিপত্যবাদী নীতির প্রতিক্রিয়ায় হিন্দুত্ববাদী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঢাকায় আগমনের বিরুদ্ধে সংঘটিত দুই দিনের আন্দোলনে ১৭ জনকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করে এবং ৫ শতাধিক ব্যক্তিকে আহত করে, এছাড়া সেসময় গ্রেফতার করা হয়েছে ২ শতাধিক ব্যক্তিকে।[৩৩]

ধর্মনিরপেক্ষ দেশ তৈরী করার লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়। ধর্মীয় শিক্ষা গুরুত্বহীন করা হয়। যৌন শিক্ষা, ট্রান্সজেন্ডারবাদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই অঞ্চলের মুসলিম জনগোষ্ঠীর সত্য ইতিহাস বিকৃত করে উপস্থাপন করা

[৩১] ''গুপ্তহত্যা' ও 'বন্দুকযুদ্ধ' প্রথম আলো, ১৫ জুন ২০১৬

[৩২] 'গুম হওয়া মানুষের সংখ্যা সাড়ে তিন থেকে চার হাজার হতে পারে'এখন টিভি, ২২ নভেম্বর ২০২৪

[৩৩] সরকারি হিসাবে নিহত ১৭ জন, বেশির ভাগই সাধারণ মানুষ' প্রথম আলো, ৬ এপ্রিল ২০২১

হয়। বাচ্চাদের অভিভাবকরা দিশেহারা হয়ে যান, প্রতিবাদ করতেও ভয় পান। পাঠ্যপুস্তক ইস্যুতে প্রতিবাদ করার কারণে শিক্ষার্থীদের পিতামাতাকে গ্রেফতার করার নিকৃষ্ট নজির স্থাপন করা হয়।

কারিকুলামে ইসলামি মূল্যবোধকে গুরুত্বহীন করার কারণে স্কুল থেকে তাদের সন্তানকে সরিয়ে মাদরাসায় ভর্তি করার ঘটনা অনেক বেড়ে যায়। ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত বাংলাদেশ শিক্ষাবাতায়ন ও পরিসংখ্যান ব্যুরো-ব্যানবেইসের তথ্য বলছে, চার বছরে ১০ লাখ ৩৭ হাজার ২৩৯ জন শিক্ষার্থী কমেছে মাধ্যমিক স্কুলে। এরা মূলত মাদরাসায় ভর্তি হয়েছে।[৩৪] মাদরাসা কারিকুলাম থেকে পাশা করা শিক্ষার্থীরা যেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি না হতে পারে, এজন্য ভর্তি ক্রাইটেরিয়া পরিবর্তন করা হয়েছিল। এটা নিয়ে কোর্টে মামলা হয়।

বাংলাদেশের মতো ৯০% মুসলিম অধ্যুষিত দেশে ফ্যাসিবাদের শাসনামলে ইসলামোফোবিয়া এমন পর্যায়ে পৌছে যে, ইসলামি বেশভূষার কারণে চাকুরি থেকে বঞ্চিত করা হয়। 'Religious high school graduates face labor market discrimination in Bangladesh: study' শিরোনামে মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটি এবং বিশ্বব্যাংকের যৌথ গবেষণায় বাংলাদেশে শ্রমবাজার-বৈষম্যের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-প্রমাণ উন্মোচিত হয়েছে। গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে যে, মাদরাসা ব্যাকগ্রাউন্ডের গ্র্যাজুয়েটদের বিরুদ্ধে বৈষম্য করা হয়, যদিও তাদের যোগ্যতা সাধারণ কারিকুলামের শিক্ষার্থীদের সমান ছিল। সমান যোগ্যতা থাকার পরও মাদরাসা ব্র্যাকগ্রাউন্ডের পুরুষ প্রার্থীদের ইসলামি বেশভূষার কারণে কমপক্ষে ১৭১% বেশি চাকরিতে আবেদন করতে হয়েছে। ধর্মীয় পোশাকের প্রভাবও চাকুরিতে নিয়োগের সিদ্ধান্তে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দাড়ি বা টুপি পরা পুরুষ প্রার্থীরা বেশি বৈষম্যের শিকার হন। মিডিয়া এবং কর্পোরেট সেক্টরে ধর্মীয় পোশাকের কারণে বৈষম্য ছিল, তবে আইটি সেক্টরে কোনো দৃশ্যমান পক্ষপাতিত্ব ছিল না।

২০১৯ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত গণমাধ্যমে প্রকাশিত ইসলামোফোবিয়ার ঘটনার প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে করেছি। এত দেখা যায়, মুসলিম নারীরা হিজাব বা নিকাব পরিধানের কারণে ইসলামোফোবিক আচরণের শিকার হচ্ছেন। এছাড়া দাড়ি এবং টুপি পরা মুসলিম ছেলেদেরও হেনস্তার সম্মুখীন হতে হয়। ইসলাম ধর্মের সিম্বল বা প্রতীকগুলো বিভিন্ন জায়গায় অবমাননা করা হয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজনেও বাধা প্রদান করা হয়েছে।

[৩৪] 'স্কুলে কমছে শিক্ষার্থী, বাড়ছে মাদরাসায়' ঢাকা টাইমস, ২ এপ্রিল ২০২৪

বেশিরভাগ ইসলামোফোবিক ঘটনা সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হয় না। অধিকাংশ ঘটনা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঘটেছে, এবং এর মধ্যে বেশিরভাগই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ঘটেছে। আমাদের সংগৃহীত ৬১টি ঘটনার মধ্যে ১৬টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪টি ইসলামোফোবিক ঘটনা সংগৃহীত হয়েছে। স্কুল ও কলেজগুলোতে ১৫টি ইসলামোফোবিক ঘটনা পাওয়া গেছে। দুটি হাসপাতালে হিজাব-নিকাব নিষিদ্ধ করার মতো ঘটনা লক্ষ করা গেছে।

এছাড়া, শিল্পকলা একাডেমি, সরকারি মন্ত্রণালয় এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিদের মাঝে ইসলামোফোবিক আচরণের প্রমাণ পাওয়া গেছে। দাড়ি-টুপির কারণে চাকরির ক্ষেত্রেও বৈষম্য করা হয় এবং ইসলামী অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে বাধা দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি ইসলামোফোবিয়ার প্রাদুর্ভাব এবং এর প্রভাব নিয়ে একটি গবেষণা প্রায় শেষ করেছি। ১৬৬৫ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং ইয়াং প্রফেশনাল (১৮ থেকে ৩০+ বছরের মধ্যে) নিয়ে স্টাডি করেছি, যাদের বাহ্যিকভাবে ইসলামি বেশভূষা রয়েছে। ডেটা এনালাইসিসে দেখা গেছে, এদের ৫৭% ইসলামোফোবিয়ার শিকার। ইসলামোফোবিয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি জড়িত শিক্ষকরা! যা আমাদের গবেষণায় উঠে এসেছে। বাংলাদেশে শিক্ষার্থীরা যেভাবে কাঠামোগত ইসলামোফোবিয়া শিকার হয়, অমুসলিম দেশেও সম্ভবত এমনটি বিরল।

QR code স্ক্যান করে বাংলাদেশের ইসলামোফোবিয়ার তথ্য-উপাত্ত দেখা যাবে

উপরোক্ত তথ্য-উপাত্ত থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ ইসলাম চর্চায় তেমন আগ্রহী না হলেও ইসলামি পরিচয় বা চেতনার ব্যাপারে সচেতন। এই দাবির পক্ষে আরেকটি গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরছি। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান প্রফেসর আলী রিয়াজ ২০১৭ সালে এই শিরোনামে 'Democracy and Sharia in Bangladesh' একটি সিস্টেম্যাটিক জরিপ করেন (https://resolvenet.org/research/democracy-and-sharia-bangladesh-surveying-support)। এই স্টাডি ৪০৬৭ জন মানুষের ওপর করা হয়েছিলো। এই গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, বাংলাদেশের সিংহভাগ মানুষ সুশাসন ও

আইনি ব্যবস্থার দিকনির্দেশনা হিসেবে শরিয়াহর (ইসলামিক মূল্যবোধ ভিত্তিক) আইন সমর্থন করে এবং পাশাপাশি নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার ব্যবস্থার প্রতি ব্যাপক সমর্থন রয়েছে। যেমন প্রায় ৭৩ শতাংশ মুসলিম উত্তরদাতা বিশ্বাস করেন যে, শরিয়াহভিত্তিক আইন ব্যবস্থা দুর্নীতি কমাতে সাহায্য করবে এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে ৪৩ শতাংশ অমুসলিমও এতে সম্মত। গড়ে ৮০ শতাংশের বেশি উত্তরদাতা একমত যে, শরিয়াহ মৌলিক সেবা প্রদান, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক হবে।

গত ১৫ বছরের শাসনামলে সাধারণ মুসলিম, মাদ্রাসার সাথে জড়িত লোকরা ইসলামোফোবিয়ার শিকার হয়েছে। ভারতের আধিপত্যবাদী আগ্রাসনের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে মুসলিম পরিচয়ের ইস্যুও।

ফ্যাসিবাদের আমলে রাজনৈতিক কারণে হত্যা, গুম, জেল-জরিমানা এবং ধর্মীয় ইস্যুতে সাধারন মানুষ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিলো। দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বিস্ফোরণের প্রকাশ ঘটে গণঅভ্যুত্থানে, যেখানে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন বারুদের ভূমিকা পালন করেছে। শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে অরাজনৈতিক প্লাটফর্মের ব্যানারে দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ পজিটিভ পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষায় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং এর ফলে শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

মুসলিম হিসেবে অধিকার, সুবিচার, সুশাসন তথা ইনসাফের দাবিতেই জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আবু সাঈদরা বুলেটের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে রচনা করেন নতুন এক অধ্যায়। হাজারো ছাত্র-জনতার রক্ত ও প্রাণের বিনিময়ে, অন্ধত্ব ও পঙ্গুত্বের যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে, ৫ আগস্টে আবারও জেগে ওঠে এক নতুন স্বপ্ন। এত ত্যাগের পরও কি সেই স্বপ্ন, সেই ইনসাফ ভিত্তিক কাঙ্ক্ষিত সমাজব্যবস্থা আবারও অধরাই থেকে যাবে?

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মহানায়ক

শহীদের নাম: আবু সাঈদ
বয়স: ২৩ বছর, ৭মাস (জন্ম-১০ ডিসেম্বর ২০০০)
মৃত্যুর তারিখ: ১৬ জুলাই ২০২৪
পিতা: মকবুল হোসেন
মাতা: মনোয়ারা বেগম
ঠিকানা: জাফরপাড়া, পীরগঞ্জ, রংপুর
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক (ইংরেজি বিভাগে অধ্যায়ণরত, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়)

আবু সাঈদ কোটা সংস্কার আন্দোলনের (যা পরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন হিসেবে পরিচিতি পায়) শুরু থেকেই (জুন ২০২৪) সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ফ্যাসিস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষার্থীদের অবজ্ঞা করে 'রাজাকারের বাচ্চা' বলে সম্বোধন করলে, ১৪ই জুলাই রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস উত্তাল হয়ে ওঠে। শিক্ষার্থীরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং 'আমি কে, তুমি কে, রাজাকার, রাজাকার' শ্লোগানে ক্যাম্পাস প্রকম্পিত করে। এর প্রতিক্রিয়ায়, ১৫ই জুলাই সরকার-সমর্থিত সন্ত্রাসী গোষ্ঠী দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর বর্বর আক্রমণ চালায়। এই দমন-পীড়নের প্রতিবাদে, ১৬ই জুলাই দেশব্যাপী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মিছিল ও মানববন্ধন কর্মসূচি ঘোষণা করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়করা। ফ্যাসিবাদের শাসনামলে হত্যা, গুম, এবং জঙ্গি ট্যাগিংয়ের মাধ্যমে বিনা বিচারে কারাগারে আটকে রেখে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছিল। পুলিশের বন্দুকের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে সেই রাজত্ব চুরমার করে দেন আবু সাঈদ। তাঁর অসীম সাহসিকতায় অনুপ্রাণিত শিক্ষার্থী-জনতা, দল-মত নির্বিশেষে রাস্তায় নেমে আসে, বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন রূপ নেয় গণঅভ্যুত্থানে।

Abu Sayed
15 Jul 2024

উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সরকারের একেকজন এক মন্ত্রীরা বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে এইসব পোস্ট করে যাচ্ছেন।

যেখানে তাদের উচিৎ ছিল সাধারণ শিক্ষার্থীদের অবস্থা যে ভাষায় আক্রমণ করা হয়েছে তার প্রতিবাদ করা। অথচ তারা সম্মিলিতভাবে সাধারণ শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে চলেছেন।

তাদের সাহস কি করে হয় সাধারণ শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা বিরোধীদের সাথে তুলনা করার? স্বাধীনতার পক্ষ শক্তি বিপক্ষ শক্তির সার্টিফিকেট দেয়ার অধিকার আপনাদের কে দিয়েছে? আপনাদের মতের সাথে না মিললেই সে রাজাকার এই অপকৌশল এখন আর চলবে না।

আপনারা ভিন্নমত সহ্য করতে পারেন না এটাই প্রতীয়মান হচ্ছে আপনাদের আচরণে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর হামলার অধিকার আপনাদের ছাত্রসংগঠনকে কে দিয়েছে?

দেশের মালিক জনগণ, কাজেই জনগণের ইচ্ছা কে প্রাধান্য দিন। সরকার যা চাইবে তাহাই হইবে এটা কোনো গণতান্ত্রিক দেশের চিত্র হতে পারে না।

Abu Sayed
15 Jul 2024

যদি আজ শহিদ হয় তবে আমার নিথর দেহটা রাজপথে ফেলে রাখবেন।
ছাত্র সমাজ যখন বিজয় মিছিল নিয়ে রুমে ফিরবে তখন আমাকেও বিজয়ী ঘোষণা করে দাফন করবেন।
একজন পরাজিতের লাশ কখনো তার মা-বাবা গ্রহণ করবে না।

আদনান আবির
সমন্বয়ক
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন

আবু সাঈদদের সাথে শেষ আলাপচারিতায় তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফরহাদ হোসাইন (কারমাইকেল কলেজ [রংপুর]-এর শিক্ষার্থী) এবং মো. রাসেল (মহিপুর হাজি মহসিন সরঃ কলেজ [জয়পুরহাট]-এর শিক্ষার্থী) ১৫ জুলাই রাতের ঘটনা বর্ণনা করেন এভাবে—

'১৫ তারিখ সন্ধ্যায় আবু সাঈদসহ আমাদের আড্ডার পরিকল্পনা ছিল। ফোনে আবু সাঈদকে পাওয়া যাচ্ছিল না বিধায় আমরা ওর রুমে যাই। সেদিন বিকাল ৪টায় বেরোবি থেকে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের মিছিল বের হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ছাত্রলীগের বাধার কারণে সেই মিছিল বের হতে পারেনি। আবু সাঈদের পুরানো সেকেন্ড হ্যান্ড ফোনসেট নষ্ট হওয়ার কারণে ঢাকার সমন্বয়কদের সাথে যোগাযোগ করতে পারতেছিল না। রুমমেইটের ফোনে ১৫ জুলাইতে সংঘটিত ঢাকাসহ সারাদেশে ছাত্রদের ওপর হামলার পোস্ট ও ভিডিও দেখার পর আবু সাঈদকে খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছিল, ওকে এমনটা আমরা আগে কখনো দেখিনি, আমাদের কাছে কিছুটা অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল।

ওর কাছ থেকে ক্যাম্পাসের বিস্তারিত বিষয় জানতে চাইলে সাঈদ বলে, 'ক্যাম্পাসে আন্দোলন করার এক পর্যায়ে আন্দোলনরত বেরোবির এক জুনিয়র ছাত্রের মোবাইল কেড়ে নেওয়া ঠেকাতে গেলে ১১ জুলাই বেরোবির ছাত্রলীগ সভাপতি পোমেল বড়ুয়া আমাকে চড়থাপ্পড় মারে।'

সব শোনার পরে আমরা ওকে বুঝানোর চেষ্টা করি, তুই সমন্বয়কদের ভূমিকায় আছিস ঠিক আছে। যেহেতু আমরা অবস্থানগত কারণে তোর সাথে মিছিলে যেতে পারিনা, কাজেই এটা বোঝাই যে, তুই যা কিছুই করিস, তোর ব্যাকআপটা যেন ভালো থাকে। তোর সঙ্গে যারা আছে, তারা যেন তোকে সেফ রাখতে পারে। এই ব্যাকআপ নিয়ে তুই নেতৃত্ব দিবি সমস্যা নেই। আর তোর ব্যাকআপ না

থাকে তাহলে পেছন থেকে নেতৃত্ব দেওয়াই ভালো হবে। সামনে আসার দরকার নাই। তখন যেহেতু অবস্থা ভালো ছিল না। ছাত্রলীগ মারামারি করতেছিল, তাই আমরা বলেছি, তুই যাই করিস নিজেকে সেফ রেখে তারপর তুই নেতৃত্ব দিবি। তোর সাথে যদি কেউ না থাকে, তুই যদি একাই করিস আন্দোলন, তাহলে তো পারবি না। আমরা ওকে এটাই বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম।

তখন সাঈদ পাল্টা জবাব দেয়—

'আমার যদি কিছু হয়, তোরা বন্ধুরা কষ্ট পাবি বা কান্না করবি, আমার ফ্যামিলি কান্না করবে। সেম জায়গায় আমার জায়গায় যদি অন্য কেউ নেতৃত্ব দেয় তারও বন্ধু ফ্যামিলি আছে। তারাও কষ্ট পাবে, তারাও যদি সেম কথা বলে। তারাও যদি নিষেধ করে এরকম করে, তাহলে নেতৃত্ব দিবে কে? কাউকে-না-কাউকেই তো নেতৃত্ব দিতে হবে। আমি আল্লাহর সাথে কথা বলছি, আল্লাহ আমাকে যেভাবে চায় সেভাবেই যেন চালায়। যা আমার জন্য ভাল হয়, সেটাই যেন হয় আমার সঙ্গে। তুই যদি সারাদিন সারারাত আমাকে বুঝাইস যে, আমি কালকে মিছিলে যাব কি যাব না, আমি এই মুহূর্তে কোন ডিসিশন নিতে পারব না, আমার নিজের কথাও না আমার বাবার কথাও না আমার ফ্রেন্ডদের কথাও না। আমি কালকে কী করব, এখন অব্দি আমার কোনো চিন্তাই নেই, আমি কালকে কী করব। আমার জন্য যদি ভাল হয়, কালকে মিছিলে যাওয়া। আল্লাহ যদি চেয়ে থাকেন, তাহলে আমি যাব। আর যদি আল্লাহ মনে করেন যে, আমার জন্য রুমে থাকাই ভালো, তাহলে আমি হয়তো-বা রুমেই বসে থাকব।'

এরকম করে বলার পর আমরা আর কিছু বলি নাই ওকে। বলার মতো কোনো ভাষা ছিল না। পরদিন, ১৬ জুলাই সকাল ১১টায় রাসেল তাকে একটা স্মার্টফোন দিয়ে আসে, যাতে এই সংকটময় সময়ে ঢাকার সমন্বয়ক ও সকলের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখতে পারে।'

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ১৬ জুলাইয়ের সকালের পরিস্থিতি বর্ণনা করে আবু সাঈদের আন্দোলনের সহযোদ্ধা (কারমাইকেল কলেজের শিক্ষার্থী) ইমরান আহমেদ বলেন—

'১৬ জুলাই, দুপুরে চারতলা মোড় থেকে আন্দোলনের প্রোগ্রাম শুরু হয়। আমি এবং সাঈদ একসঙ্গে হাত ধরে স্লোগান দিচ্ছিলাম। কিছুক্ষণ পর রংপুর জিলা স্কুলসহ আশপাশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা আমাদের মিছিলে যোগ দেয়। আমরা মিছিল নিয়ে লালবাগ রেলগেট পর্যন্ত এগিয়ে যাই।

লালবাগে পৌঁছে দেখা যায়, ছাত্রলীগের সদস্যরা অস্ত্র এবং লাঠিসোটা নিয়ে আমাদের প্রতিহত করার জন্য সেখানে অবস্থান নিয়েছে। আমরাও আশপাশের শিক্ষার্থীদের যোগ দেওয়ার জন্য সেখানে অপেক্ষা করছিলাম। বেলা বাড়ার সাথে সাথে আরও শিক্ষার্থী মিছিলে যোগ দিলে আমরা মিছিল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে রওনা দেই। আমাদের লক্ষ্য ছিল মর্ডান মোড় ব্লক করা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে পৌঁছে দেখি, এক এবং দুই নম্বর গেটে পুলিশের বিপুলসংখ্যক সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। তাদের আশ্রয়ে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা লাঠিসোটা হাতে অবস্থান করছে। তখন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে 'ভুয়া, ভুয়া' বলে স্লোগান দিতে শুরু করে।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে ক্যাম্পাসে প্রবেশের চেষ্টা করলে পুলিশ এবং ছাত্রলীগ তাদের বাধা দেয়। এসময় পুলিশ ও ছাত্রলীগের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ বাঁধে। পুলিশ ও ছাত্রলীগ আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে শুরু করে, যার ফলে বেশ কিছু শিক্ষার্থী গুরুতর আহত হয়।

সংঘর্ষের এক পর্যায়ে পুলিশ আবু সাঈদের মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করে, যার ফলে তার মাথা ফেটে যায়। এরপরও সাহসিকতার সঙ্গে সাঈদ রাস্তার বিভাজক (ডিভাইডার) পার হয়ে পুলিশের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে যান।

ছবি: পুলিশ আবু সাঈদের মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করছে

এরপর রাস্তার ডিভাইডার পার হয়ে যখন সাধারণ ছাত্রদের সাথে মিশে গিয়ে আবু সাঈদ পুলিশকে প্রতিহত করতে সবার সামনে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তখন তার বন্ধু (বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী) আরমান হোসেনের সাথে কথা হয় এবং সেই কথাপকথনটি ছিল আবু সাঈদের স্বাভাবিক জীবনের শেষ কথা। আরমান হোসেন বলেন—

> আবু সাঈদকে তখন বলতেছিলাম, বেশি সামনে আগায় যাইস না, পুলিশ গুলি করবে। আবু সাঈদ উত্তরে বলে 'গুলি করবে না, আমার কিছু হবে না'। এ কথা বলার এক মিনিটের মধ্যেই সে গুলিবিদ্ধ হলো।

নিরস্ত্র আবু সাঈদের সাহসিকতা এবং পুলিশের নির্বিচার গুলির দৃশ্য এখন আর কারও অজানা নয়। পুলিশের গুলিতে বিদ্ধ হয়ে আবু সাঈদ যখন সড়ক বিভাজক (ডিভাইডার) পার হয়ে বসে পড়েন, তখন তাকে সাহায্য করতে প্রথম এগিয়ে আসেন সিয়াম আহসান আয়ান (রংপুর চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থী)। সিয়াম বলেন—

> 'রাস্তার ডিভাইডার পার হয়ে গিয়ে আবু সাঈদ ভাই পুলিশের সামনে সরাসরি বুক পেতে দাঁড়ালেন। দাঁড়ানোর পরপরই পুলিশ তাকে গুলি করে। দ্বিতীয়বার গুলি করলে ভাই পড়ে যান। তখন আমি দৌড়ে গিয়ে ভাইকে তুলতে চেষ্টা করি। কিছুদূর এগোনোর পর তিনি আবার মাটিতে পড়ে যান। পড়ে যাওয়ার পর ভাই আমাকে জড়িয়ে ধরে বলার চেষ্টা করছিলেন, ভাই, আমাকে বাঁচান। কিন্তু তার গলা দিয়ে ঠিকমতো শব্দ বের হচ্ছিল না। কথা বলতে পারছিলেন না। তারপর তার মুখ দিয়ে রক্ত বের হতে শুরু করে। এরপর কিছু সহযোদ্ধা এগিয়ে আসেন, আমরা তাকে পার্কের মোড়ের দিকে নিয়ে যাই, তারপর সাজু রায় ভাই এবং আরও দুইজন মিলে তাকে রিকশায় তুলে মেডিকেলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।'

গুলি লাগার পর আবু সাঈদকে রিকশায় মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া সাজু রায় বলেন—

> 'আমি বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ১নং গেটের[৩৫] বাম পাশে ড্রেনের ওপর অবস্থান করছিলাম, তখন সাংবাদিকরা আমাকে সরে যেতে বললেন। আবু সাঈদকে গুলি লাগার পর সে রাস্তা পার হয়ে দাঁড়াতে চাইলে, পরে গিয়ে রংপুর চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থী

---

[৩৫] বর্তমান নাম শহীদ আবু সাঈদ গেট

ছবি: গুলি লাগার পর আবু সাঈদকে রিকশায় করে মেডিকেলে নিয়ে যাওয়ার সময়

আয়ানসহ ৩/৪ জন তাকে তুলে ধরার চেষ্টা করে। আমি তখন তাদের সাথে যুক্ত হই। আমি অবাক হয়ে দেখি, আবু সাঈদকে নিয়ে যাওয়ার সময়েও গুলি থামেনি। গুলি চলছিল, এবং পার্কের মোড়ে এসে একটি রিকশায় আমরা উঠি, সঙ্গে আরো দুজন। মাহিগঞ্জ কলেজের শিক্ষার্থী নিপুন আরেকটি রিকশায় জায়গা না হওয়াতে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের কাছে নেমে যায়। এরপর আমরা দ্রুত যাওয়ার জন্য আবু সাঈদকে অটোতে করে নিয়ে যাই। আমরা কোতয়ালি রোড হয়ে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পৌঁছাই।

আমি দেখতে পাই আবু সাঈদের শরীরে গুলির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে, শিশিরের মতো রক্ত জমাট বেধে আছে, নাক ও মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে। মাথার আঘাতের রক্ত আমার সাদা-কালো শার্টে লাগছে। এই অবস্থায় তার শরীর নিথর হয়ে ছিল। ডাক্তার দ্রুত তাকে ৩ তলায় ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে নিয়ে যেতে বলেন। ইসিজি এবং অন্যান্য পরীক্ষা করার পর ডাক্তার আবু সাঈদকে মৃত ঘোষণা করেন। সময় তখন বিকাল ৩:০৫ মিনিট। আবু সাঈদের লাশ ইমার্জেন্সিতে রাখা হয়। এরই মধ্যে আহত শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে মেডিকেল ক্যাম্পাস থমথমে হয়ে ওঠে। আবু সাঈদের বন্ধুরা ও জুনিয়ররা লাশের পাশে কান্না করতে থাকে। তারা ক্যাম্পাসের সবাইকে জানায় এবং আবু সাঈদের লাশ বেরোবি ক্যাম্পাসে নিয়ে যাওয়ার দাবি জানায়। কিন্তু হাসপাতালের পরিচালক লাশ নিতে দিতে অস্বীকৃতি জানান, ফলে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা হৈচৈ শুরু করলে তিনি চলে যান। পরে বেরোবির শিক্ষক তুহিন ওয়াদুদ স্যার এবং উমর ফারুক স্যার আসেন। এরপর আমরা ২৫-৩০ জন শিক্ষার্থী আবু সাঈদের লাশ স্ট্রেচারে করে মেইন রোডে মিছিল করতে শুরু করি।'

শহীদ আবু সাঈদের লাশ রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পর

থেকে দাফনের আগ পর্যন্ত উপস্থিত থেকে পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক তুহিন ওয়াদুদ। সেই সময়ের পরিস্থিতি বর্ণনা করে তিনি বলেন—

> ১৬ তারিখ দুপুর আড়াইটা-তিনটার দিকে আমি পার্কের মোড় এলাকাতেই ছিলাম। আমার সঙ্গে ছিলেন অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগের দুইজন সহযোগী অধ্যাপক ওমর ফারুক ও শাহিনুর রহমান এবং সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক নুরুল। আমরা একসঙ্গে আলোচনা করছিলাম—আন্দোলনে আমরা কীভাবে যুক্ত হতে পারি। আমি বিভিন্ন জায়গায় ফোন দিয়ে বলছিলাম, যেন পুলিশ ছাত্রদের ওপর গুলি না করে।
>
> ঠিক তখনই সংস্কৃতিকর্মী ও কাউনিয়ার ডিগ্রি কলেজের সাবেক অধ্যাপক শাশ্বত ভট্টাচার্য ফোন করেন। শাশ্বত ভট্টাচার্য আমাকে জানান, আন্দোলনকারীদের একজন ছাত্র খুবই অসুস্থ এবং রংপুর মেডিকেলে ভর্তি রয়েছে। খবর শুনে আমরা চারজন শিক্ষক রিকশায় করে রওনা দেই রংপুর মেডিকেলের উদ্দেশ্যে। যাওয়ার পথে বেসরকারি কলেজের শিক্ষক কাফি ভাই ফোন দিয়ে জানান, 'তুহিন, তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ১২তম ব্যাচের ছাত্র আবু সাঈদ মারা গেছে। আমি ডাক্তারের কাছেই আছি।'
>
> এটা শোনার পর আমরা আরও দ্রুত মেডিকেলের দিকে যাই। সেখানে পৌঁছে দেখি, জরুরি বিভাগের সামনে স্ট্রেচারে আবু সাঈদের নিথর দেহ। শহীদ সাঈদের মরদেহ স্ট্রেচারে করে ছাত্ররা নিয়ে যাচ্ছিল। আমি, ওমর ফারুক, এবং অন্য দুইজন শিক্ষক খুব চেষ্টা করছিলাম—অল্প সময়ের মধ্যেই একটা অ্যাম্বুলেন্স ম্যানেজ করতে। কিন্তু মনে হচ্ছিল, আর একটু দেরি হলে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ হয়তো মরদেহ নিয়ে যেতে দেবে না।
>
> ছাত্ররা শহীদ সাঈদকে নিয়ে চলে গেলে, আমরা আহত শিক্ষার্থীদের দেখতে মেডিকেলের উপরের তলায় যাই। আন্দোলনে আহত হয়ে অনেক শিক্ষার্থী মেডিকেলে ভর্তি হয়েছিল। তাদের দেখে নিচে নেমে দেখি, পুলিশ আবার সাঈদের মরদেহ মেডিকেলে ফিরিয়ে এনেছে।
>
> পুলিশ সাঈদকে ফিরিয়ে আনার পর অন্য শিক্ষকরা চলে যান, শুধু আমি থেকে যাই। তখন হাসপাতাল থেকে মরদেহ নেওয়ার বিষয়ে কথা বলি। হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, পরিবারের লোকজন ছাড়া লাশ

দেওয়া হবে না। এদিকে পরিবারের লোকজনকে খবর দেওয়া হয়েছিল। সাড়ে পাঁচটার দিকে আবু সাঈদের বাড়ি থেকে ছয়জন আসেন—তার দুই ভগ্নিপতি, আপন ভাই রমজান, এবং তিনজন চাচাতো ভাই। পরিবারের সদস্যরা জানান, তারা মরদেহের পোস্টমর্টেম করাবেন না। তাদের এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আমাদের এবং পরিবারের স্বাক্ষর নেয়।

সাঈদের মরদেহ তখন লাশ ঘরে রাখা হয়েছিল। পুলিশ কৌশলে আমাদের লাশ তদারকি অফিসে ডেকে নিয়ে যায়। আমরা অফিস থেকে ফিরে দেখি, একটি অ্যাম্বুলেন্স দ্রুতগতিতে মরদেহ নিয়ে চলে গেছে।

আমরা যখন মরদেহ দেখতে না পেয়ে পুলিশকে প্রশ্ন করি, তারা জানায় যে লাশ পোস্টমর্টেমের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমাদের না জানিয়ে এমনভাবে লাশ নিয়ে যাওয়ায় আমরা সন্দেহ করেছিলাম, তারা হয়তো মরদেহ গুম করার পরিকল্পনা করছিল।

পরে আমরা পোস্টমর্টেমের স্থানে যাই। ইংরেজি বিভাগের শিক্ষকদের সঙ্গে অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগের আশান উজ্জামান ছিলেন। ইংরেজি বিভাগের পক্ষে সাঈদের মরদেহ বাড়িতে নেওয়ার জন্য একটি অ্যাম্বুলেন্স ঠিক করা হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ জানায়, তাদের ভাড়া করা অ্যাম্বুলেন্সেই মরদেহ নিতে হবে।

আমরা মরদেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে নিয়ে গিয়ে জানাজা পড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কিন্তু পুলিশ তাতে রাজি হয়নি। রাত বারোটার দিকে মরদেহ নিয়ে আমরা রওনা দেই।

রাত দুইটায় আমরা শহীদ আবু সাঈদের বাড়ি জাফরপাড়ায় পৌঁছাই। সেখানে গ্রামবাসী মরদেহের জন্য অপেক্ষা করছিল। পুলিশের গাড়ি জাফরপাড়া বাজার পর্যন্ত গেলেও তারা সাঈদের বাড়ি পর্যন্ত যায়নি। এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক ছিল। পুলিশ সেদিন রাতেই লাশ দাফনের জন্য চাপ দেয়। কিন্তু আমি এবং সাঈদের পরিবার আপত্তি জানাই। এ সময় সাঈদের বোন সুমি আমার হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলছিল, 'স্যার, পুলিশক কইনেন, হয় হামার ভাইটাক গুলি না করিল হয়, হামার চাকরি না নাগিল হয়, হামার লেখাপড়া না নাগিল হয়। কইনেন, হয় গুলি না করিল হয়।' তার কথাগুলো এবং আশেপাশের মানুষের আহাজারি দেখে আমি নিজেও বারবার অশ্রুসিক্ত হচ্ছিলাম।

সাঈদের গোসল করানো হলে আমি ভোরবেলায় রংপুরের বাসায় ফিরি। বাড়ির গেটে পৌঁছালে ফজরের নামাজ পড়ে লোকজনকে বাড়ি ফিরতে দেখলাম। তখন মনে হলো, আবু সাঈদ আর কোনোদিন নামাজ পড়বে না। সে ছিল একজন ধর্মপ্রাণ ছেলে। এসব ভাবতে ভাবতে বাসায় ঢুকে পড়লাম।

আবু সাঈদের লাশ নির্বিঘ্নে দাফন করা সম্ভব হয়নি। তাঁর পরিবার জানায়—

'প্রশাসন অনবরত জানাজার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। প্রশাসনের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সকাল ৯টায় জানাজার সময় ঠিক করা হয়। তবে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীরা সকালে পৌঁছাতে না পারায় জানাজার নামাজের সময় সকাল ১০টায় নির্ধারণ করা হয়। এ সময় মাঠে স্থানীয় আওয়ামী লীগের লোকজন এবং প্রশাসন জানাজার নামাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য চাপ দিতে থাকেন, যা কিছুটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। সকাল ১০টার আগেই আওয়ামী লীগের লোকজন জানাজার নামাজ শুরু করার চেষ্টা করে, কিন্তু আমাদের বাধার মুখে তা সম্ভব হয়নি। এর মধ্যে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা পৌঁছালে, জানাজার নামাজ দুই ধাপে জাফরপাড়া কামিল মাদরাসা মাঠে সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত হয়। এরপর বাবনপুর নিজ বাসার পাশে দাফন সম্পন্ন করা হয়।'

আবু সাঈদের শিক্ষাজীবন, চিন্তা-চেতনা, মূল্যবোধ

আবু সাঈদ ১০ ডিসেম্বর ২০০০ সালে রংপুরের পীরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২০১৮ সালে রংপুর সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষা দেন এবং ২০২০-২৪ শিক্ষাবর্ষে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে অনার্সে অধ্যয়নরত ছিলেন। পরিবার আর্থিকভাবে অসচ্ছল হওয়ায়, তিনি টিউশনি করে এবং উপবৃত্তির টাকায় নিজের পড়াশোনার খরচ চালাতেন।

ছোটবেলা থেকেই আবু সাঈদ ধর্মভীরু ছিলেন, দ্বীনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করতেন, বন্ধুদের নিয়মিত সালাতের দিকে আহবান করতেন। আবু সাঈদের বাল্যকালের বন্ধু ফয়সাল আহমেদ শিশির (আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ [এআইইউবি]-এর শিক্ষার্থী) স্মৃতিচারণে বলেন—

'ছোটবেলা থেকেই আবু সাঈদের মাঝে ইসলামের প্রতি ছিল গভীর অনুরাগ ছিল। যখন আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তাম, টিফিনের সময় অন্যরা

খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকত, তখন আমরা কয়েকজন মিলে জোহরের নামাজ পড়তাম। আমাদের মধ্যে অনেকেই ছিল, যারা শুধুমাত্র জুমার নামাজ পড়ত, কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের প্রতি তেমন গুরুত্ব দিত না। এটি আবু সাঈদ মেনে নিতো পারত না। একদিন সে আমাদের বলল, 'তোরা শুধু জুমার নামাজ পড়িস, কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের গুরুত্বও তো একই, তাহলে সেগুলো পড়িস না কেন?' তার এই কথাগুলো যেন আমাদের হৃদয়ে গভীর দাগ কেটেছিল। দ্বীনের প্রতি তার আগ্রহ তখন থেকেই গভীরভাবে প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল।'

আবু সাঈদের বন্ধু মেহেদী হাসান রতন, ফরহাদ হোসাইন, মোহাম্মদ রাসেল এবং ফয়সাল আহমেদ শিশির বলেন—

'এসএসসি পরীক্ষার পর যখন সে রংপুরে মেসে উঠল, তখন থেকেই ইসলাম সম্পর্কে গভীরভাবে জানতে শুরু করল। ইন্টারনেট ঘেঁটে সে সহিহ হাদিস ও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার সন্ধান করত। ইসলামের প্রতি তার ছিল এক অদম্য অনুসন্ধিৎসা—কোন বিষয়টি সহিহ, কোনটি শুদ্ধ এবং কোনটি দ্বীনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা জানার জন্য সে নিরলসভাবে পরিশ্রম করত।

আমরা যখন তার মেসে যেতাম, তখন দ্বীনের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হতো। কার বক্তব্য বেশি যৌক্তিক, কার কথা কুরআন-হাদিসের আলোকে গ্রহণযোগ্য—এসব নিয়ে আবু সাঈদের বিশ্লেষণ ছিল অনবদ্য। ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় তার একাডেমিক পড়াশোনার চেয়ে ইসলামিক জ্ঞানের প্রতি মনোযোগ বেশি ছিল। ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যখন আমাদের সাথে কথা বলত, তার কথার যুক্তি এবং চিন্তাধারার গভীরতা দেখে মনে হতো—ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো জানা সবার জন্য অপরিহার্য।

তবে আবু সাঈদ শুধু ইসলামের জ্ঞান অর্জনেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেনি। সে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার কথাও বলত। যখন দেশে অন্যায় দেখত, তখন সে প্রতিবাদ করতে চাইত।

আমরা যখন বলতাম, 'তুই একা কী করবি?' তখন তার চোখে ক্ষোভ ফুটে উঠত। সে বলত, 'একা মানে কী? অন্যায় দেখেও যদি চুপ থাকি, তাহলে তো দেশটা নষ্ট হয়ে যাবে! কাউকে না কাউকে প্রতিবাদ করতেই হবে। আস্তে আস্তে একে একে সবাই এগিয়ে আসবে।'

আবু সাঈদ ফেসবুকে নানা সময়ে ইসলামি ও জাতীয় ইস্যুতে পোস্ট করেছেন, নিজের চিন্তা-চেতনা প্রকাশ করেছেন। যেমন ২০২৪ সালের শুরুতে সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে ট্রান্সজেন্ডার (এলজিবিটি) তথা শরীফার ইস্যুতে নিজের দার্শনিক অভিব্যক্তি প্রকাশ করে অনেক বড় ফেসবুক পোষ্ট করেন। সেটি হুবহু তুলে দেয়া হলো (পোষ্টের আংশিক স্ক্রিনশট)—

Abu Sayed
April 13, 2024

যারা ধর্মে বিশ্বাসী, তাদের নিদিষ্ট আদর্শ আছে। তাদের কিছু মুলনীতি তাদের ধর্মীয় পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। নাস্তিক বা তথাকথিত প্রগতিশীলরা এই মূল নীতি গুলোকে প্রশ্ন ছুড়ে দিতে পারে। কিন্তু সেই প্রগতিশীলদের কোন নিদিষ্ট আদর্শ নেই।

সুতরাং তাদের কোন আদর্শ প্রশ্ন করলে জাস্ট তারা এটাকে অস্বীকার করে। এই কারন তাদের কোন আদর্শের কোন স্টান্ডার্ট নেই।

নিচের দুজন প্রগতিশীল আদর্শ খেয়াল করুন।

১.
#সমস্যা_যদি_হয়_বৈশাখী_মঙ্গলে

সমস্যা যদি হয় বৈশাখী মঙ্গলে
তুমি চলে যেতে পারো প্রিয় কোনো জঙ্গলে।

তুমি চলে যেতে পারো দূর মরু সাহারায়
বাঙালি রইলো তার সংস্কৃতি পাহারায়।

সংস্কৃতিসনে তুমি মিশিও না ধর্ম
মেশাতে চাইলে সেটা হবে অপকর্ম।

ধর্ম ও সংস্কৃতি চিরকালই ভিন্ন
সভ্যতা-ইতিহাসে তারই দ্যুতি-চিহ্ন।

(না মানুক অন্ধরা না জানুক উকিলে
বসন্ত আসিবেই ডাকিবেই কুকিলে...)

বাংলা ও বাঙালির আনন্দ হর্ষ
বৈশাখ সমাগত শুভ নববর্ষ...

/লুৎফর রহমান রিটন
রচনাকাল : ১১ এপ্রিল ২০২৩।

'যারা ধর্মে বিশ্বাসী, তাদের নির্দিষ্ট আদর্শ আছে। তাদের কিছু মূলনীতি তাদের ধর্মীয় পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। নাস্তিক বা তথাকথিত প্রগতিশীলরা এই মূলনীতিগুলোকে প্রশ্ন ছুড়ে দিতে পারে। কিন্তু সেই প্রগতিশীলদের কোনো নিদিষ্ট আদর্শ নেই।

সুতরাং তাদের কোনো আদর্শ প্রশ্ন করলে জাস্ট তারা এটাকে অস্বীকার করে। এর কারণ, তাদের কোনো আদর্শের কোনো স্ট্যান্ডার্ড নেই।

নিচের দুজন প্রগতিশীল আদর্শ খেয়াল করুন।

১.

#সমস্যা_যদি_হয়_বৈশাখী_মঙ্গলে

সমস্যা যদি হয় বৈশাখী মঙ্গলে

তুমি চলে যেতে পারো প্রিয় কোনো জঙ্গলে।

তুমি চলে যেতে পারো দূর মরু সাহারায়

বাঙালি রইলো তার সংস্কৃতি পাহারায়।

সংস্কৃতিসনে তুমি মিশিও না ধর্ম

মেশাতে চাইলে সেটা হবে অপকর্ম।

ধর্ম ও সংস্কৃতি চিরকালই ভিন্ন

সভ্যতা-ইতিহাসে তারই দ্যুতি-চিহ্ন।

(না মানুক অন্ধরা না জানুক উকিলে

বসন্ত আসিবেই ডাকিবেই কুকিলে..)

বাংলা ও বাঙালির আনন্দ হর্ষ

বৈশাখ সমাগত শুভ নববর্ষ...

-লুৎফর রহমান রিটন

রচনাকাল : ১১ এপ্রিল ২০২৩।

২!

ধর্ম সাধারণ লোকের সংস্কৃতি, আর সংস্কৃতি শিক্ষিত মার্জিত লোকের ধর্ম

সংস্কৃতি কথা (কাজী মোতাহের হোসেন)

এখনে খেয়াল করে দেখুন, একজন বলতেছে, সংস্কৃতি আর ধর্ম আলাদা। আর একজন বলতেছে সংস্কৃতিই ধর্ম। দুজনের আত্মবিশ্বাস মাশাআল্লাহ পাহাড় সমান। ইংরেজি ডিপার্টমেন্টে পড়ার সুবাদে, অনেকগুলো মতবাদের সাথে পরিচিত হয়েছি। Socialism, communism, marxism, democracy, autocracy, fraudism, capitalism, existentialism, dadaism, absurdism, idealism, ভোগবাদ, utilitarianism. একটা থেকে অন্যটি বিপরীত সোজা ১৮০° বরাবর।

আপনাদের আমি দুটা মতবাদের বৈপরীত্য দেখাই। প্রগতিশীলদের প্রিয় খাবার ফ্রয়েড। ওনার মতবাদটা হলো, একটা শিশু যখন ছোট থাকে, ছেলে হলে তার মায়ের প্রতি যৌন আকর্ষণ অনুভব করে, আর মেয়ে হলে বাবার প্রতি। এটার নাম দিয়েছে oedipal complex.

LGBT দাড় করাতে গেলে তাদের মতবাদ হয়ে যায় উল্টা। তখন ছেলেতে ছেলেতে আকর্ষণ, মেয়েতে মেয়েতে আকর্ষণ স্বাভাবিক। এখন কথা হলো, যদি LGBT তত্ত্ব যদি ঠিক হয়, ফ্রয়েডের মতবাদ ভুল, কারণ LGBT মতে, ছেলে শিশুটি শুধু তার মায়ের প্রতি আকর্ষণ অনুভব কথা না, তার বাবার প্রতিও করার কথা। আসলে সবগুলো মতবাদই অন্তসারশূন্য।

আর একটা ব্যাপারে একটু আলোকপাত করি।

বাংলাদেশে ইসলাম, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ সহ অনেক ধর্মের লোক বাস করে। বাংলাদেশে অনেক রাজনৈতিক দল আছে। আওয়ামিলীগ, বিএনপি, জাসদ, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামি সহ অনেক কয়েকটা। গত দশ বছরে, ধর্মীয় দলাদলির কারণে কতজন লোক মারা গেছে? আর রাজনৈতিক কারণে কতজন লোক মারা গেছে। রাজনৈতিক কারণে ১০০০ জন মারা গেলে, ধর্মীয় কারণে মারা গেছে সর্বোচ্চ ৫০ জন।

মুসলিমের হাতে একজন অন্যধর্মের লোক হত্যা হলে, বা হিন্দুর হাতে অন্য কোনো ধর্মের লোক মারা গেলে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা ধর্মগুলোকে ধুয়ে দিলেও, ধর্ম পালনকারী সবলোক গুলোকে যেভাবে ধর্মান্ধ বলা হলেও রাজনৈতিক দলের দ্বারা এতো মানুষ হত্যা, গুম, আত্যাচারের স্বীকার হলেও রাজনীতিকে কেন প্রশ্নবানে জর্জরিত করা হয় না? (মানুষকে বিনা বিচারে হত্যা ধর্ম যেমন সমর্থন করে না, তেমনি কোনো আইন সমর্থন করে না)

এক জায়গায় আদর্শ হিসাবে কাজ করে, ধর্ম (ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খিস্টান)। অন্য জায়গায় রাজনৈতিক দল (বিএনপি, আওয়ামী লীগ,জাতীয় পার্টি) সুতরাং ধর্ম যেমন রাজনৈতিক দলও তেমন।

যতজন লোক ধর্মের কারণে অত্যাচারের স্বীকার হয়, তার থেকে রাজনীতির কারণেই ঢের গুণ বেশি মানুষ অত্যাচারের স্বীকার হয়। অথচ ধর্মকেই প্রশ্নবাণে জর্জরিত করা হয়। নাস্তিকতা আমাদের ধর্ম থেকে বের করে এনে কী দিবে? এসব ফালতু মতবাদ যার কোনো ভিত্তি নাই।

শহীদ আবু সাঈদের মা তার শেষ স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আবেগআপ্লুত হয়ে বলেন—

> মনটা তো ঠিক থাকে না, কাপড় চোপড় হোক, বই বস্ত্রই হোক, কিছু একটা বোলাচে এটাই নি ছোল মোর এটা বোলাচে, এটা করছে,ছোল মোর এটা এক্কা এক্কা করে বাড়িত আইছে, ব্যাগ ঘাড়োত নি বাড়িত আইছে, আসি কয় মাও ভালো আচেন, (মায়ের উত্তর) ভালোই আছি বাবা, রংপুর থাকি ফোন দেয়। কয় মাও ভালো আচেন?, আব্বা ভালো আচে? বাড়ির কতা পুচ করে। এখন তো আর নাই, কেই কবি আমার সাথে কতা?
>
> ছোলোক এগোদ্দিনো বলোং নাই, বাবা তোমার পড়া শেষ হবি কখন এবারকা যাওয়ার সমে কচো বকরা ঈদে কোচো বাবা তোমার পড়া শেষ হবি কখন। ছোল

ক্যাম্বা খালি হাসোচে! মুই তো জানোইচো পড়া শেষ হয়ই নাই। ২/১ বছর পড়লে তেইনি শেষ হবি। তখন ছোলে বলচে মা আমি কিসের চাকরি করমো? কি পদের করমো? বাবা তোমার যেটা ভালো হবি তোরা সেটা করেন। হামার তো বাড়ির অবস্থা দেখোইছেন!! যেটাত ইমকান করব্যা পারমেন সেটা করেন।

তখন বলছে যে, ইঞ্জিনিয়ার হবি ভালো ভালো পদে গেলো হয়, বিদেশে বিদেশে গেলো হয় ছেলে মোর। আশা টা তো ছোলের পুরন হলো না, ছোলের আশাটা পুরন হলো না এটাই মনোত মোর দুঃখ!

পড়াশুনা করলে একটা কিছু করমো। তখন পরিবারের ভাইবোনেরা, ভাতিজি, ভাগিনী সবাক দেখপি। ছোট বোনক কচে চাকরি করি সবাক দেখপি। সেটা তো ছোল কুলবাই পারলি না। কি যে হলো! আল্লাহ্ একজন জানে।

বাইত আলে জুম্মার ঘড়ত নামায পরবের যায়। ওজা আসলে এলার্ম দি থুবি, এলার্ম বাজলে উঠপি, ডাকলে উঠপ্যালায়। যখন এলার্ম বাজি উঠপি তখন উঠি আসি ভাত খায়া দাঁত ঘসি মুখ ধুয়ি ফজরের নামায পড়ি আসি শুতপি, সব ওয়াক্ত নামাযই পড়ে। দুঃখ নাগে মনোত। ভিতরটাত কষ্ট নাগে। ভিতরটাতো মানুষ দেখপা পায় না। ভেতরটা ফাটিফাটি থাকে।

(সাঈদের জন্য এখন একটুও মনটা ভালো থাকে না। আমার ছেলে বাড়িতে থাকলে কখনো বই পড়ত, কখনো বাসার কাজ করত—মানে কিছু-না-কিছু করতই সব সময়। ব্যাগ কাঁধে নিয়ে ভার্সিটি থেকে বাড়িতে আসত, এসেই বলত, 'মা ভালো আছেন?' রংপুর থেকে ফোন দিয়ে খোঁজ নিত, ফোন দিয়ে বলতো 'আম্মা কেমন আছেন? আব্বা কেমন আছে? বাড়ির সবাই কেমন আছে?' কিন্তু এখন তো সাঈদ আর নেই। এখন আমাকে ফোন দিয়ে কেউ আর এভাবে কথা বলে না।

আমি ছেলেকে কখনো বলি নাই, 'বাবা তোমার পড়া শেষ হবে কখন' ও শহীদ হওয়ার আগে বাসা থেকে শেষ বার যাওয়ার সময় (কুরবানির ঈদের পর) বলছি 'বাবা তোমার পড়া শেষ হবে কখন।' ছেলে কেন জানি শুধু হাসতেছিল। আমি তো জানি, পড়া শেষ হয় নাই। আরও ২/১ বছর পড়লে পড়া শেষ হবে। তখন ছেলে বলতেছে 'মা আমি কীসের চাকরি করব? কী পদের চাকরি করব?' আমি বলছি—বাবা, তোমার যেটা ভালো মনে হয়, সেটাই কর। আমার তো বাড়ির অবস্থা তো দেখতেছেন ভালো না! যেটাতে ইনকাম করতে পারবেন, সেটাই করেন।

সাঈদ সব সময় বলত, পড়াশুনা শেষ করে একটা ভালো চাকরি করবে। তখন পরিবারের ভাইবোন, ভাতিজি, ভাগিনী সবাইকে দেখবে। ছোট বোনকে বলছে চাকরি করে সবাইকে দেখবে। সেই স্বপ্ন আর আমার ছেলের পূরণ হলো না। আমার আশা ছিলো, ছেলে পড়াশোনা শেষ করে ভালো কিছু হবে, আমি দেখব আমার ছেলে ভালো কিছু করতেছে! কিন্তু আশাটা তো আমার পূরণ হলো না, তার আগেই আমার সাঈদকে পুলিশ গুলি করে মেরে ফেলল।

আমার ছেলে বাড়িতে আসলে মাসজিদে নামাজ পড়তে যাইত। রোজা আসলে ফোনে এলার্ম দিয়ে রাখে, এলার্ম বাজলে উঠে, আর এমনিতে ডাকলে উঠে না। যখন ফোনে এলার্ম বাজে, তখন উঠে এসে ভাত খেয়ে দাঁত ব্রাশ করে মুখ ধুয়ে ফজরের নামাজ পড়ে এসে ঘুমায়। সাঈদ পাঁচ ওয়াক্ত ওয়াক্ত নামাজ পড়ত। দুঃখ লাগে মনে, আমার সাঈদকে এভাবে হারাব, কখনো ভাবিনি। ভিতরটাতে অনেক কষ্ট। ভিতরটা তো মানুষরে দেখাইতে পারি না। আমার ভেতরটা কষ্টে ফেটে যায়।)

আবু সাঈদকে গুলি করে শহীদ করার ভিডিও দেখতে QR Code স্ক্যান করুন।

তথ্যসূত্র:

১. পরিবারের সাক্ষাৎকার (আবু সাঈদের মা ও বোন)

২. প্রত্যক্ষদর্শী: শিক্ষক তুহিন ওয়াদুদ, ইমরান আহমেদ, আরমান হোসেন, সাজু রায় এবং সিয়াম আহসান আয়ান

৩. ফয়সাল আহমেদ শিশির, ফরহাদ হোসাইন, মোহাম্মদ রাসেল এবং মেহেদী হাসান রতন

৪. ভিডিও

তথ্য সংগ্রহে:

মোঃ নাহিদ হাসান সজীব; স্টোরি মেকিং: মোঃ নাহিদ হাসান সজীব এবং ড. মোহাম্মাদ সরোয়ার হোসেন

'চলে আসুন ষোলশহর'

'চলে আসুন ষোলশহর'— ১৬ জুলাই, ২০২৪ মৃত্যুর তিন ঘণ্টা আগে ফেসবুক পোস্টে সবাইকে ষোলশহর চলে আসার জন্য নির্দেশনা দেন ওয়াসিম আকরাম। এর আগে ১৫ জুলাই, একটি ফেসবুক পোস্টে মোহাম্মদ ওয়াসিম আকরাম লেখেন 'ঝড় মোকাবেলার এখন শ্রেষ্ঠ সময়, ১৮ কোটি বাঙালির ভাগ্য নির্ধারনে জেগে ওঠো হে ছাত্রসমাজ'।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নানান কর্মসূচিতে নাজেহাল সরকার। ১৫ই জুলাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এক বক্তব্যে আগুন লেগে যায় ছাত্রসমাজের মধ্যে। তিনি আন্দোলনকারীদের রাজাকার বলে অভিহিত করেন। তার প্রতিক্রিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রাজপথে নেমে আসেন সেদিন রাতেই। স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয় ক্যাম্পাসগুলো। যথারীতি পরদিন অর্থাৎ ১৬ই জুলাই কর্মসূচি দেয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

নামঃ মোহাম্মদ ওয়াসিম আকরাম
বয়সঃ ২২ বছর ৮ মাস (জন্ম: ৬ ডিসেম্বর ২০০১)
মৃত্যুর তারিখঃ ১৬ জুলাই ২০২৪
পিতার নামঃ শফিউল আলম
মাতার নামঃ জোসনা বেগম
ঠিকানাঃ পেকুয়া, কক্সবাজার
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ চট্টগ্রাম কলেজ থেকে সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ২০১৯-২০২০ সেশনের স্মাতক তৃতীয় বর্ষে ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার পরপরই ঘাতকের ছোঁড়া বুলেটে শহীদ হন।

ওয়াসিম ছিল এই আন্দোলনে সক্রিয় একজন কর্মী। স্বৈরাচারী হাসিনার বক্তব্য তার মনেও তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। নানা ধরনের ফেসবুক পোস্ট দিয়ে তা সে জানান দিচ্ছিল। রাজপথের সৈনিকেরা ফেসবুকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না।

অপেক্ষা করছিল ভোরের; সকাল হলেই নেমে পড়বেন আন্দোলনে। প্রতিবাদী আত্মা ভয় পায় না মৃত্যুকে। নিজের ভিতর তৈরি হওয়া সেই দাবানল থেকে হঠাৎ ফেসবুক পোস্ট দিলেন শহীদ হতে চান তিনি।

প্রতিদিন সূর্য ওঠে স্বপ্ন ও সম্ভবনা নিয়ে। ১৬ই জুলাই যে এদেশের ইতিহাসের বর্বরতম একটি দিন হতে যাচ্ছে, তা হয়তো ঘুণাক্ষরেও কেউ ভাবেনি। সকাল থেকেই আন্দোলনে সক্রিয় কর্মীদের সাথে যোগাযোগ রাখছিল ওয়াসিম। শহরের ষোলশহরে আসার আহ্বান জানিয়ে একটি পোস্ট দিয়ে দিল সে। ছাত্র-জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে রাজপথ মুখরিত হতে লাগল। ফ্যাসিস্টের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আন্দোলনের কণ্ঠস্বরকে চেপে ধরতে চায়। আওয়ামীলীগ ও তার দোসররাও এর ব্যাতিক্রম ছিল না। আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে অবস্থান নেয় পুলিশ, আওয়ামীলীগ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের সন্ত্রাসীরা। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে স্বৈরাচারের চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে রাজপথে নেমে আসে ওয়াসিম।

তীব্র আন্দোলন নিয়ে যখন এগিয়ে যাচ্ছিল ওয়াসিমরা, ঠিক তখনই চট্টগ্রামের মুরাদপুরে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ছাত্রলীগের দ্বিমুখী সংঘর্ষ বেঁধে যায়। নিরস্ত্র জনতা উপায় না পেয়ে যে যার মতো পালাতে লাগল। বিকেল ৩টার দিকে হঠাৎ ছাত্রলীগের ছোড়া একটি বুলেট এসে বিদ্ধ হলো ওয়াসিমের শরীরে। ঘাতকের গুলিতে নিস্তেজ হয়ে গেল ওয়াসিমের দেহ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা এই সৈনিক হারিয়ে ফেলল হাঁটার শক্তি। জুলুমের বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠের এই যোদ্ধা যেন হাঁটতে ভুলে গেল। তড়িঘড়ি করে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হলো। কিন্তু না, তাকে বাঁচানো গেল না। ১৬ ঘণ্টা আগে ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে শহীদ হওয়ার যে তামান্না ছিল, স্রষ্টা তা কবুল করলেন।

MD Wasim Akrum is with **Md Sayed Hasan** and **3 others**.
July 16, 2024 ·

সাধারণ শিক্ষার্থীদের পাশে আমার প্রাণের সংগঠন।
আমি এই পরিচয়ে শহিদ হব❤
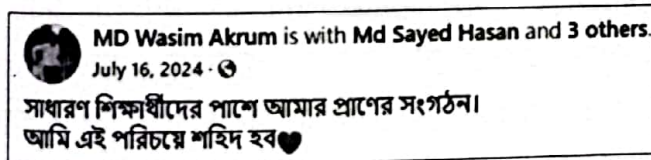
কক্সবাজারের পেকুয়া সদর ইউনিয়নের দক্ষিণ মেহেরনামা বাজারপাড়ায় ৬ ডিসেম্বর ২০০১ ঈসায়ী জন্ম ও বেড়ে ওঠা। ওয়াসিমের বাবা শফিউল আলম প্রবাসী, মধ্যপ্রাচ্যের কাতারে একটি কোম্পানিতে চাকুরি করে। মাতা জেসনা বেগম গৃহিণী। দুই ভাই ও তিন বোনের মধ্যে ওয়াসিম তৃতীয়। চট্টগ্রাম কলেজের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক ২০১৯-২০২০ সেশনের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।

শহীদ হওয়ার সেই দিনে

১৬ জুলাই শহীদ ওয়াসিম আকরাম-এর মৃত্যুর বিবরণ দিতে গিয়ে সহযোদ্ধা ও এলাকার বড় ভাই আব্দুল্লাহ আল নোমান বলেন—

'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের গণজমায়েত পরবর্তী মিছিলের যাত্রা শুরু হওয়ার স্থান ছিল ষোলশহর (বিশ্ববিদ্যালয় রেলষ্টেশন)। ছোট ভাইদের দুপুর ১টা ৪৫-এর দিকে তিনটা ম্যাসেঞ্জার গ্রুপে ম্যাসেজ দিয়ে সবাইকে ষোলশহর আসতে বললাম। আমিও আমার সাথে কয়েকজন নিয়ে ষোলশহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। কিছুক্ষণ পর 'ওয়াসিম আকরাম' আমাকে ফোন দিল।

ওয়াসিম বলল, 'ভাই আপনি কোথায়?'

আমি বললাম, এখন মির্জাপুলের কাছাকাছি।

ওয়াসিম: ভাই ম্যাসেঞ্জার গ্রুপে আমি দেখেছি আপনি সবাইকে ষোলশহর রেলষ্টেশন-এ আসতে বললেন, ওখানে তো ভাই ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক 'রনি' ওর পোলাপাইন নিয়ে অবস্থান করতেছে, ওখানে এখন যাওয়া যাবে না ভাই।

আব্দুল্লাহ আল নোমান: ওয়াসিম তুই কোথায়?

ওয়াসিম আকরাম: ভাই আমি শিক্ষা বোর্ড-এর এইদিকে আছি। আপনি মিছিল শুরু করার আগেই, যেখানে অবস্থান নিবেন সেখানে আসব।

আব্দুল্লাহ আল নোমান: ঠিক আছে তুই ওদের সাথে ওইদিকে থাক। মিজানের সাথে যোগাযোগ করে আমি যেখানে অবস্থান নেব, সেখানে চলে আসবি।

ওয়াসিম আকরাম: ঠিক আছে ভাই।

আমি বিচ্ছিনভাবে ছোট ভাইদের নিয়ে বিকাল ২টা ২০-এর দিকে মুরাদপুর মোড়ে (ব্রীজের উপরে) অবস্থান নিলাম। এরপর ফোন করে আর কিছু ছোট ভাইকে নিয়ে আসলাম। একদিকে ষোলশহর ও ২নং গেইট অন্যদিকে মুরাদপুর ডাচবাংলা ব্যাংক-এর নিচে ছাত্রলীগ-যুবলীগের সশস্ত্র অবস্থান দেখে ছোট ভাই সবার মনে ভয় কাজ করছিল।

ঠিক দশ মিনিট পর আমি মিছিল শুরু করব। এর মধ্যে আমার পাশে থাকা মিজান বলল, 'ভাই ওয়াসিম ফোন করল ও নাকি আসতেছে, একটু অপেক্ষা করেন।

মিজানকে বললাম ঠিক আছে ওকে আসতে বল, যথারীতি ওয়াসিম আমার সাথে দেখা করতে আসল।

ওয়াসিম আকরাম : ভাই দুইটা ছোট ভাই আসছে। ওদের নিয়ে আসি।

আপনি মিছিল শুরু করার আগেই চলে আসব।

ওয়াসিম ও তার সাথে থাকা ছোট ভাইদের জন্য বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম, যখন মিছিল শুরু করার জন্য সিদ্ধান্ত নিলাম তখন ছোট ভাইয়েরা সবাই বলে উঠল প্লিজ ভাই তিন দিকেই ছাত্রলীগ-যুবলীগের সশস্ত্র অবস্থান নিয়েছে। এখন মিছিল শুরু না করলে ভালো হবে। আর একটু পরিস্থিতি দেখেন।

ছোট ভাই মিজানুর রহমান মিলন ও ফরহাদ যৌথভাবে বলা শুরু করল তোমারা ভাইকে বাধা দিওনা ভাইয়ের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। তখন আমার সাথে থাকা সবাইকে নিয়ে মুরাদপুর মোড়ে ব্রীজের উপরে মিছিল করার উদ্দেশ্যে স্লোগান দেওয়া শুরু করলাম। স্লোগান দেওয়ার সাথে সাথে বিচ্ছিনভাবে থাকা ছাত্ররা আমাদের পাশে জড়ো হতে শুরু করল।

এর মধ্যেই ছাত্রলীগ দুই দিক দিয়ে ঘেরাও করে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করা শুরু করে। তখন তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে আমরা দুই ভাগ হয়ে দুই দিকে ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুললাম। একটা গ্রুপ শিক্ষা বোর্ড-এর দিকে আরেকটা গ্রুপ মুরাদপুর গ্রীলের রেলিং ভেঙে মুরাদপুর ডাচ বাংলা ব্যাংক-এর নিচ থেকে আক্রমণ করা ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধ করার জন্য মুভ করল। আন্দোলন চরম মুহুর্তে পিছন দিক থেকে ওয়াসিমের সাথে থাকা ছাত্ররা আমাদের সাথে যোগ হলো।

এক পর্যায়ে ছাত্রলীগকে ধাওয়া দিতে দিতে ২নং গেইট পর্যন্ত পৌঁছে দিই। এর মধ্যে খবর এল মির্জাপুল আগেভাগে থাকা ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের আরেকটা গ্রুপ মুরাদপুরের দিকে অগ্রসর হয়ে ছাত্রদের ওপর হামলা শুরু করেছে। ছাত্রদের একটা বিশাল অংশ শিক্ষা বোর্ডের সামনের গোল চত্বরে রেখে কিছু ছোট ভাইদের নিয়ে আমি মুরাদপুর মোড়ের দিকে চলে আসি।

আসতে আসতে পথে আমার সাথে অসংখ্য ছাত্ররা যোগ হলো এদের নিয়ে মির্জাপুলের দিক থেকে আসা ছাত্রলীগ সন্তাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুললাম। এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে এ্যালুমিনিয়াম দোকানের আশেপাশে গলি দিয়ে ও মির্জাপুল দিয়ে পালিয়ে যায়।

এর মধ্যেই ছোট ভাই সাকিব এসে বলল, ভাই ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নুরুল আজিম রনির নেতৃত্বে ছাত্রলীগের সন্তাসীরা ২ নং গেইট থেকে গুলি করতে করতে শিক্ষা বোর্ডের দিকে আগ্রসর হচ্ছে। আমি তাকে বললাম, শিক্ষা বোর্ডের সামনে থাকে (ওয়াসিম সহ) থাকা ছাত্রদের বিশাল একটা অংশ বিষয়টা এরা প্রতিরোধ করবে।

আমি মুরাদপুর মসজিদ এর সামনে মেইন রোডের এই স্পট ছাড়ব না। সবাই যদি এক স্পটে চলে যায় ছাত্রলীগ এইদিক থেকে এসে আমাদের আবারো ঘিরে ফেলবে। এর মধ্যেই আমার মোবাইলে বেশ কয়েকটা ফোন আসতে লাগল। ফোন করা সবার জিজ্ঞাসা একটাই ভাই ওয়াসিমের খবর কি? আপনি কিছু জানেন?

সবাইকে বললাম, 'আমি এক দিকে ওয়াসিম অন্যদিকে। একজন ফোন করে বলল আপনি ওয়াসিমের খবর নেন! মির্জাপুল ও মসজিদ গলির দিক থেকে ছাত্রলীগের সন্তাসীরা আবার হামলা শুরু করে। প্রায় তাদের সাথে ৩০-৩৫ মিনিট ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলে। এক পর্যায়ে ছাত্রলীগ পালিয়ে যায়। মুরাদপুর মোড় আমাদের একক নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

এর মধ্যেই সম্ভবত চট্টগ্রামের এক ছোট ভাই আমাকে এসে বলল ভাই ওয়াসিম শিক্ষা বোর্ডের সামনে আহত হয়েছে। আমি মনে করেছিলাম ওয়াসিম হয়ত অন্যদের মত সচরাচর আহত হয়েছে (সে যে গুলিবৃদ্ধ হইছে তখনও জানতাম না)। এর মধ্যেই পেকুয়া থেকে ওয়াসিমের বন্ধু পারভেজ মোশাররফ আমাকে ফোন করে বললো, 'ভাই ওয়াসিম গুলিবিদ্ধ হয়ে মেডিকেল ইর্মারজেন্সিতে আছে।

এর মধ্যেই আমি সরাসরি ওয়াসিমের নাম্বারে ফোন দিলাম। প্রথমবার রিসিভ হল না আবার ফোন দিলাম, একজন রিসিভ করল; তখন তাকে জিজ্ঞেস করলাম ওয়াসিমের খবর কী? ভাই গুলিবিদ্ধ হয়ে ইমাজেন্সিতে চিকিৎসা চলতেছে। এর সাথে কথা বলে ফোন রাখতে না রাখতেই এর মধ্যেই মুরাদপুর মসজিদের পাশের বিল্ডিং-এর ছাদে আশ্রই নেওয়া ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা ছাদের ওপর থেকে ঢিল মারতেছে। মসজিদ গলি থেকে ছাত্রলীগ হামলা করতেছে। ছাত্ররা এদের ধাওয়া দিলে গলি থেকে হামলা করা ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। ছাত্ররা যে বিল্ডিং থেকে টিল ছুড়েছে সে বিল্ডিং এর নিচের গ্রীল ভাঙতে যাই। আমি ওইদিকে না গিয়ে বেশ কয়েকজন ছোট ভাইকে নিয়ে মুরাদপুরে মোড়ে গিয়ে ওয়াসিমের নাম্বারে আবার ফোন দিলাম।

ওপাশ থেকে একজন ফোন রিসিভ করে বলল, ভাই আমি প্রথমবার আপনার সাথে মিথ্যা কথা বলছি। সরি ভাই ওয়াসিম মারা গেছে! তখন মনে হল আমার মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়ল। আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না ওয়াসিম মারা গেছে। আমি আবারো জিজ্ঞেস করলাম! আমাকে নিশ্চিত করে বললো, আমি ওর পাশেই আছি,ওয়াসিম আর আমাদের মাঝে নেই। ওয়াসিম মারা গেছে! আমি আর্তচিৎকার করে কান্না শুরু করলাম।

পাশে থাকা ছোট ভাইয়েরা সবাই আমার দিকে এসে জিজ্ঞেস করল, ভাই আপনার কি হইছে? আমি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললাম, আমার ছোট ভাই ওয়াসিম গুলিবৃদ্ধ হয়ে মারা গেছে! উপস্থিত সবাই কান্না শুরু করে দিল। আবেগঘন অবস্থার সৃষ্টি হলো। চারদিকে যেহেতু মারামারি চলতেছে, মেডিকেল যাওয়ার জন্য বের হতে পারিনি।

ছোট ভাইয়েরাও বলতেছে এখন কোনো দিক দিয়ে যাওয়া যাবে না। একপর্যায়ে সবাইকে মুরাদপুর মোড়ে রেখে জিহাদকে সাথে নিয়ে সুন্নিয়া মাদরাসা রোড হয়ে হেটে হেটে বহদ্দারহাট মোড়ে আসি। মোড় থেকে রিক্সা নিয়ে বড় গ্যারেজ-কাতালগঞ্জ-পাঁচলাইশ থানা মোড়ে দিয়ে ওবায়দুর রহমান রুমন ভাইকে নিয়ে তিনজনেই দ্রুত লাশের রুমে আসি। লাশ ঘরে কাপড় মোড়ানো ৩টা লাশ!

এর মধ্যেই কান্নারত অবস্থায় ওয়াসিম কই কই বলে চিল্লাইতে থাকি। একপর্যায়ে লাশ ঘরে থাকা ছোট ভাই ডা. মেহেদী মধ্যখানের লাশটা ওয়াসিমের লাশ বলে। এরপর ওয়াসিমের লাশ জড়িয়ে ধরে কান্না করতে থাকি। একপর্যায়ে অনেকে ধরে আমাকে লাশের ঘর থেকে বাহিরে বসার স্থানে নিয়ে আসে।

তখনও আমার কান্না কোনোভাবেই আমি নিজে চাইলেও থামাতে পারতেছি না। একপর্যায়ে আমার কান্না দেখে ইমাজেন্সিতে থাকা অনেক ছোট ভাই ও অন্যান্য সব মানুষও কান্না করা শুরু করে। সেখানেও এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য সৃষ্টি হয়। পড়ে শুনলাম আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি, এরপর অনেকে মিলে ফ্যানের নিচে বসিয়ে মাথায় পানি দেওয়ার কিছুক্ষণ পর আমার জ্ঞান ফিরে আসে।

শহীদ হওয়ার প্রায় ২০ মিনিট আগে ওয়াসিমের কথা হয় নাঈম ভূইয়ান-এর সাথে। হৃদয়বিদারক সেদিনের সেই মুহূর্তের স্মৃতিচারণ করে বলেন—

১৬ জুলাই দুপুর ২ টা চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের ভেতরে আমি সাইফুল করিম, আবির ও সালাউদ্দিন সাহেদ ভাইসহ শিক্ষা বোর্ডের পাশে একটি বড় আম গাছের নিচে ক্যান্টিন থেকে নিয়ে চা খাচ্ছিলাম।

ওয়াসিম চা খাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে দুইটা পঁচিশ মিনিটে আমাকে বলে, 'ভাইয়া আপনার একটা ভিডিও ঢাকা পোস্টে ভাইরাল হয়েছে।' আমি বললাম, কী ভিডিও? ওটা কি তোমার কাছে আছে? অতঃপর সে আমাকে ফেসবুক মেসেঞ্জারে দেয়। ঠিক তখনই তার মোবাইলে একটি কল আসে বলে ভাই আমি দুই মিনিটের জন্য যাচ্ছি।

আমার একটা ছোট ভাই আসছে তাকে রিসিভ করে নিয়ে আসি তখন ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মিছিল দিচ্ছিল। আমি বললাম সাবধানে যাও তুমি আসলে আমরা একসাথে বের হব। সে বলল ভাই আমি দুই মিনিটের মধ্যে আসতেছি।

এরই মধ্যে খান মাহমুদ তালাত রাফি ঘোষণা করে দুই নাম্বার গেটে প্রোগ্রাম আমরা দুই নাম্বার গেটে চলে যাই সেখানে অনেক রক্তক্ষয় যুদ্ধ হয় এবং আমি নিজে ওখানে আহত হয় ফিনলে স্কয়ারের সামনে।

আমার ভাই দুই মিনিটের জন্য বলে সে যে চলে গেল আর ফিরে এলো না। এইটা যে চিরবিদায় ছিল, সেটা কখনো ভাবতে পারিনি। ভালো থাক শহীদ ওয়াসিম আকরাম। আমার বিশ্বাস আল্লাহ তোকে শহীদি মর্যাদা দান করেছেন।

পরিবারের স্মৃতিচারণ

মোহাম্মদ ওয়াসিম এর বেড়ে ওঠা ছোট চাচা মাদরাসা শিক্ষকের চাচা জয়নাল আবেদীন জয়নাল আবেদীন বলেন—

> 'আমি সত্যায়ন করতেছি, ছোট বেলা থেকেই ওয়াসিম ও তার বোনদের কুরআন শিক্ষা থেকে শুরু করে সব পড়াশোনা অষ্টম শ্রেণি নাগাত পড়িয়েছি। সে কখনো মায়ের সাথে বাকবিতণ্ডায় জড়ায়নি। মায়ের কথাকে বিনাবাক্যে মেনে নেওয়া, মায়ের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল ওয়াসিম আকরাম এর সবচেয়ে বড় গুণ। ও দুঃসাসী ছিল,সবসময় অন্যায়ের প্রতিবাদ করতো। আপনি ওর ফেইসবুক পোস্ট গুলো পড়লেই তা বুঝতে পারবেন। ওয়াসিম-এর অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ-এর জন্য নানামুখী হুমকি আসত পরিবারে। মাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য সর্বদা বলতো, আম্মা যতোদিন হায়াত আছে এর থেকে এক মুহূর্ত বেশি বেঁচে থাকতে পারবো না। জন্ম-মৃত্যু আল্লাহর হাতে,ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। আমার মৃত্যু হবে রাজপথে। আমার জন্য দোয়া করেন।'

১৫ জুলাই ওর বাবার কাছ থেকে দুই হাজার টাকা ধার নিয়েছিল। টাকাগুলো নেওয়ার সময় বলেছিল, 'আর তোমার কাছ থেকে টাকা নিব না, এবারেই শেষ! চাচা জয়নাল আবেদীন আর্তনাদ করে বলেন, এর পরের দিন ওয়াসিম আমাদের ছেড়ে চলে গেল।

ওর পড়াশোনা শেষের দিকে ছিল। ইচ্ছে ছিল শিক্ষক হওয়ার। আর যদি নিতান্ত দেশের পরিস্থিতির পরিবর্তন না হয় দেশের বাইরে চলে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। আগে থেকেই পাসপোর্ট করে রেখেছিল। ১২ জুলাই আমি যখন শহরে ওর কাছে যায়, আমাকে বলে যে, ও এনটিআরসির শিক্ষক হিসেবে যোগদানের বিস্তারিত জানতে চায়।'

মোহাম্মদ ওয়াসিম এর অন্যায়-এর বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জারি রাখার ব্যাপারে বলতে গিয়ে ছোট চাচা জয়নাল আবেদীন একটি বীরত্বগাথার গল্প বলেন—

> 'আমাদের গ্রামের মধ্যে একজন প্রতাপশালী লোক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল, বলতে গেলে দস্যু টাইপের ছিল। যারা ওদের কাছে মাথানত করতো না রাতে এসে অতর্কিত আক্রমণ করে রাতের মধ্যে গায়ের হয়ে যেত। ওয়াসিম এই সন্ত্রাসীর জিম্মি দশা থেকে এলাকাবাসীকে মুক্ত করার জন্য তার এক সিনিয়র ভাইকে সাথে নিয়ে এলাকার যুব সমাজকে সংঘবদ্ধ করে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সবাই কবরস্থানে গিয়ে শপথ করে। দীর্ঘদিন এর বন্দিজীবন থেকে এলাকাবাসীকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন তিনি। তার জীবন দেওয়ার আগে এটাই ছিল তার সবচেয়ে বড় বিজয়। রাজপথে যাওয়ার, নেতৃত্ব দেওয়ার অনুপ্রেরণা এখান থেকেই পেয়েছেন।'

১৫ জুলাই, ছাত্রলীগের সাথে চট্টগ্রামে ষোলশহরে প্রথম সংঘর্ষের দিন ওয়াসিম পায়ে গুরুতর আঘাত পায়। ওইদিন সহযোদ্ধারা তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার মুহূর্তের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছিল। পায়ের আঘাতকে উপেক্ষা করে ১৬ জুলাই ঐতিহাসিক ঘোষণা দেন, 'চলে আসুন ষোলশহর'।

ওয়াসিম-এর ছোট বোন ভাইয়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন—

'ভাইয়ের একটা কাপড় ধুয়ে দিলে ১০ টাকা করে দিত। মৃত্যুর কিছুদিন আগে শিলং গিয়েছিল। ওখান থেকে ভাই আমার জন্য জামা -কাপড় নিয়ে আসে। আমার জীবনটা শূন্য হয়ে গেছে।'

দক্ষিণ মেহেরনামা ইসলামী তরুণ কাফেলা

বারো জন বন্ধু মিলে ইসলাম প্রচার-প্রসারের জন্য ২৫ আগস্ট ২০২০ সালে প্রতিষ্ঠা করেন, 'দক্ষিণ মেহেরনামা ইসলামী তরুণ কাফেলা।' বারোজনের মধ্যে ওয়াসিম ছিলেন মূলত কাফেলার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। আলেমদের সাথে ছিল গভীর সখ্যতা। এর মাধ্যমে তিনি এলাকায় বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিল এর আয়োজন করার চেষ্টা করতেন। পাশাপাশি সমাজসেবামূলক কাজ পরিচালনা করতেন।

চাচা জয়নাল আবেদীন বলেন—'ওয়াসিম-এর আলেমদের সাথে ছিল গভীর সখ্যতা। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও পালনে ওয়াসিম ছিলো একনিষ্ঠ। শহীদ হওয়ার পর শহীদের সম্মানে 'দক্ষিণ মেহেরনামা তরুণ কাফেলা'-এর নাম পরিবর্তন করে 'দক্ষিণ মেহেরনামা ইসলামী তরুণ কাফেলা, শহীদ ওয়াসিম স্মৃতি সংসদ রাখা হয়।'

মেহেরনামা ব্লাড ব্যাংক

২০২০ সালের পহেলা জানুয়ারি প্রান্তিক মানুষের জন্য রক্তের সরবরাহ সুলভ করার জন্য বেশ কয়েকজন বন্ধু মিলে প্রতিষ্ঠা করেন মেহেরনামা ব্লাড ব্যাংক। এর মাধ্যমে অসংখ্য মানুষের রক্তের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কথা প্রসঙ্গে রক্তদাতাদের ডেটা শীট গুলো আমাকে দেখালেন। চিন্তার রাজ্যে হারিয়ে গেলাম। যেই মানুষটা মানুষের জন্য লাল ভালোবাসা বিনামূল্যে ব্যবস্থা করার মাধ্যমে জীবন বাঁচানের মাধ্যম হতো। তাকে কী নির্মমভাবে ছাত্রলীগ গুলি করে হত্যা করে!

মেহেরনামা ব্লাড ব্যাংক
স্থাপিত: ২০২০খ্রিঃ
মেহেরনামা, পেকুয়া, কক্সবাজার।
সূত্রঃ
তারিখ:
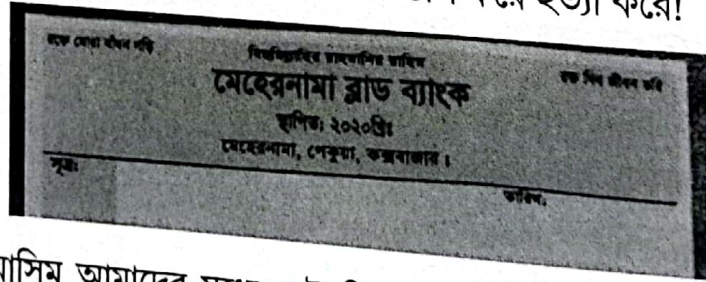
শহীদ ওয়াসিম আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু তার হাতে গড়া ব্লাড ব্যাংক ঠিকই মৃত্যুর পরও মানুষের বেঁচে থাকার উপলক্ষ। ভালো কাজগুলো কখনো বিলুপ্ত হয় না। মৃত্যুর পরও ওয়াসিম কতোই না সৌভাগ্যবান। এখনো প্রতিনিয়ত ভারী হচ্ছে ভালো কাজের ঝুড়ি। রক্তের সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত 'মেহেরনামা ব্লাড ব্যাংক'-এর অন্যতম সংগঠক ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন তিনি। 'রক্তে মোরা বাঁধন গড়ি, রক্ত দেব জীবন ভরি! এই স্লোগান-এর বাস্তব প্রয়োগ ঘটেছিল শহীদের জীবনে। মৃত্যুর মাধ্যমে তিনি তার কথা রেখেছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে দেখা করার নির্মম গল্প

ছোট চাচা জয়নাল আবেদীন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর সাথে আন্দোলন চলাকালীন শহীদের পরিবারের সাক্ষাৎকার নামক প্রহসন সম্পর্কে বলেন—

> ‘২৫ জুলাই শেখ হাসিনা আমাদের সাক্ষাৎকার এর জন্য সরকার পুলিশের মাধ্যমে ঢাকায় নিয়ে আসে। আপনারা টেলিভিশনে হয়তো দেখেছেন আমরা স্বেচ্ছায় গিয়েছি এখানে। আমরা এখানে স্বেচ্ছায় আসিনি আমাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে যাওয়ার জন্য। আমরা দুই ভাই ও ওয়াসিম-এর মা মোট তিনজনকে দেখা করতে নিয়ে আসে। আমাদের কে পুলিশ-এর অফিসার ভয় দেখিয়েছিল এই বলে—‘ওয়াসিমকে নাশকতাকারী হিসেবে উপস্থাপন করে প্রথম ও প্রধান আসামি এবং আরো অনেকজনকে হত্যা মামলার আসামি দিয়ে মামলা রজ্জু করা হবে। আমাদের রাত ১০ টার সময় থানায় নিয়ে রাত প্রায় ১ টা নাগাদ রেখে নানাভাবে ঢাকায় যাওয়ার জন্য বল প্রয়োগ করে। অবশেষে আমরা একপ্রকার বাধ্য হয়ে দেখা করতে যাই। শেখ হাসিনা আমাদের সামনে ৪৫ মিনিট থাকে। তিনি আমাদের বলেন, আমি স্বজনহারা মানুষ। আপনাদের কষ্ট আমি বুঝতে পারি। ওদের তো দাবিদাওয়া মেনে নিয়েছি। কেন ওরা এমনটা করল। ভাবখানা এমন যেন কিছু জানেন না।’

শেষ বিদায়

আনুমানিক ২ টা ৪৫-এর দিকে গুলিবিদ্ধ হন। তড়িঘড়ি করে রিকশাযোগে চট্টগ্রাম মেডিকেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় আনুমানিক তিনটা পনেরোর দিকে। কিন্তু এর মধ্যে ওয়াসিম দুনিয়ার পাঠ সফলতার সাথে চুকিয়েছে। হাসপাতালে নিয়ে আসার আনুমানিক ১৫ মিনিট আগে ওয়াসিম মারা যান। পরিবার সন্ধ্যা ছয়টার দিকে হন্তদন্ত হয়ে চলে আসেন চট্টগ্রাম মেডিকেলে। পুরো হাসপাতাল জুড়ে শোকের মাতম নেমে এলো। ১৬ জুলাই সারাদেশে ৬ জন আর চট্টগ্রাম শহরেই ৩ জন ঘাতকের ছোঁড়া গুলিতে প্রাণ হারান। একসাথে সারিবদ্ধ করে হাসপাতাল করিডোর তাদের নিতর দেহ রাখা হয়।
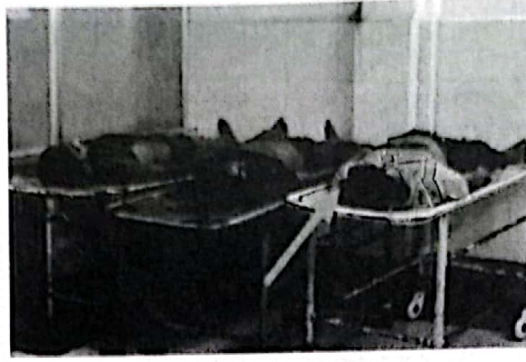
ছবি : চট্টগ্রাম মেডিকেলে পরে থাকা শহীদ ওয়াসিম-এর নিথর দেহ (ডানদিক থেকে প্রথমে)

হাসপাতালের যাবতীয় প্রক্রিয়া শেষ করে ভোর চারটার সময় লাশ বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। পুলিশের নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও অগণিত মানুষ শেষবারের জন্য দেখতে ভিড় জমায় নিজ গ্রাম দক্ষিণ মেহেরনামা বাজারপাড়ায়। সকাল ১১ টায় ছোট চাচা জয়নাল আবেদীন প্রাণপ্রিয় ভাতিজার জানাযার সালাত আদায়ের মাধ্যমে দুনিয়ার সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা সমাপ্ত হয়।

শহীদ হওয়ার আট দিন আগে ৮ জুলাই ফেইসবুক পোস্টে লেখেন—'আমি সৃষ্টি, সুযোগ পেলে স্রষ্টার পৃথিবীকে ঘুরে দেখতে চাই। স্রষ্টার পৃথিবী ঘুড়ে দেখার সুযোগ দেইনি জালিমের চিরায়ত স্বভাব।'

শহীদ ওয়াসিম এলাকায় মাহফিল থেকে শুরু করে বিভিন্ন কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন। স্বপ্ন দেখতেন শিক্ষক হওয়ার। পৃথিবীতে সবার স্বপ্ন পূরণ হয় না। ওয়াসিমও সেই তালিকার একজন। কিন্তু সে ব্যর্থ নয়। যে আত্মত্যাগ সে দিয়ে গিয়েছে দেশ ও জাতির জন্য, তা ইতিহাসে লেখা থাকবে যুগের পর যুগ।

তথ্যসূত্র

১. শহীদ ওয়াসিম-এর আপন ছোট চাচা জয়নাল আবেদীন-এর সাক্ষাৎকার

২. এলাকার বড় ভাই ও সহযোদ্ধা 'আব্দুল্লাহ আল নোমান'-এর সাক্ষাৎকার

৩. আন্দোলন চলাকালীন সময়ে মৃত্যুর অল্পসময় পূর্বে দেখা হওয়া 'নাঈম ভূইয়ান'-এর বিবরণ

তথ্য সংগ্রহে:

অন্তর সফিউল্লাহ; স্টোরি মেকিং: অন্তর সফিউল্লাহ, এবং ড. মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন

‘তিনটা লাশের সাথে আমার শান্ত মণির লাশটা বেওয়ারিশ ছিল’

শহীদের নামঃ মোঃ ফয়সাল আহমেদ শান্ত
বয়সঃ ১৯ বছর (জন্ম ২৩ মে ২০০৫)
মৃত্যুর তারিখঃ ১৬ জুলাই ২০২৪।
পিতার নামঃ মোঃ জাকির হোসেন।
মাতার নামঃ মোছাঃ কোহিনুর।
ঠিকানাঃ বাবুগঞ্জ, বরিশাল
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ অনার্স স্নাতক প্রথম বর্ষ, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ওমরগণি এম.ই.এস.কলেজ, চট্টগ্রাম

গোধূলিবেলা একমাত্র ছেলের প্রিয় নাস্তা চা ও পরোটা প্রস্তুত করে অপেক্ষা করছেন। এই বুঝি এসে বলবে, আম্মু চা দাও! কিন্তু একটা দমকা ঝড় সবকিছু তছনছ করে দিল। শহীদ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে ঠিক ঠিকই আম্মুকে স্মরণ করেছিল। সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের বুলেটে বিদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে ‘মা’ গগণবিদারী চিৎকার দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। জীবনের সমাপ্তি হয় দুনিয়ার সবচেয়ে প্রিয় মানুষকে স্মরণের মাধ্যমে। শহীদের গল্পের সবটুকু জুড়েই ছিল মায়ের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা সম্মান ও ভালোবাসায় ভরপুর। মৃত্যুর সংবাদ শুনে গগনবিদারী চিৎকার দিয়ে একমাত্র ছোট বোন বলেছিল, ‘আমার ভাইয়ার কাছে যাব। আমার ভাইয়া কোথায়?’

মৃত্যুর একদিন আগে ১৫ জুলাই শহীদ ফয়সাল আহমেদ শান্ত ফেইসবুক টাইমলাইনে লেখেন—

‘সশস্ত্র ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের হামলায় রক্তাক্ত হলো অসংখ্য নারী শিক্ষার্থীরা। এই সন্ত্রাসীদের হাতে নিরাপদ নয় আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো। এই সন্ত্রাসীদের হাতে নিরাপদ নয় আমাদের দেশ। ছাত্রলীগ হঠাও, দেশ বাঁচাও। স্বৈরাচার হটাও, দেশ বাঁচাও।’

একই দিনে অপর এক পোস্টে আন্দোলনরত মেয়েদের প্রহারের ছবি দিয়ে ক্যাপশনে লেখেন— 'আন্দোলনরত ছাত্রীদের পেটাচ্ছে ছাত্রলীগ।'

ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস, ১৬ জুলাই সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের গুলিতে ফয়সাল আহমেদ শান্ত শহীদ হন। আচ্ছা এটা কী কোনো কাকতালীয় বিষয়, নাকি 'নুরুল আজিম রনির' পরিকল্পিত মার্ডার? প্রশ্ন থেকেই যায়! সন্ত্রাসীগুলো এখনও মুক্ত বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

ফ্রেন্ডস জোন মেসেঞ্জার গ্রুপ

শহীদ মো. ফয়সাল আহমেদ শান্ত ১৬ জুলাই সকাল থেকে শহীদ হওয়া অবধি 'ফ্রেন্ডস জোন মেসেঞ্জার' গ্রুপে 'পুং সুং ওয়াংদু' নামের ফেইক আইডি থেকে আন্দোলন এর দিকনির্দেশনা দিচ্ছিলেন বন্ধুদের। দীর্ঘ এই কথোপকথন উঠে আসে হতাশা, বীরত্ব, ছাত্রলীগের নৃশংসতা, পুলিশের গাদ্দারী, জালিম হাসিনার নৃশংসতার ভয়াবহ চিত্র। তাহলে দেরি কেন? চলুন, স্মৃতির পাতায় ঘুরে আসি ১৬ জুলাই ২০২৪ রণক্ষেত্র চট্টগ্রাম শহরের মুরাদপুর, ষোলশহর থেকে।

পুং সুং ওয়াংদু: ওদের কাছে দা, রড, ছুরি আছে। আমাদের কী আছে?

সুমাইয়া: রামদা নিয়ে যাবি!

পুং সুং ওয়াংদু: ওদের হাতে থাকলে সমস্যা নেই। আমাদের হাতে থাকলে সমস্যা।

সুমাইয়া: কেন?

পুং সুং ওয়াংদু: ওদের তো সরকার শেল্টার দিবে। আমাদের কে দিবে?

কিছুক্ষণ পর ফয়সাল আহমেদ শান্ত ওরফে 'পুং সুং ওয়াংদু' একটি সিক্রেট মেসেঞ্জার কথোপকথনের স্ক্রিনশট গ্রুপে দেয়। যেখানে লেখা ছিল—'তোমরা মারবা, পিটাবা। বাকি দায়িত্ব আমার আর ইনান ভাইয়ের। পুলিশ আমাদের কিছু করবে না।'

পুং সুং ওয়াংদু: এই ইনান হচ্ছে ছাত্রলীগের সেক্রেটারি। বড় নেতারা শেল্টার দেয়, পুলিশ শেল্টার দেয়। সাধারণ শিক্ষার্থীরা অসহায়।

দুপুর ১২:২৬ মিনিট, পুং সুং ওয়াংদু চট্টগ্রাম শহরে 'বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন'-এর সারাদেশে ছাত্রসমাজের ওপর মর্মান্তিক হামলার প্রতিবাদে ও কোটা সংস্কারের এক দফা দাবিতে বিকাল ৩:৩০ মিনিটে কর্মসূচি 'বিক্ষোভ মিছিল ও ছাত্রসমাবেশ' এর একটি পোস্টার গ্রুপে দেয়।

পুং সুং ওয়াংদু: যাবি?

আব্দুল্লাহ: ইনশাআল্লাহ যাব। তুই যাবি?

পুং সুং ওয়াংদু: যাব। এক্সট্রা একটা ব্যাগ, শার্ট ও গামছা আনিস। পারলে ব্যাগে পাথরের ছোট পাইপ আনিস।

সুমাইয়া: নিজের সেইফটির জন্য কিছু নিয়ে যাইস।

পুং সুং ওয়াংদু: যাব।

প্রায় এক ঘণ্টা পর, ১:২৫ মিনিটে বরাবরের ন্যায় আবারও 'পুংসুং ওয়াংদু' এর দিকনির্দেশনামূলক ম্যাসেজ। আর মাত্র দুই ঘণ্টা বাকি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পূর্বঘোষিত চট্টগ্রাম শহরের আন্দোলনের। পুং সুং ওয়াংদু রিমাইন্ডার দেন। আন্দোলনে আসলে নিজেদের নিরাপত্তা ও প্রতিপক্ষকে কীভাবে ঘায়েল করতে হবে, তার করণীয় সম্পর্কে বাতলে দেন।

পুং সুং ওয়াংদু: আন্দোলন যদি কেউ যান, যেসব জিনিস সাথে রাখবেন।

১. একটি বড় ব্যাগ।

২. এক্সট্রা শার্ট ও গামছা।

৩. ফার্স্ট এইড সামগ্রী।

৪. ব্যাগ ভর্তি পাথর বা কঙ্কর।

ওরিসা: গেলে আপডেট দিস।

সুমাইয়া: তোরা যাবি? সাবধানে থাকিস। আল্লাহ ভরসা।
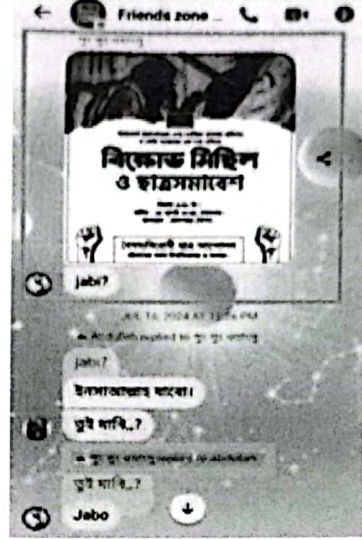
পুং সুং ওয়াংদু: সবাই গ্রুপ করে থাকতে হবে।

আব্দুল্লাহ: হুম।

দুপুর ২:৩২ মিনিটে সহপাঠীদের উদ্দেশ্য শান্ত ম্যাসেজে বলেন—

পুং সুং ওয়াংদু: একটা টুথপেস্ট রাখিস। পুলিশ টিয়ার গ্যাস মারলে নিজের নাক আর চোখের নিচে ডলে দিবি। ৩ টার দিকে যাব। ৩:৩০ শুরু। অথবা আরেকটু আগে শুরু হবে।

আব্দুল্লাহ: আমি বের হচ্ছি।

পুং সুং ওয়াংদু: ওকে আমিও বের হচ্ছি।

আব্দুল্লাহ: কোথায় থাকবি বলিস?

আব্দুল্লাহকে ষোলশহরে না আসার জন্য সতর্ক করে ফয়সাল। আগে থেকেই ছাত্রলীগের কুখ্যাত সন্ত্রাসী মাফিয়া 'নরুল আজিম রনি' ষোলশহর স্টেশন দখলে নেয়।

পুং সুং ওয়াংদু: মুরাদপুর থাকব। ষোলশহরে আসিস না। মুরাদপুর রেললাইনে দাঁড়াইস, ওখানে মানুষ থাকবে।

ঢাকায় ছাত্রলীগের নৃশংসতা থেকে কেউ ছাড় পায়নি। নারী শিক্ষার্থীদের বেঘোরে ছাত্রলীগ ও পুলিশ নির্মমভাবে পিটায়। হাসপাতালগুলোতে হামলে পড়ে হায়েনার দল। ঢাকায় আহত শিক্ষার্থীদের জরুরি রক্তের সরবরাহ নিশ্চিতের জন্য ব্লাড গ্রুপের একটি লম্বা লিস্ট রক্তদাতাদের নাম্বারসহ বন্ধুদের মেসেঞ্জার গ্রুপে দেন।

পুং সুং ওয়াংদু: কখনো ঢাকার মধ্যে যদি রক্তের প্রয়োজন হয়। ভালোবাসা রইল সকল রক্তদাতা ব্যাক্তির জন্য। Only for Dhaka Distric। রক্তের গ্রুপ ও ফোন নাম্বার। মেয়েরা, তোরা পারলে এমনে রক্তের ডাটা কালেক্ট কর। এ+ বি+ ও+ এভাবে আলাদা আলাদা করে।

আব্দুল্লাহ: ও নেগেটিভ কারও লাগবে? আমাকে বলিস। আমার রক্ত দেওয়ার টাইম হয়েছে।

বেলা যত গড়াচ্ছে, সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সহিংসতা ততোই বৃদ্ধি পাচ্ছে!

পুং সুং ওয়াংদু: মুরাদপুর ককটেল মারতেছে। আর কিছু ছাত্রলীগ ষোলশহর থেকে যাচ্ছে মুরাদপুর।

সুমাইয়া: তোরা বুঝেশুনে যাইস। ষোলশহরে অবস্থা বেশি খারাপ।

আব্দুল্লাহ: ফয়সাল, তুই কোথায়?

পুং সুং ওয়াংদু: মুরাদপুর যাচ্ছি।

আব্দুল্লাহ: আচ্ছা আয়।

কিছুক্ষণ পর আন্দোলনের আপডেট জানিয়ে বন্ধুদের মধ্যে একজন ভয়েস পাঠায়। ফয়সাল প্রতিউত্তরে বলেন—

পুং সুং ওয়াংদু: ফেইক এটা 'আই.আই.ইউ.সি' থেকে সাধারণ ছাত্ররা উদ্ধার করেছে।

সুমাইয়া: আচ্ছা, তাও সাবধানে থাকিস।

ফয়সাল আহমেদ শান্ত রণক্ষেত্র পরিণত হওয়া মুরাদপুর অবস্থান করছে। ধাওয়া পাল্টা-ধাওয়া চলমান। 'ফ্রেন্ডস জোন' ম্যাসেঞ্জার গ্রুপকে সচল রাখা 'পুং সুং ওয়াংদু' হঠাৎ কোনো প্রকার সাড়া দিচ্ছে না। কেন এমন হলো? তবে কি অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটেই গেল! কিছু কি হয়েছে 'পুং সুং ওয়াংদু'র?

আব্দুল্লাহ: ফয়সাল, তোরা কি ফ্লাইওভারের নিচে?

হোসাইন মাহমুদ: মাইকের এখানে কেউ আছিস?

আব্দুল্লাহ: ওখান থেকে উল্টো চলে আয়।

হোসাইন মাহমুদ: মোড়ে আয়।

আব্দুল্লাহ: বহদ্দারহাট যায় যেদিকে ওদিকে চলে আয়।

হোসাইন মাহমুদ: আসতেছি। কই তোরা? পুলিশ বক্সের এখানে আছস কেউ?

ভরসার জামাই: তুই কোন জায়গায় আছিস এখন? এতসব এই খুনি হাসিনার জন্য হচ্ছে। সে যেন ৭৭ আর না দেখে!

হোসাইন মাহমুদ: ইনশাআল্লাহ। কোথায় এখন তুই?

ভরসার জামাই: জিএসসি যেতাম। আম্মু বাহির হতে দিচ্ছে না। আটকিয়ে রাখছে। রেডি হয়ে বসে আছি এখনো।

হোসাইন মাহমুদ: আমি মনে করসি আসছস তুই। ফয়সাল'রা এখন কোথায়?

ভরসার জামাই: ওরা মুরাদপুরে না হয় বহদ্দারহাট মেবি।

হোসাইন মাহমুদ: মুরাদপুরে দেখিনি।

ভরসার জামাই: কল দিয়ে দেখ কোথায় ওরা। তুই কোন জায়গায় আছিস এখন?

গুরো মাইফুয়া: পোস্টে দেখলাম, ষোলশহরে না যেতে বলছে। ওখানে কি অন্য জায়গার তুলনায় অবস্থা খারাপ?

টেক্সট প্রতিউত্তর সঙ্গে সঙ্গে দেয়নি কেউ! বিকাল ৫:৪৮ মিনিট। এর মধ্যে অনেক কিছু হয়ে গেছে। বন্দরনগরী চট্টগ্রাম শহরের মুরাদপুর, ষোলশহর, দুই নং গেইট ও আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু জায়গা যেন মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে! ইতিমধ্যে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আইকনিক হিরো রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়েছেন। এদিকে দ্বিতীয় শহীদ চট্টগ্রাম কলেজের শিক্ষার্থী 'ওয়াসিম আকরাম' শহীদ হন। ফয়সাল আহমেদ শান্তর কী হলো! কেন 'ফ্রেন্ডস জোনের' নেতৃত্ব দেওয়া তরুণ কোনো প্রকার সাড়া দিচ্ছে না?

হোসাইন মাহমুদ: হ্যাঁ গোলাগুলি হচ্ছে এই দিকে।

সময় ৬:০৮ মিনিট, হঠাৎ হোসাইনের টেক্সট! সবাই আতঙ্কিত! ফয়সাল এর কী হয়েছে! ফয়সাল সুস্থ আছে?

হোসাইন মাহমুদ: আবারো দুইজনের কাছেই গুলি!

প্রান্ত: ফয়সালের কোনো ফ্রেন্ড থাকলে কিংবা ওর আম্মুর নাম্বার থাকলে কাইন্ডলি কন্টাক্ট করতে বল। ফয়সাল নাকি হসপিটালে আছে!

সুমাইয়া: কী হয়েছে?

ভরসার জামাই: কীভাবে হয়েছে?

হোসাইন মাহমুদ: কী হয়েছে? ও এখন কোথায়? কোন জায়গায়?

ভরসার জামাই: ওয়েট কল দিচ্ছি।

হোসাইন মাহমুদ: তাড়াতাড়ি বল।

প্রান্ত: চট্টগ্রাম মেডিকেলে আছে। ওর পরিবারের সাথে কন্টাক্ট করতে বলা হচ্ছে।

ভরসার জামাই: ফয়সাল নাকি আর নেই! ইন্না-লিল্লাহ!

আনুমানিক ৫:৫০ মিনিটে ফয়সাল আহমেদ শান্ত শাহাদাত বরণ করেন।

যে কথা হয়নি বলা

১৬ জুলাই বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় 'মুরাদপুর' ছাত্রলীগের গুলিতে শহীদ হন মো. ফয়সাল আহমেদ শান্ত। সাজ্জাদকে বাঁচাতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হন তিনি। হঠাৎ সাজ্জাদের মাথায় ঝড়ের বেগে ইটের ভাঙ্গা অংশ এসে পড়ে। সাজ্জাদ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। শান্ত এগিয়ে আসে। সাজ্জাদকে প্রাণপণে সাহায্য করার চেষ্টা করল। পড়ে থাকা পাথরগুলো নিয়ে বীরের ন্যায় বুকচিতিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে শান্ত। হঠাৎ সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের গুলিতে লুটিয়ে পড়ে শান্ত। প্রত্যক্ষদর্শী সাজ্জাদ হৃদয়বিদারক সেদিনের ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন—ফটিকছড়ি থেকে আমরা তিনজন আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য রওনা হলাম। জিসানের বন্ধু ফয়সাল আহমেদ শান্ত আন্দোলনের বিস্তারিত জানাচ্ছেন। আমরা মোট চারজন আন্দোলনে আসছি, এ ব্যাপরে শান্তকে আগে থেকেই 'জিসান' অবগত করল।

জিসানকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমরা কোথায় আসব?' জিসান প্রতিউত্তরে বলল, 'মুরাদপুর চলে আস।' শান্ত আগে থেকে তার কলেজ ব্যাগের মধ্যে প্রয়োজনীয় সব বাসা থেকে নিয়ে আসে। আমরা মুরাদপুরে গিয়ে দেখি, সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা-ধাওয়া, টিয়ারশেল ও ইট নিক্ষেপ চলতেছে। মিছিলে আমি অংশগ্রহণ করি। আমার অন্য বন্ধুরা শান্তকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে।

দুইজন বন্ধু আমাকে না পেয়ে ওরা আন্দোলনের মধ্যে আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আমি ওদের থেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এবার আমি পরিচিত সবার থেকে বিচ্ছিন্ন। তীব্র প্রতিরোধ ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, মুরাদপুর রণক্ষেত্র পরিণত হয়। এক পর্যায়ে এসে আমি হঠাৎ পাল্টা আক্রমণের শিকার হই। আমার চোখে ইট পড়ার সাথে সাথে আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়ি। আন্দোলনকারী সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছে। আমি রাস্তায় পড়ে রয়েছি।

ঠিক তখনই ফয়সাল আহমেদ শান্ত আমাকে সাহায্য করে প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় দিয়েছে। আমাকে রাস্তা থেকে তুলে অন্য আরেক ভাইয়ের কাছে দেয়। আমার কাছে পড়ে থাকা ইটের ভাঙ্গা অংশগুলো হাতে নিয়ে শান্ত বীরের ন্যায় সামনে আগায়। ঠিক ওই মুহূর্তে শান্ত গুলিবিদ্ধ হয়। 'আম্মু-আম্মু-আম্মু' বলে গগনবিদারী চিৎকার দিয়ে রাজপথে লুটিয়ে পড়ে থাকে। আমি গুরুত্বর আহত হওয়ায় সহযোদ্ধা ভাইয়েরা আমাকে নিয়ে যায়।

কিছুটা সুস্থ হয়ে আমার বন্ধুদের কাছে যায়। বন্ধুরা বলল, 'শান্তকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।' কেনো জানি মনে কী আসল। বন্ধুদের মধ্য থেকে একজন হঠাৎ শান্তর ছবি দেখাল, সাথে সাথে বললাম, ভাই সেই তো গুলিবিদ্ধ হয়েছে আমাকে বাঁচাতে গিয়ে। আমি শুধু শান্ত নামটাই জানতাম, পূর্বে কখনোই দেখা হয়নি। আহ! আল্লাহ, আন্দোলনে আসার সময় যে আমাদের সব আপডেট দিচ্ছিল, আমাকে বাঁচাতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হলো, আম্মু, আম্মু, আম্মু বলে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। অতঃপর শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করল। আমি এতটাই হতভাগা, তাঁর জন্য কিছুই করতে পারলাম না। আমি মরে গেলে আমার তিনভাই বাবা-মায়ের পাশে থাকত, কিন্তু শান্তর বাবা-মায়ের পাশে কে থাকবে! আন্টির একমাত্র ছেলেকে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগগুলো দুনিয়া থেকে ছিনিয়ে নিল। ১৬ জুলাই, মুরাদপুরের এই স্মৃতি আমি কখনোই ভুলতে পারছি না। সারাজীবন এই ক্ষত আমাকে টুকরে টুকরে শেষ করবে।'

১৬ জুলাই, শান্ত শহীদ হওয়ার ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বন্ধু হোসাইন মাহমুদ বলেন—'আমি, সাজ্জাদ, শুভ ৩ জনে চট্টগ্রাম শহরের 'মুরাদপুর' দাঁড়িয়েছিলাম। কিছুক্ষণ আগেও ফয়সালের সাথে কথা বললাম। ফয়সাল বলেছিল, 'রাস্তার সাইডে একটা ব্রিজের ওপর দাড়িয়েছিল। আমাকেও আসতে বলেছিল।'

আমি মুরাদপুর থেকে ২ নাম্বার গেইটের দিকে গিয়ে ওকে খুজতেছিলাম, তখন হঠাৎ অনেক ছাত্র মিছিল দিয়ে যাচ্ছিল ২ নাম্বার গেইটের দিকে। সাজ্জাদ দৌড়ে মিছিলের প্রথম দিকে চলে গেছে। এদিকে আমি আর রাশেদ ফয়সালকে খুঁজে না পেয়ে আমরা ধীরে ধীরে সামনের দিকে যাচ্ছিলাম। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পরে ২ টা গুলির শব্দ শুনি। সাথে সাথে সব ছাত্ররা যে যেভাবে পারে পিছনের দিকে ছুটে আসছিল। আমরাও দৌড়ে ছুটে এলাম। মুরাদপুরের দিকে এসে সাথে সাথে সাজ্জাদকে কল দিলাম। ও এইদিকে আসতেছে বলল। এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ওর সামনে একজনকে গুলি করে হত্যা করে। তার কিছুক্ষণ পর একটা ছেলেকে কাঁধে নিয়ে কয়েকটা ছাত্র ছুটে এলো সাথে সাথে, কোথায় নিয়ে গেছে তাও আমার জানা নেই। কিছুক্ষণ পর, মেসেঞ্জার গ্রুপে বন্ধুরা সবাই বলাবলি করতেছিল, ফয়সালকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ওকে কল দেওয়া মাত্রই একটা লোক নাকি বলে উঠল ফয়সালের অবস্থা খারাপ। খবরটা শুনে আমার ভয় হচ্ছিল যে, ওরা আমার বন্ধু ফয়সালের ওপর গুলি চালাই নাই তো! এরপর আমি সাথে সাথে ওর একটা পিক খুঁজে নিয়ে আমার বন্ধু সাজ্জাদকে দেখালাম। জিজ্ঞেস করলাম, ওকে তো গুলি করেনি!'

সাজ্জাদ, 'কান্নামিশ্রিত কণ্ঠে আক্ষেপের সুরে বলতেছিল, হ্যাঁ এই ছেলেটাকেই গুলি করছে।' আমি তখন কান্না করতে লাগলাম, তার কিছুক্ষণ পর ওর থেকে জিজ্ঞেস করলাম কীভাবে হয়েছে এটা? সাজ্জাদ ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলে, 'মিছিল যখন ২ নাম্বার গেইটের দিকে যাচ্ছিল, তখন ওইদিকে থাকা ছাত্রলীগের সদস্যরা গুলি চালাতে শুরু করে, সাথে সাথে সবাই পেছনের দিকে সরে যায়। সাজ্জাদও সরে যাচ্ছিল, কিন্তু তখন অনেক দেরি করে ফেলেছিল।

তৎক্ষণাৎ ফয়সাল ওর হাতে থাকা ইটটি ছুঁড়ে মেরে পিছনের দিকে না গিয়ে সামনের দিকে আরেকটা ইট কুড়াতে গেল। তখন সাজ্জাদ ওর পিছনে চলে আসল। ফয়সাল ইটটি হাতে নিয়ে ওদের দিকে ছুঁড়ে মারার সাথে সাথে একটা গুলি এসে তার বুকের বা পাশে এসে লাগে, ও একটা চিৎকার দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ফয়সাল লুটিয়ে পড়ার সাথে সাথে কিছু ভাইয়েরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওকে কাঁধে করে নিয়ে আসে। ফয়সালকে মেডিকেলে নিয়ে যাই।' কিছুক্ষণ পর শুনি আমার বন্ধু ফয়সাল শহীদ হয়ে গেছে। ও যদি সামনের দিকে এগিয়ে না যেত, গুলি ওর বুকে না লেগে সাজ্জাদের পিঠে লাগত, মারা যেতে পারত সাজ্জাদ। ও মৃত্যুকে ভয় না পেয়ে এত এত ছাত্রলীগের সদস্যদের দিকে ইট মারতে ছুটে গেল। ও একটা বীর। আসলেই ও আমাদের বীরযোদ্ধা বন্ধু ফয়সাল আহমেদ শান্ত।'

মায়ের স্মৃতিতে ১৬ জুলাই

শহীদ মো. ফয়সাল আহমেদ শান্ত'র আম্মু একমাত্র ছেলেকে 'শান্ত মণি' বলে ডাকত। মায়ের প্রতি সম্মান, আনুগত্য, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় টইটম্বুর ছিল শান্ত মণির ১৯ বছরের পুরো জীবন। মায়ের তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠে তার শৈশব ও কৈশোর। কারাগার, রাজপথ অতঃপর শাহাদাতের বীরত্বগাথা ও মর্মান্তিক স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে একনাগাড়ে কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে বলা শুরু করেন। ১৬ জুলাই মৃত্যুর দিন সকালের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে শান্ত মণির আম্মু মোছা. কোহিনুর বলেন—'সকাল ৯ টার সময় গাছ লাগানোর উদ্দেশ্য একটি ব্যানার বানিয়ে স্কুলে যায়। গাছ লাগানোর জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেওয়ার পরে বাসায় আসে। আমার শান্ত মণি মোট তিনটা টিউশনি পড়াত। বাসায় এসে দুটো টিউশনি পড়ানোর জন্য বের হয়। প্রথম টিউশনি সকাল এগারোটায় পড়ানোর পড়ে আনুমানিক ১১:৩০ মিনিটে বাসায় আসে। আমি তখন সুমাইয়াকে নিয়ে স্কুলে ছিলাম। পাশের বাসার ভাবি বলেছিল, 'আপনার ছেলে বাসায় আসার পর কারেন্ট না থাকায় ফোনের লাইট জ্বালিয়ে তাড়াহুড়ো করে খাবার খায়।

ভাবি মনে করেছিল, হয়তো টিউশনি যাবার জন্য তাড়াহুড়ো করছে। আমার শান্ত মণি বাচ্চাদের ভীষণ পছন্দ করত। ঐদিন ভাবির বাচ্চাটা কোলে উঠতে চাচ্ছিল। শান্ত তখন বলেছিল, 'দাদা, এখন ব্যস্ত আছি। আমি এখন যাই।' এটা বলে খুব তাড়াতাড়ি বাসা থেকে বের হয়ে যায়। তারপর শান্ত মণি দ্বিতীয় টিউশন নির্ধারিত সময়ের আগে ২:৩০ মিনিটে পড়িয়ে ছুটি দিয়ে দেয়। ১৭ জুলাই আশুরার বন্ধের দিন বোনাস পড়াবে বলে ছুটি নিয়ে চলে আসে।'

শান্ত এই তাড়াহুড়ো করার নৈপথ্য কারণ আপনারা ইতিমধ্যে বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই। ফ্রেন্ডস জোন মেসেঞ্জার গ্রুপ এর 'পুং সুং ওয়াংদু' একদিকে প্রাত্যহিক কাজগুলো ঠিকঠাক শেষ করার চেষ্টা করছেন অন্যদিকে স্বৈরাচারী হাসিনার জুলমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জারি রাখার জন্য রাজপথে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন! সার্কেল বন্ধুদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। টিউশন শেষ করে প্রায় তিনটার সময় মায়ের সাথে অন্তিম দেখা করতে আসেন।

বিদায় বেলার স্মৃতিচারণ করে বলেন—'সেদিন বিকাল প্রায় ৩ টার সময় আমি সুমাইয়াকে নিয়ে স্কুল থেকে ফিরছিলাম। হঠাৎ শান্ত মণি পিছন থেকে ডাকতে শুরু করে, 'সুমাইয়া,সুমাইয়া বলে দুটো ডাক দেয়।'পিছনে ফিরে তাকিয়ে দেখি আমার শান্ত মণি ডাকতেছে। কাছে এসে মুচকি হাসি দিয়ে বললো, 'আম্মু,বাসার চাবিটা রাখো।' সাধারণত আমাকে কখনো চাবি দেয় না কারণ বাসার দুটো চাবি আছে। একটা আমার কাছে থাকে আরেকটা ওর কাছে।

আমি বললাম, 'আব্বু চাবি তো আমার কাছে আছে।'শান্ত মণি বললো, 'তারপরও আম্মু চাবিটা তুমি নিয়ে যাও।'কথাগুলো বলার সময় আমার শান্ত মণির চেহারাটা এতো সুন্দর লাগছিল! আমার শান্ত মণির কথা মনে হলে সেদিন এর নূরানি অবয়ব ভেসে ওঠে।

চলে যাওয়ার সময় খেয়াল করি শান্ত মণির কাঁধে কলেজ ব্যাগ।জিজ্ঞেস করলমা, 'আব্বু তুমি কোথায় যাচ্ছো?' আম্মু আমি দুই নং গেইটের দিকে যাচ্ছি।' ওদিকে যে আন্দোলন হচ্ছিল আমি জানতাম না। আব্বু তোমার না টিউশন আছে? শান্ত মণি বললো, 'আম্মু আমি দুপুরের টিউশন করিয়ে আসছি।' সন্ধ্যায় মাগরিবের পরে একটা টিউশনি আছে, ওর তো পরীক্ষা ওকে পড়াতে হবে না? আম্মু আমি মাগরিবের পরপরই চলে আসব।

শান্ত মণির আম্মু স্কুলে শিক্ষকতার পাশাপাশি টিউশনি করাতেন। দুপুরে একমাত্র সন্তান শান্ত মণিকে বিদায় দিয়ে টিউশনি করাতে বের হন। সন্ধ্যার আগে টিউশনি

করিয়ে তিনি বাসায় আসেন। বাসায় এসে প্রিয় পুত্রের পছন্দের নাস্তা তৈরি করেন। বিদায় বেলায় প্রাণপ্রিয় একমাত্র ছেলে বলেছিল, 'আম্মু আমি মাগরিবের পরপরই চলে আসবো।' গরম পরোটা সন্তানের মৃত্যুর সাথে সাথে ঠান্ডা হয়ে আসলো। কোথাও কেউ নেই! কী এমন হলো প্রিয় পুত্রের! কোথায় হারিয়ে গেলো? সেদিন বিষাদময় আলোআঁধারি সন্ধ্যা বেলার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে শান্ত মণির আম্মু কান্নাবিজরিত কণ্ঠে বলেন,—

'দুপুরে 'শান্ত মণি'-কে বিদায় দিয়ে আমি টিউশনি করাতে চলে যায়। টিউশনি করানোর পর বাসায় আসতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। আমার 'শান্ত মণি' কখনো বাইরের খাবার খেত না। চায়ের সাথে পরোটা বিষণ পছন্দ করতো। আমার শান্ত মণির জন্য গরম চা আর পরোটা বানিয়ে অপেক্ষা করছিলাম। পরোটা বানিয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও ও আসতে খুব লেট করতেছিল। যার জন্য আর চা করিনি ভাবলাম আসলে একসাথে চা করে খাবো। পরক্ষণে শান্ত মণির সবচেয়ে কাছের বন্ধু নোমান এর সাথে আরেকজন বন্ধু আসল।

অনেকদিন পর নোমান বাসায় আসে। আমি অনেক খুশি হই। নোমান আসছে একসাথে শান্ত মণিও হয়তো আসছে। আমরা সবাই একসাথে নাস্তা করবো। হঠাৎ নোমান বললো, 'আন্টি একটু বের হতে হবে।' এটা বলার সাথে সাথে পুরনো ভয় আমাকে ঘিরে ধরল। গতবছর নির্বাচনের আগে আমার ছোট্ট শান্ত মণিকে খুনি হাসিনার সরকার অন্যায়ভাবে জেলে ভরে রাখে। মারা যাওয়ার এক সপ্তাহ আগে থেকেই আন্দোলন চলাকালীন সময়ে সারাক্ষণ চিন্তা হতো আবার পুলিশ এরেস্ট করলো না তো! নোমান বললো, 'আন্টি আমাদের দ্রুত হাসপাতালে যেতে হবে!' কী বলো আমার বাবার কী হয়েছে? আন্টি শান্তর গায়ে গুলি লাগছে! দোয়া করেন শান্তর যেন কিছু না হয়।

আমি একটা চিৎকার দিয়ে বিছানার মধ্যো পরে যায়। আমার কাছে কিছু টাকা ছিল। টাকা নিয়ে দ্রুত একটা সিএনজি ভাড়া করে হাসপাতালের উদ্দেশ্য রওনা হয়। আমি অনবরত হাসপাতালে যাওয়ার পথে সিএনজিতে বসে দোয়া ইউনুস পাঠ করতেছিলাম। আমার শান্ত মণির যেন কিছু না হয়।'

হাসপাতালে যাওয়ার পথের বিষাদময় যাত্রাপথের বর্ণনার করার সময় আন্টি অনবরত কান্না করছিলেন। কালবৈশাখী ঝড় যেমন হঠাৎ এসে এক নিমিষেই সব তছনছ করে দেয় আন্টি সেদিন সবচেয়ে বড় ঝড়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। যে সন্তান কে ঘিরে এতো স্বপ্ন বুনেছিলেন। সেই প্রাণপ্রিয় সন্তান আদ্যো কী বেঁচে আছেন!

অল্প সময়ের যাত্রাপথ তবুও যেন পথ শেষ হচ্ছিল না। সেদিনের হাসপাতালে যাওয়ার ঘটনা ও হাসপাতালের বিষাদময় কালোরাত্রির বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন,—'সিনএনজির চালককে বলতেছিলাম ভাইয়া একটু দ্রুত যান। নোমান এর অপর বন্ধু বললো আন্টি আঙ্কেলকে কল করে বলুন চট্টগ্রাম চলে আসতে। আমি বললাম, 'কী বলো তুমি!' এখন তো ফেরি পাবে না। নোমান বললো, 'তাহলে বিমানে চলে আসতে বলেন। বিমান না পেলে সরাসরি গাড়ি নিয়ে চলে আসতে বলেন।' ছোটখাটো সমস্যা হলে কখনো ওর আব্বুকে কিছু বলতাম না। এমনিতেই আমরা তিনজন এখানে থাকি। ওর আব্বু সবসময়ই আমাদের নিয়ে দুশ্চিন্তা করতো। আমার তখনো বিশ্বাস করিনি আমার কলিজার টুকরে মারা গেছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের জন্য হয়তো সবাইকে আসতে বলছে।

আনুমানিক ৬:৪৫ মিনিট চট্টগ্রাম মেডিকেলে গিয়ে শুনতে পাই, 'ওসি, ডাকতেছে ফয়সালের আম্মু কোথায়? আমি তখনো ভুলেও চিন্তা করিনি আমার শান্ত মণি মারা গেছে। আমাকে শুধু একজায়গায় থেকে অন্য জায়গায় বসাচ্ছিল। আমি চিৎকার করে বলেছিলাম,আমাকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বসাচ্ছেন কেন? আমাকে আমার বাবার কাছে নিয়ে যান। আমি গেলেই আমার বাবা সুস্থ হয়ে যাবে। আমার শান্ত মণি কিছু হলেই বলতো, 'আম্মু আমার দাঁতে ব্যথা করে, আম্মু আমার পায়ে ব্যাথা করে। আব্বু তুমি এই দোয়াট পড়ো ঔই দোয়াটা পড়ো বলে শান্ত্বনা দিতাম। সেদিন আর সান্ত্বনা দিতে পারিনি! আমার শান্ত মণিকে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ সারাজীবন জন্য শান্ত করে দিলো। আমি যাওয়ার আগে পরপর তিনটা লাশের সাথে আমার শান্ত মণির লাশটা বেওয়ারিশ পরে ছিল! আমি অনেক কাকুতি মিনতি করে বলি আমার শান্ত মণির লাশটা যেন পোস্টমর্ডাম করানো না হয়। পুলিশ আমার শেষ আবদারটুকু রাখেনি! আমার বাবার ক্ষতবিক্ষত লাশটা আরো ক্ষতবিক্ষত করে।

ছবি: ডান থেকে শেষের লাশটি হলো শহীদ মোঃ ফয়সাল আহমেদ শান্ত।

আমার শান্ত মণির লাশটা যখন নিয়ে আসা হলো তখনো আমি নিজেকে বিশ্বাস করাতে পারিনি আমার শান্ত মণি দুনিয়াতে আর নেই। আমার মনে হচ্ছিল শান্ত মণি কোথাও হারিয়ে গেছে। আমি এখনো শান্ত মণির অপেক্ষায় বেঁচে আছি। সেদিন ফেইসবুকে একটা পোস্ট দেখলাম, মৃত্যুর সাতদিন পর এক মহিলা কবর থেকে জীবিত ফিরে আসছে! শান্ত মণি হয়তো কোনো একদিন ফিরে আসবে এই আশায় আমি বেঁচে আছি! শান্ত মণি এসে বলবে, 'আম্মু আমি আন্দোলনে হারিয়ে গিয়েছিলাম। এই দেখো আমি ফিরে এসেছি।'

শান্ত মণির মারা যাওয়ার রাজপথের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন,—'সাজ্জাদ ইটের ডিল খেয়ে মাটিতে লুঠিয়ে পড়ে। শান্ত মণি সামনে ডিল নিয়ে আগিয়ে গেলে ছাত্রলীগ গুলি করে। শান্ত মণি মাঠিতে লুঠিয়ে পড়ে।সবাই ধরে শান্ত মণিকে ভ্যান গাড়িতে তোলে। এর মধ্যে আবার সাজ্জাদ হোসাইনের কাছে যায়। যাওয়ার পরে বলতেছে ভাই সবার সাথে তো যোগাযোগ হয়েছে কিন্তু 'ফয়সালকে' তো কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। সাজ্জাদ বলল, 'ভাই আমার সামনে একজন ছাত্র ভাই গুলিবিদ্ধ হয়েছে।

ছবি: গুলিবিদ্ধ ফয়সাল আহমেদ শান্তকে ভ্যানে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার মুহূর্ত।

তখন হুসাইন সাজ্জাদকে শান্ত মণির ছবি বের করে দেখিয়ে বলে, 'ভাই দেখতো এটা ফয়সাল কিনা!' সাজ্জাদ খুব কান্না করে বলতেছিল ভাই এই ভাই তো। শান্ত মণি গুলি খাওয়ার পরে শুধু মা বলে একটা চিৎকার দিয়েছিল এর বাইরে কিছুই বলতে পারিনি! আমার শান্ত মণি আসরের সালাত আদায় করছিল রাস্তার মধ্যে। গুলি খাওয়ার সাথে সাথে সাথে মারা যায়। আমার শান্ত মণির লাশটা গোসল না করানোর জন্য আলেমরা বলেছিল কারণ শহীদদের গোসল করাতে হয় না। আমার শান্ত মণির লাশ কবরে রাখার আগ পর্যন্ত তাজা রক্ত ঝরতেছিল!'

কথাগুলো বলার সময় চারপাশ সুনসান নীরবতায় ছেয়ে গেল! পর্দার ওপাশ থেকে শান্ত মণির আদরের ছোট বোন বৃষ্টির কান্নার আওয়াজ ভেসে আসলো। পাশে বসে থাকা মধ্যবয়স্ক বাবা আহাজারি করে বললো, 'আমার বয়স পঞ্চাশ উর্ধ্বে হয়ে গেলো। এই বয়সে একমাত্র ছেলেকে হারালাম। আমি আর জীবনের ভার বইতে পারছি না! আহ!

সন্ত্রাসী আওয়ামী জাহেলিয়াত এরকম সহস্রাধিক পরিবারের স্বপ্ন ভঙ্গ করল! দুনিয়াতে কী আদৌ এই জাহেলিয়াত-এর বিচার পাবে সন্তান-হারানো অসহায় বাবা-মা।

সেরা মায়ের উপাধি

একমাত্র ছেলে শান্ত মণিকে ঘিরে যাবতীয় স্বপ্ন বুনেছিলেন মমতাময়ী মা। ছেলে বিদেশে যাবে। বিদেশে থেকে সেরা মায়ের মেডেল নিয়ে আসবে। স্বপ্নের অকাল প্রয়াণ হলো! প্রসঙ্গত সেরা মায়ের মেডেল নিয়ে আসার ব্যাপারে শান্তের আম্মু বলেন—'আমার শান্ত মণি আন্দোলন-এর সময় মারা যাওয়ার আগে রাস্তার মধ্যে আছরের সালাত করে! আমার বাবার কাপড়গুলো থরে থরে সাজিয়ে রেখেছি। আমার ছোট মেয়েটাকে কিছু না দিয়ে শান্ত মণিকে দিতাম। আমার ছোট মেয়েটা অভিমান করে বলত, আমাকে তো কিছুই দেও না সব তো ভাইয়াকেই দাও।

আমরা কী সারাজীবন শান্ত মণির ছবি দেখব। ছবি দেখেই কি বেঁচে থাকবো। শান্ত মণির ইতিহাস বলে বেড়াব। এর বিচার কি আমরা পাবো না। অনেক স্বপ্ন ছিল ছেলেকে নিয়ে। পাসপোর্ট করে আমার ভাইয়ের কাছে বিদেশ পাঠাব। কুরবানির সময় আমার ভাই এসে দেখে শান্ত মণি অনেক বড়সড় হয়ে গেছে। আমার বড় ভাই মাকে বলতেছে, 'মা আমার ভাগিনা তো আমাদের ছাড়িয়ে গেছে। আমার শান্ত মণি স্টুডেন্ট ভিসায় বাইরে যাবে। বিদেশ থেকপ বড় একটা এওয়ার্ড নিয়ে আসবে। আমি সেরা মা হমু। সেই স্বপ্ন আমার শান্ত মণি এরকমভাবে পূরণ করলো। এতো বড় সার্টিফিকেট দিয়ে গেল শান্ত মণি আমাকে। আমি শুধু আল্লাহর কাছে এতটুকু চায় দুনিয়াতে আমার সেরা মায়ের এওয়ার্ড দরকার নেই। আল্লাহ রোজ হাশরে তুমি আমাকে শহীদি মায়ের মর্যাদা দিয়ো।

আমার শান্ত মণি খুবই ধার্মিক ছিল। রাতে আমি যখন জাগ্রত হতাম উঠে দেখি শান্ত মণি তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করতেছে। ছোট একটা রুমে ওকে নিয়ে থাকতাম। আমি সজাগ হয়ে যাবো, আমার ঘুমে বিঘ্ন ঘটবে এই ভয়ে মশারিটাও খুলতো না। অনেক সময় দেখতাম মশারির ভিতর দাঁড়িয়ে

নামাজ করেতেছে। রাতে সারক্ষণ শুধু ইসলামিক বই পড়ত, ভিডিও দেখত। আপনি ওর বায়োতে ফেইসবুকে একটা উক্তি দেখেছেন—*যে হৃদয় শাহাদাত এর উচ্চাকাঙ্খা লালন করে সে হৃদয় কখনো হতাশ হয়না।*

ফেসবুক পোস্ট গুলো ওর মৃত্যুর সাথে মিলে গিয়েছে। ৬ জানুয়ারি ২০২২ সালে একটা স্ট্যাস্টাস দিয়েছে—'মাঝে মাঝে ভাবি রবের কাছে কী নিয়ে দাঁড়াবো? নেক আমলের থলিটা যে এখনো শূন্য, বেলাও যে ফুরিয়ে এলো।'

ওর মতো ছেলে যদি মৃত্যু সম্পর্কে এভাবে বলে 'বেলা যে ফুরিয়ে আসল' আমার শান্ত মণি হয়তো ও আগেই মৃত্যু সম্পর্কে টের পেয়েছিল। নয়তো আমাদের ও তো এই রকম চিন্তা আসে না। আমরা এই বয়সে চলে এসেও এখনো দুনিয়াকে কেন্দ্র করে আমাদের কতো প্রত্যাশা। কথা প্রসঙ্গে শান্ত মণির আব্বু কান্না মিশ্রিত কণ্ঠে বলেন,ওর এরকম একটা পোস্ট আছে—'আমি রবের কাছে ডানা ভাঙ্গা অবস্থায় এলে, ডানামেলে উড়তে উড়তে ফিরবো।'

শান্ত মণির আম্মু বললো—সে তো ডানা ভেঙ্গেই গেছে, গুলিটা তো ডানাই লাগছিল! আমার বাবা সবসময়ই শাহাদাত এর আকাঙ্খা লালন করতো। নামের মতো শান্ত ছিল। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ-কালাম পড়তো। পথে কাউকে দেখলে ভুবন ভোলানো সালাম দিতো।

ফয়সালের ডায়রি

ফয়সালের ডায়রির প্রতিটি পাতা জুড়ে লেখা ছিল পবিত্র কুরআনের আয়াত, ব্যাখ্যা, শানে নযুল। শান্ত কুরআনের প্রতি সবচেয়ে বেশি আগ্রহ ছিল৷ শান্ত মণির কুরআনের প্রতি গভীর ভালোবাসার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন—'শান্ত মণি আমাকে হরহামেশাই বলতো, 'আম্মু আমাকে তুমি মাদরাসায় কেন পড়াওনি?' আমার ছেলে জেনারেল লাইনে পড়েও কতো ধার্মিক ছিল। ওর আরবি হাতের লিখা দেখে বড় ভাইরা বলতো শান্ত তুমি এতো সুন্দর হাতের লিখা কীভাবে শিখছো? আমি মাদরাসায় পড়াশোনা করেছি। আমিই ওকে আরবি হাতের লিখা শিখিয়েছি কিন্তু আমার আরবি হাতের লিখা এতো সুন্দর না। শান্তর ডাইরির প্রতিটি পাতায় পাতায় লেখা আছে, কারো হক নষ্ট করা যাবে না, কারো সাথে জুলুম করা যাবে না, গণিমতের মাল, কুরআনের আয়াত দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল তাঁর ডাইরির পাতা। শান্ত মণি সবসময়ই নিজেকে দ্বীন ইসলাম এর জ্ঞান অর্জনে

জড়িয়ে রাখতো। সর্বদা ইসলামি বই পড়া ছিল তার অবসর সময়ের সাথী। শখ কিংবা আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ইসলাম। সবার সাথে যখন দেখা হতো, বলত, শহীদি মৃত্যুর কোনো হিসাব নেই।'

তথ্যসূত্র:

১. শহীদ মোঃ ফয়সাল আহমেদ আম্মু মোছাঃ কোহিনুর ও বাবা মোঃ জাকির হোসেন এর সাক্ষাৎকার

২. প্রত্যক্ষদর্শী বন্ধু 'সাজ্জাত'-এর সাক্ষাৎকার।

৩. প্রত্যক্ষদর্শী বন্ধু 'হোসাইন মাহমুদ' এর সাক্ষাৎকার। 'ফ্রেন্ডস জোন' মেসেঞ্জার গ্রুপ এর চ্যাট গুলো হোসাইন মাহমুদ এর মাধ্যমে আমাদের হাতে আসে।

তথ্য সংগ্রহে:

অন্তর সফিউল্লাহ; স্টোরি মেকিং: অন্তর সফিউল্লাহ এবং ড মোহাম্মাদ সরোয়ার হোসেন

হারিয়ে যাওয়া এক সম্ভাবনাময় তরুণ উদ্ভাবক

মেধা ও সৃজনশীলতায় তরুণ বয়সেই তিনি নিজেকে আলাদাভাবে মেলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির (আইইউটি) মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ২০১৭ ব্যাচের শিক্ষার্থী, জাহিদুজ্জামান তানভীন, প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে পড়ার সময় বুয়েট আয়োজিত 'মডেল শিপ প্রোপালশন কম্পিটিশন' ও 'সকার বট কম্পিটিশনে' অংশগ্রহণ করে পদক অর্জন করেন। তাঁর প্রতিভা দেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও ছড়িয়ে পড়ে। যুক্তরাজ্যভিত্তিক ইনস্টিটিউশন অব মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আয়োজিত ইউএএস এয়ারক্রাফট সিস্টেম প্রতিযোগিতায় তিনি ও তাঁর দল চ্যাম্পিয়ন হন। প্রতিযোগিতায় ছয়টি পুরস্কারের মধ্যে তিনটি জিতে নেয় তাঁর দল। এর পাশাপাশি, নাসা আয়োজিত ইউরোপিয়ান রোভার চ্যালেঞ্জ প্রতিযোগিতায় তানভীন ও তাঁর দল বিশ্বে দশম এবং এশিয়ার মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেন।
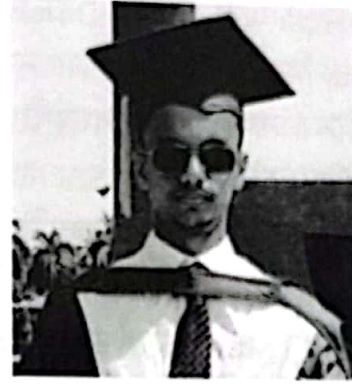
শহীদের নামঃ জাহিদুজ্জামান তানভীন
বয়সঃ ২৫ বছর, ৯ মাস (জন্ম ১৩ অক্টোবর ১৯৯৮)
মৃত্যুর তারিখঃ ১৮ জুলাই ২০২৪
পিতাঃ শামসুজ্জামান
মাতাঃ বিলকিস জামান
ঠিকানাঃ ভিটি ভিশারা, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ স্নাতক, মেকানিক্যাল ইঞ্জিয়ারিং, আইইউটি

তানভীন প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখতেন, দেশের প্রতি ছিল অগাধ ভালোবাসা। তাঁর একাডেমিক যাত্রা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছিল উজ্জ্বল ও বর্ণাঢ্যময়। ২০২২ সালে স্নাতক শেষ করার পর, তিনি বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে

প্রতিষ্ঠা করেন ANTS—যা দেশের প্রথম এবং একমাত্র Unmanned Aerial System কোম্পানি। এই প্রতিষ্ঠানে Chief Technical Officer হিসেবে তিনি অপার সম্ভাবনার স্বাক্ষর রাখতে শুরু করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্রান্ট থেকে অনুদান লাভ এবং বাংলাদেশ আর্মির সঙ্গে ডেমো প্রজেক্টে কাজ করার মাধ্যমে ANTS দেশের প্রযুক্তি খাতের সম্ভাবনাকে আরও উজ্জ্বল করে তোলে।

তানভীন এবং তাঁর দল শুধু প্রযুক্তি উদ্ভাবনেই থেমে থাকেননি; নিজেদের অর্জিত জ্ঞান নিঃস্বার্থভাবে স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছেন। St. Joseph এবং Notre Dame Science Club-এর মতো প্রতিষ্ঠানে UAS System নিয়ে তাঁদের লেকচার নতুন প্রজন্মকে প্রযুক্তির প্রতি উৎসাহী করেছে। তানভীনের দক্ষতা ছিল বহুমুখী। AutoCAD এবং SolidWorks-এ তাঁর পারদর্শিতা তাঁকে CAD Society-এর সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তিনি ছিলেন ইসলামী প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (আইইউটি) Mars Rover Team-এর ডিজাইন ও মেকানিক্যাল বিভাগের প্রধান। নাসা আয়োজিত Mars Rover Challenge-এ আইইউটি দল তাঁর নেতৃত্বে বারবার সফলতা অর্জন করেছে। স্কুল জীবন থেকেই পড়াশুনার পাশাপাশি বিভিন্ন এক্সট্রাকারিকুলার এক্টিভিটির সাথে জড়িত ছিলেন। ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, সাঁতার, মার্শাল আর্ট—সবকিছুতেই ছিল তাঁর গভীর আগ্রহ। খেলাধুলা, মার্শাল আর্ট, বিজ্ঞান মেলায় নিয়মিত অংশগ্রহণ এবং পুরস্কার অর্জন ছিল তাঁর জন্য খুবই সাধারণ ব্যাপার। বুধ্যান মার্শাল আর্টে তিনি ব্রাউন বেল্টও অর্জন করেন।

তানভীনের জীবনের সবচেয়ে সাহসী অধ্যায় ছিল ১৮ জুলাই ২০২৪ সালের ছাত্র আন্দোলনে তার অংশগ্রহণ। সেদিন বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে উত্তরা আজমপুরে ছাত্রদের মিছিলে যোগ দেন তিনি। অপ্রত্যাশিতভাবে উত্তরা টেলিফোন ভবনের সামনে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালাতে থাকে। স্বৈরাচার পুলিশ বাহিনীর আগ্নেয়াস্ত্র থেকে ছোড়া গুলি তানভীনের গলা ভেদ করে বেরিয়ে যায়, আর অসংখ্য ছররা গুলি তার বুকে আঘাত করে। সে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। আন্দোলনরত শিক্ষার্থী সহযোদ্ধারা তাকে দ্রুত রিকশায় তুলে কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে নিয়ে যায়। তবে, তানভীন ঘটনাস্থলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন, পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে পাড়ি জমান পরপারে।

শহীদ তানভীনের শেষ স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তার মা বলেন—'১৮ তারিখ ফজরের নামাজ পড়ে ও সকাল ১১টা পর্যন্ত ঘুমাচ্ছিল। ব্যাংকে কাজ ছিল, তো

আমি ওকে ডাক দিয়ে বলি, 'আব্বু, ব্যাংকের কাজ আছে, যাবি না?' ও সাড়ে ১১টার দিকে উঠে, নাস্তা করল, তারপর ১২টার দিকে বেরিয়ে গেল। আমার ছেলেকে আমি প্রতিদিন দরজায় দাঁড়িয়ে বিদায় দেই। ও যেখানেই যাক না কেন, আমি দরজায় দাঁড়িয়ে 'আসসালামু আলাইকুম' বলে লিফট বন্ধ হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকি। কিন্তু সেদিন আমি আর দাঁড়াইনি। আমি রুমেই বসে ছিলাম। ওই দিন ও ব্যাগ নিয়ে বেরিয়েছিল, সেটাও খেয়াল করিনি।

তানভীনের শেষ স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তাঁর বাবা বলেন—'বৃহস্পতিবার সকালে ছেলের সঙ্গে শেষ কথা হয়েছিল। ফজরের নামাজ পড়তে আমি তাঁকে ডেকে তুলেছিলাম। সে ঘুম থেকে উঠে নামাজ আদায় করেছিল। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ে। সকালে আমি অফিসে চলে যাই, আর তারপরে যে কী হলো, কিছুই জানি না।' যখন গুলিবিদ্ধ তানভীনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন আন্দোলনরত ইমন নামের এক শিক্ষার্থী প্রথমে তানভীনের বাবাকে কল করেন। কিন্তু ওপাশ থেকে ফোনে সাড়া না পেয়ে ইমন দুপুর ১টা ১৪ মিনিটে তানভীনের মা'কে কল করে জানায়, 'আন্টি, কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে তাড়াতাড়ি আসেন। আপনার ছেলের গুলি লেগেছে, রক্ত দিতে হবে।' সেই মুহূর্ত যেন এক বজ্রাঘাতের মতো এসে আঘাত হানে মায়ের হৃদয়ে। ছেলের জীবন বাঁচানোর আকুতি নিয়ে তিনি রিকশায় ছুটতে থাকেন হাসপাতালের দিকে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মমতা যেন এখানেই শেষ হয় না। পথে ছাত্রলীগের কিছু কর্মী এবং পুলিশ তাঁকে হয়রানি করে, রিকশা আটকায়। ছাত্রলীগের কর্মীরা লাঠি দিয়ে তানভীনের মায়ের পায়ে আঘাত করলেও তিনি দমে যাননি। যন্ত্রণাকে উপেক্ষা সন্তানের জন্য রক্ত সংগ্রহ করতে ছুটে যান।

কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালের ইমারজেন্সি রুমে পৌঁছে তিনি দেখেন, তাঁর প্রাণপ্রিয় ছেলের নিথর দেহ পড়ে আছে। শহীদ তানভীনের মা বিলকিস জামান বলেন—'আমি গিয়ে দেখি, আমার ছেলে ইমারজেন্সিতে শুয়ে আছে। আমি জানালা দিয়ে দেখছি আর আমার মনে হচ্ছে, আমার ছেলেকে ধরলে তার আত্মা ফিরে আসবে। আমি জানালা দিয়ে আমার ছেলেকে ধরেছি, কিন্তু তার আত্মা ফিরে আসেনি। পরে কাছে গিয়ে আমার ছেলেকে জড়িয়ে ধরেছি। কিন্তু ততক্ষণে সে চলে গেছে না ফেরার দেশে।' হাসপাতালের প্রাথমিক কার্যক্রম শেষে তানভীনের ডেথ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এরপর তানভীনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং আন্দোলনের সহযোদ্ধারা তাঁকে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে আসা হয় উত্তরা আজমপুরের জামতলার ভাড়া বাসায়। তানভীনের বন্ধু আকাশ বলেন—'গোসল করানোর পরেও তার মাথা থেকে রক্ত পড়া থামছিল না। কাফনের কাপড়টুকুও রক্তে ভিজে যাচ্ছিল।'

তানভীনের বাবা শামসুজ্জামান বলেন—'প্রথমে আমাকে ১টা ১৩ মিনিটে কল করা হয়। আমার অফিসে জোহরের সালাতের জামাত হয় ১টা ১৫ মিনিটে। আমি অফিসের ডেস্কের ড্রয়ারেই ফোন রেখে নামাজে যাই। নামাজ শেষে খাওয়া-দাওয়া করে ফোন হাতে নিয়ে দেখি, তানভীন তিনবার কল করেছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে কলব্যাক করি। কল রিসিভ করে একজন অচেনা ব্যক্তি আমাকে জানায়, তানভীন মারা গেছে। প্রথমে আমি বিশ্বাস করিনি। তবে আমি কোনো কথা বলতে পারছিলাম না। আমার অফিস অনেক দূরে। অফিস ফিরতে বিকেল ৪টা বেজে যায়। বাসায় এসে দেখি, আমার ছেলের নিথর দেহ পড়ে আছে।'

আজমপুরের জামতলা মসজিদে বাদ আসর জানাজা শেষে তাঁর মরদেহ গ্রামের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরের ভিটি ভিশারা গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয় এবং অবশেষে সেখানকার সামাজিক কবরস্থানে রাত ১০টা ১০ মিনিটে তানভীনকে দাফন করা হয়।

তানভীনের স্বপ্নের কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তার বাবা জানান- 'ছেলের স্বপ্ন ছিল ANTS নিয়ে বড় কিছু করা এবং ভবিষ্যতে বিদেশ থেকে উচ্চশিক্ষা নিয়ে দেশে ফিরে দেশের উন্নয়নে কাজ করা।'

তানভীনের বন্ধু ও ANTS-এর সিইও তাউসিফুল ইসলাম তানভীনের মৃত্যুর পর ফেসবুকে এক স্ট্যাটাসে লেখেন—'ড্রোন নিয়ে কাজ করি আজ ৬ বছর ধরে। কোম্পানি চালাচ্ছি প্রায় ৩ বছর ধরে। এই দীর্ঘ সময়ে নিজেদের ছোট একটা অফিস থাকলেও, তানভীনের নিজস্ব কোনো অফিস রুম ছিল না। গত ৬ মাসে আল্লাহর মেহেরবানিতে কোম্পানি বন্ধ হতে হতে বেঁচে যায়। আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন হয়। তাই ১২ জুলাই তানভীনকে এবার নিজের অফিস রুম বুঝিয়ে দিলাম। নতুন চেয়ার-টেবিল কিনে আনলাম ৩ জন একসাথে— আমি, দেওয়ান আর তানভীন। ১৭ জুলাই রাত ১০টা পর্যন্ত মিটিং করলাম আগামী ৬ মাসের প্ল্যান নিয়ে। সিদ্ধান্ত হলো, পরের দিন (১৮ তারিখ) থেকে ও নিজের অফিস রুমে

বসা শুরু করবে। তা আর হলো না। বসতে পারল না তানভীন ওর চেয়ারে। ১৮ তারিখ ঘাতকের গুলিতে আমার বন্ধু আমাদের ছেড়ে বহু দূরে চলে গেছে। কীভাবে কী করব বুঝতে পারছিলাম না এতদিন। কিন্তু পরশুদিন আন্টির (তানভীনের মা) সাথে দেখা করার পর এখন পরিষ্কার। 'বাবা, আমার ছেলে কঠোর পরিশ্রম করেছে এই প্রজেক্টের জন্য। অ্যান্টস যেন বন্ধ না হয়। তানভীন এটা দিয়েই বেঁচে থাকবে।' আমরা আছি। এখনও স্বপ্ন দেখি এই দেশ নিয়ে। এখনও কিছু একটা করতে চাই দেশের জন্য। এই ৬ বছর আপনারাই এত দূর এনেছেন। ভবিষ্যতেও আমাদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান করছি।'

পিতামাতার ভাষ্য অনুযায়ী, তানভীনের দিন শুরু হতো ফজরের নামাজ দিয়ে, যা ছিল তার জীবনের শৃঙ্খলার মূল ভিত্তি। তিনি বিশ্বাস করতেন, ধর্ম মানে শুধু আনুষ্ঠানিক আচার নয়, বরং মানুষের প্রতি ভালোবাসা, সৎ জীবনযাপন এবং ন্যায়ের পথে চলার প্রতিজ্ঞা। তার মা স্মৃতিচারণ করে বলেন—'আমার ছেলে নামাজ কখনো মিস দিতো না। সে ছোটবেলা থেকেই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করত এবং রোজা রাখত। সবকিছুর আগে তার দ্বীন ছিল ফার্স্ট প্রায়োরিটি লিস্টে। অবসরে সে কুরআন এবং হাদিস পড়ত।' জাহিদুজ্জামান তানভীন কতটা ইসলামিক মূল্যবোধ লালন করতেন তা তার জীবনের শেষ ফেসবুক পোষ্ট (মৃত্যুর আগের রাতে) থেকে কিছুটা অনুমান করা যায়।
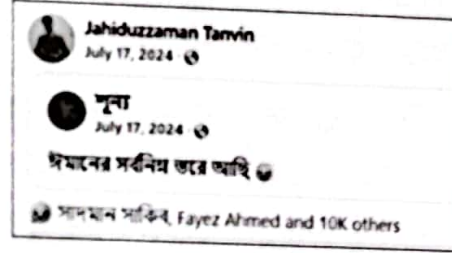
ভিডিও: তানভিনের গলায় গুলি লাগার পরমুহূর্ত এবং তার লাশ জড়িয়ে ধরে মায়ের আহাজারি।

তথ্যসূত্র:

বাবা এবং মায়ের সাক্ষাৎকার

তথ্য সংগ্রহে:

মোঃ নাহিদ হাসান সজীব, মোঃ কামরুজ্জামান; স্টোরি মেকিং: মোঃ নাহিদ হাসান সজীব এবং ড. মোহাম্মাদ সরোয়ার হোসেন

ট্যাঙ্ক থেকে ছুঁড়ে ফেলা সেই ছেলেটি

শহীদের নাম : শাইখ আশ-হাবুল ইয়ামিন

বয়স : ২২ বছর ৭ মাস (জন্ম, ১২ ডিসেম্বর ২০০১)

মৃত্যুর তারিখ : ১৮ জুলাই, ২০২৪

পিতা : মো. মহিউদ্দিন

মাতা : নাসরিন সুলতানা

ঠিকানা : সাভার, ঢাকা

শিক্ষাগত যোগ্যতা : কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (চতুর্থ বর্ষ), এমআইএসটি, ঢাকা

১৮ জুলাই ২০২৪-এর উত্তাল দুপুর। সাভারের মসজিদগুলোর মিনার থেকে থেমে থেমে আজানের সুর বাতাসে ভেসে আসলেও, সেই সুর যেন চাপা পড়ে যাচ্ছে পুলিশের মুহুর্মুহু গুলি এবং টিয়ারশেল নিক্ষেপের বিকট শব্দে। চারপাশে চলছে এক শ্বাসরুদ্ধকর, অসম লড়াই। সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশের সাজোয়া যানের (এপিসি) দিকে এগিয়ে আসে এক সাহসী তরুণ।

কিন্তু এপিসির ঢাকনা বন্ধ করার প্রচেষ্টাই কাল হয়ে দাঁড়ায় সেই তরুণের জন্য। এপিসির ওপর ওঠার পর পুলিশ গুলি চালালে, সে এপিসির ওপরেই ভারসাম্য হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে।

গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকা ওই তরুণকে এপিসি থেকে টেনে-হিঁচড়ে নিচে ফেলে দেয় দুই পুলিশ সদস্য। তিনি সড়কের ওপরে ঠিক সাঁজোয়া যানের চাকার কাছাকাছি পড়ে যান। এসময় পুলিশের এক সদস্য এপিসি থেকে নেমে তার একটি হাত ধরে টেনে, আরেকটু দূরে সড়কের ওপর রেখে আসে। তখনো বেঁচে ছিলেন তিনি। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। কিছুক্ষণ পর, কয়েকজন পুলিশ সদস্য মিলে তাকে চ্যাংদোলা করে রোড ডিভাইডারের এক পাশ থেকে অন্য পাশে ছুঁড়ে ফেলে।

শাইখ আশ-হাবুল ইয়ামিন, কেবল একটি নাম নয়, বরং জালিমের বিরুদ্ধে মাজলুমের অনুপ্রেরণার প্রতিচ্ছবি। ছোটবেলা থেকেই ইয়ামিন সংগ্রামী ও আত্মপ্রত্যয়ী, অগাধ স্বপ্ন আর দৃঢ় বিশ্বাসে যার হৃদয় ছিল পরিপূর্ণ। বৈষম্যের বিরুদ্ধে কখনোই ইয়ামিনের চুপ থাকার মানসিকতা ছিল না, বরং সে ছিল বরাবরই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার। এসএসসি-এইচএসসিতে দারুণ ফলাফল, বুয়েট এবং রংপুর মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও, ইয়ামিন MIST (Military Institute of Science and Technology)-তে পড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ, সে রাজনীতির বাইরে থেকে, নিজের জায়গা থেকে দেশকে বদলাতে চেয়েছিল।

১৬ জুলাই রাতে ইউজিসি (বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন) এক নির্দেশে দেশের সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে। দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এই সিদ্ধান্তের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। তারা কোনোভাবেই হল ছাড়তে সম্মত ছিল না। রাতে MIST-এর আবাসিক হলে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, DGFI হলে তল্লাশি চালাতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকাল ৮-টার মধ্যে হল ছাড়তে হবে। হঠাৎ এই সিদ্ধান্তে ছাত্রদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয়। ঐ সময় শাইখ আশ-হাবুল ইয়ামিন অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের বিপক্ষে অবস্থান নেয়।

ইয়ামিন MIST এর ওসমানী হলের ৬১৯ নম্বর রুমে থাকত। তার রুমমেট মো নিয়ামুল হক বাছিত (MIST, ইইসিই-১৯) ১৬ জুলাই রাত এবং পরের দিন সকালে MIST এর আবাসিক হলের ঘটনাপ্রবাহ স্মৃতিচারণ করে বলেন, ১৬ তারিখ MIST-এর এক কলঙ্কিত এবং ভয়াবহ দিন। সারাদিন ভার্সিটির কর্তৃপক্ষের সাথে আমাদের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার দাবী নিয়ে নানা উত্তাল কথোপকথন চলতে থাকে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে রাত দশটার দিকে আমাদের ওসমানী হলে DSW (Directorate of Student Welfare) স্যার, হল-প্রভোস্ট স্যারের সাথে আমাদের ছাত্র প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক চলে।

ইয়ামিন-সহ আমরা হলের সকল ছাত্ররা অধীর আগ্রহের সাথে আলোচনার ফলাফলের অপেক্ষায় থাকি। তারই মধ্যে আমাদের মাঝে খবর ছড়িয়ে পরতে থাকে যে, DGFI হলের বাহিরে ঘুরাঘুরি করছে। রাত একটার দিকে খবর আসে, সকল স্যার হল ত্যাগ করেছেন। এবং দেড়টার দিকে আমাদের গ্রুপে নোটিশ আসে সকাল আটটার পূর্বেই হল ত্যাগ করতে হবে। এতে সকলে ক্ষিপ্ত হয়ে নিচে নেমে আসে এবং অধিক চিল্লাচিল্লির পরিপ্রেক্ষিতে রাত দুইটার কিছু পরে DSW স্যারেরা আবার হলে উপস্থিত হন। এবং আমাদের আমাদের সাথে কথা বলার জন্য রাজি হন।

আমরা সকলে একসাথে কথা বলতে চাইলেও স্যারদের বিচক্ষণতায় হার মেনে চারজন করে স্যারের সাথে কথা বলতে যেতে হয়। আমি দ্বিতীয় গ্রুপে স্যারের সাথে কথা বলার জন্য যাই। আমাদের কথার সারমর্ম ছিল, আমাদের হল ত্যাগের সময় সকাল দশটা পর্যন্ত বর্ধিত করা হোক এবং সকল বিভাগীয় শহর পর্যন্ত সকল ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাসের ব্যবস্থা করা হোক। কিন্তু দীর্ঘ দুই ঘণ্টা আলোচনার পরও আমাদেরকে সকাল আটটায় গুলিস্থান এবং সায়দাবাদ পর্যন্ত বাস সরবরাহ করা হয়।

এ খবরে আমরা একদমই খুশি ছিলাম না। আমাদের মিটিং-এর এ ফলাফল আমি রুমে এসে ইয়ামিন-সহ আমার দুই রুমমেটকে বলার পর তারাও স্যারকে রাজি করার জন্য স্যারদের সাথে কথা বলতে যায়। সেখানে ইয়ামিন এ বিষয়ে স্যারকে মানানোর যথেষ্ট চেষ্টা করার পরও বিফল হয়। সকাল পাঁচটার দিকে ইয়ামিন ও আমার রুমমেটরা রুমে ফিরে আসে এবং আমরা নামাজ পড়ে ব্যাগ গুছাতে থাকি। সকাল সাড়ে পাঁচটার দিকে আমরা হল ত্যাগ করি।

আমার এখনও ইয়ামিনের ব্যাগ ঘাড়ে করে সেদিন দাড়িয়ে থাকা মুখটার কথা বারবার মনে পড়ে। সেদিনই তার সাথে শেষ দেখা হবে আমি কখনো কল্পনাও করিনি। বাসায় পৌঁছানোর পর আমরা একে অপরের খোঁজখবর নিয়ে নিশ্চিন্ত হই। রাতে রেস্ট নিয়ে পরের দিন সকালে দেশের কোথায় কী হচ্ছে, খোঁজখবর নিই এবং আমাদের রুম ৬১৯-এর মেসেঞ্জার গ্রুপে একে অপরকে সব খবর জানিয়ে সচেতন করতে থাকি।

দুপুর দুইটার কিছু পরে আমার রুমমেট মো শাহিনুর রহমান চৌধুরী আমাকে কল দেয় এবং বলে যে, ইয়ামিনের বাসা থেকে তাকে কল দিচ্ছে; ইয়ামিন নাকি বাসা থেকে বের হয়ে গিয়েছে এবং তাকে ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি তাকে বলি যে, ইয়ামিনের কিছু হবে না এবং ইয়ামিনের মতো শান্তশিষ্ট ছেলেকে কেউ কিছু করবে না। আমার রুমমেট ফোন কেটে গোসলে যায়। তার মধ্যেই আমি ফেসবুকে একটা পোস্টে লেখা দেখি MIST - ১। যারা সেদিনের বিষয়ে জানে, তারা বুঝবেন, এই MIST -১ এর অর্থ কী (এর অর্থ- MIST এর একজন শহীদ হয়েছে)। যদিও তখনও জানতাম না MIST-এর কে শহীদ হয়েছেন। তো আমি ফেসবুকে এবং আমাদের বিভিন্ন মেসেঞ্জার গ্রুপে খোঁজ নিতে শুরু করি MIST-এর কে শহীদ হয়েছে।

অল্পসময় পরই আমার সামনে একটা ভিডিও এবং ছবি আসে। ইয়ামিনের শরীরে তেমন দাগ ছিল না। আমি প্রথমে দেখে চিনতেই পারিনি বুকে এমন দাগ হয়ে থাকা ছেলেটা কে। বারবার দেখার পর যখন সন্দেহ হতে থাকল, আমি আরো খুজতে

থাকলাম এবং আমাদের ভার্সিটির রক্তেরাঙা আইডি কার্ডে CSE-২১ দেখে বুঝতে পারি, সে আর কেউ নয়, আমারই রুমমেট, আমারই ভাই শহীদ ইয়ামিন। আমি আমার রুমমেটকে কল করি এবং বলি 'ভাই, ভাই আমি ফেসবুকে একটা ছবি দেখলাম, আমি চিনতে পারছি না, আমি বুঝতেছি না তুই একটু দেখ। আমার মনে হচ্ছে এটা ইয়ামিন।' এর পর আর কিছু বলতে পারিনি আমি।

১৭ তারিখ সকালে হল ছাড়ার পর বাসার দিকে রওনা দিলেও ইয়ামিনের মনে তখন একটাই চিন্তা—তার বন্ধুরা কী করবে? যাদের বাসা অনেক দূরে, তারা এই নাজুক পরিস্থিতির মাঝে বাড়ি ফিরবে কীভাবে? এ বিপর্যয়ের মাঝে তাদের নিরাপত্তার কী হবে? সারা দেশে যেসব নিরপরাধ মানুষ আহত হচ্ছে, তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা কীভাবে হবে? মনে তার তীব্র উৎকণ্ঠা, অনিশ্চয়তা আর হতাশার স্রোত বয়ে যাচ্ছিল। ওই দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে শাইখ আশ-হাবুল ইয়ামিনের বাবা মো. মহিউদ্দিন বলেন,

১৭ তারিখ বুধবার সকাল সাড়ে নয়টায় বাসায় ফিরে ইয়ামিন তার আম্মুকে বলে, 'আমার কিছু বন্ধু বাড়ি যেতে পারেনি। ওদের বাড়ি দূরে দূরে। নানুর বাসা ফাঁকা আছে। আব্বুকে জিজ্ঞাসা করো, ওখানে তাদের রাখা যাবে কি না?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, রাখা যাবে।' তবে তার বন্ধুরা আর আসেনি। দিনটি সে বাসায় কাটায়, শুধু নামাজের জন্য বাহিরে যায়।

বুধবার দিবাগত রাত ৩টার সময় যখন আমি সেহেরি খাওয়ার জন্য উঠি, তখন দেখি তার ল্যাপটপ অন করা। 'কী ব্যাপার, তুমি ঘুমাওনি?', ও উত্তরে জানায়, 'দিনের বেলা অনেক ঘুমাইছি, আর কিছু কাজ ছিল। আর বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি। আমি রোজা থাকব এবং ফজরের নামাজ পড়ে ঘুমাব।' আমি তখন নিষেধ করলাম, 'তুমি তো গতকাল রোজা রাখনি। আল্লাহর রাসুলের হাদিস আছে যে, আশুরার দুইটা রোজা রাখতে হয়। তোমার আজকে রোজা থাকার দরকার নাই। তখন সে বলল, 'আচ্ছা, ঠিক আছে।' পরে আমরা একসঙ্গে ফজরের নামাজ পড়তে মসজিদে গেলাম। নামাজ পড়ে বাসায় এসে ইয়ামিন ঘুমিয়ে পড়ল।

১৮ তারিখ, সকাল ১০:৩০ মিনিটের দিকে বাহিরে বের হওয়ার সময় ছেলে জিজ্ঞেস করে, 'আব্বু, মিরপুরে তোমার কোনো পরিচিত হাসপাতাল আছে কি না? আমার কয়েকজন বন্ধু আহত হয়েছে, কিন্তু পরিচিত ছাড়া ভর্তি করছে না।' মিরপুরে আমার পরিচিত না থাকলেও টেকনিক্যাল হাসপাতালের কথা বলি। তখন ও একটু রাগ করে বলল, 'আমি তোমাকে মিরপুরের হাসপাতালের কথা জিজ্ঞেস করলাম,

তুমি টেকনিক্যাল দেখাও! যাও, তুমি তোমার কাজে যাও। আমরা দেখছি কী করতে পারি।' এটাই ছিল ওর সাথে আমার শেষ কথা। তারপর সাড়ে বারোটায় বাসায় ফিরে দেখলাম, সে চুপচাপ বসে আছে। তাকে কিছু বললে সাড়া দেয় না। মনে হলো, আমি তার বন্ধুদের জন্য সাহায্য করতে না পারায় সে অভিমান করেছে।

তারুণ্যের দুঃসাহস

ইয়ামিন তখনো জানত না, এই দিনটি তার জীবনবৃক্ষের শেষ পাতা হয়ে থাকবে। মসজিদে জামাতের সাথে জোহরের নামাজ আদায়ের পর ইয়ামিন জানতে পারে যে, পুলিশের গুলিতে তার একজন বন্ধু চোখে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। ইয়ামিন তাৎক্ষণিক বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ে। মনে তার একটাই চিন্তা, বন্ধুদের খোঁজ নিতে হবে। যারা আহত হয়েছে, তাদের সাহায্য করতে হবে। কিন্তু ইয়ামিনের এই যাত্রা যে ছিল না-ফেরার গন্তব্য পানে, তা কে-ই-বা জানত?

ঢাকার সাভারের পাকিজা মডেল মসজিদের কাছে পরিস্থিতি তখন ভয়াবহ। পুলিশের সাঁজোয়া যান (এপিসি) থেকে ক্রমাগত গুলি আর টিয়ার গ্যাসে আচ্ছন্ন পুরো এলাকা। শিক্ষার্থীরা পাল্টা ইট-পাটকেল ছুঁড়ছে, কিন্তু পুলিশের গুলির সামনে দাঁড়ানোর মতো অবস্থা নেই। ঠিক সেই মুহূর্তে ইয়ামিন সামনে এগিয়ে যান। এসময় তিনি অত্যন্ত দুঃসাহসী ভূমিকা পালন করেন, যদিও পুলিশ তখনও নির্বিচারে আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর গুলি চালিয়ে যাচ্ছে।

আহত বন্ধুকে দেখার পর ইয়ামিন পাকিজা মডেল মসজিদের সামনে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সাথে প্রতিরোধের সম্মুখ সারিতে অংশগ্রহণ করেন। ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশের নির্বিচার গুলি বন্ধ করার লক্ষ্যে অসীম সাহসী এ বীর পেছন দিক দিয়ে এপিসির ছাদে উঠে যান। তার উদ্দেশ্য ছিল এপিসির ঢাকনা বন্ধ করা, যাতে এপিসি থেকে নির্বিচারে গুলি চালানো বন্ধ হয়।

ইয়ামিনের এই দুঃসাহসিক ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছেন জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী সংস্থা শপিং কমপ্লেক্স মসজিদ, সাভার, ঢাকা-এর ইমাম ও খতিব মুফতি সুলতান মাহমুদ। তিনি ঘটনাটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

১৮ জুলাই, বৃহস্পতিবার। আমি আমার কর্মস্থল থেকে জোহরের আগে ফিরছিলাম। দেখি, পুরো সাভার বাসস্ট্যান্ড ছাত্রদের দখলে। এর মাঝেই কয়েকবার ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, পুলিশের গুলি, টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ, আর ছাত্রদের ইটের আঘাতে পুলিশের পিছু হটে পাকিজা মোড়ে আশ্রয় নেওয়া—সব মিলিয়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতি। স্ট্যান্ডে বেশিরভাগই স্কুল-কলেজের ছোট ছাত্র। তাদের তেজ আর সাহস দেখে অভিভূত হয়ে গেলাম। ওভারব্রিজের অংশ দিয়ে রাস্তা ব্যারিকেড দিয়ে ফেলেছে। পুলিশ বক্স ভেঙে রাস্তার ওপর রেখে দিয়েছে।

জোহরের নামাজের সময় হয়ে যাওয়ায় আমি নামাজ পড়তে চলে গেলাম। নামাজের পর জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী সংস্থা শপিং কমপ্লেক্সের তিন তলার ছাদে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি দেখতে লাগলাম। দুপুর দুইটার দিকে পুলিশ আরও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠল। যেন যুদ্ধাবস্থা। মুহুর্মুহু টিয়ারগ্যাস, গুলি চালাতে শুরু করল। ছাত্ররা ইট নিক্ষেপ করে পুলিশকে পিছু হটতে বাধ্য করল। এরপর একটি সাঁজোয়া যান(এপিসি) এসে গুলি আর টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ শুরু করল। যেই গাড়িটি সামনে এগিয়ে আসে, ছাত্ররা সঙ্গে সঙ্গে বাজার রোড আর রাজাশন রোডে সরে যায়। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আবার হৈচৈ করতে করতে সামনে এগিয়ে আসে। আমি বিস্ময়ে দেখছিলাম বাচ্চাগুলোর সাহস।

এপিসিটি তখন ওভারব্রিজ আর বাজার রোডের মুখের মাঝখানে। হঠাৎ দেখি, পাশের কালো জামা পরা সুন্দর মায়াবী চেহারার একটি ছেলে ওভারব্রিজের নিচ দিয়ে এপিসির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সাভারের রোডে ডিভাইডার দেয়া। ছেলেটি ডিভাইডারের একপাশে। আমি মনে করলাম, আরেহ! বোকা ছেলে! এই গোলাগুলির মধ্যে কেউ রাস্তা পার হয় নাকি? আমার ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে ছেলেটি রাস্তা পার হলো না। বরং ডিভাইডার টপকে ঠিক এপিসির পেছনে দাঁড়াল। তখন কিছুটা আন্দাজ করলাম, কিন্তু পুরোটা বুঝতে পারলাম না। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখছিলাম। ভদ্র, শান্ত চেহারার এই ছেলেটি কী করতে যাচ্ছে?

হায়! হায়! ইয়ামিন (ছেলেটির নাম পরে জানি) দু-বার লাফ দেওয়ার প্রস্তুতি নিল। তারপর তৃতীয়বারে সে লাফ দিয়ে সোজা এপিসির ওপর উঠে গেল। এপিসির ভেতর থেকে একজন পুলিশের মাথা বের করা। ঐ পুলিশ সামনের দিকে দেখতেছিল, পেছনের দিকে দেখতেছিল না। ইয়ামিন এসে পেছন থেকে পুলিশটিকে

ধরতে চাইল, এপিসির ঢাকনা বন্ধ করে দিতে চাইল। বিষয়টি বুঝতে পেরে দ্রুত এপিসি পেছনের দিকে চালাতে শুরু করল। এরপর আমি আর কিছু দেখতে পেলাম না। জানতেও পারলাম না ইয়ামিনের শেষ পরিণতি।

এই দৃশ্য দেখে আমার ফিলিস্তিনের কথা মনে পড়ল। ফিলিস্তিনের যুবকরা এভাবেই ট্যাঙ্কের ওপর উঠে যায়। পরে বন্ধুদের বললাম, 'আজ চমৎকার একটি দৃশ্য দেখলাম। কী সাহসী প্রজন্ম! শান্ত ছেলেগুলোও কীভাবে অদম্য সাহসী হয়ে উঠেছে। একটি ছেলে এপিসির ওপর উঠে গেছে!'

দুদিন পর ফেসবুকে একটি ভিডিও দেখলাম। এপিসির ওপর ইয়ামিনের নিথর দেহ। পুলিশ টেনে হিঁচড়ে ফেলছে। আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'এই তো সেই ছেলে! মেরে ফেলল ছেলেটাকে?' আমি একদম ভেঙে পড়ি। এত সুন্দর, নম্র-ভদ্র একটা ছেলে। এপিসির ওপর উঠছে তো, কী হয়েছে? ওকে গুলি করতে হবে কেন? ও তো নিরস্ত্র ছিল। আমার চোখ ভিজে গেল। যদি কাউকে বীরশ্রেষ্ঠ উপাধি দিতে হয়, তবে আমি বলব, বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ইয়ামিন।

ইয়ামিন দুঃসাহসিকতার সাথে এপিসির ওপর উঠে গেলে পুলিশ তাকে গুলি করে গুরুতর আহত করে। কিছুক্ষণ পর, এপিসির ভেতর থেকে এক পুলিশ বের হয়ে 'পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে' তার বুকের মধ্যে সরাসরি গুলি করে। গুলিতে তার বুক ঝাঁঝরা/ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। পুলিশ আন্দোলনকারীদের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করতে ছটফট করতে থাকা গুলিবিদ্ধ ইয়ামিনকে এপিসির ওপর রেখেই সেটি চালাতে থাকে। এর কিছুক্ষণ পর এপিসি থেকে জড়বস্তুর মতো করে তাকে রাস্তায় ফেলে দেয়। সাঁজোয়া যান থেকে সড়কে পড়তেই দুই হাত দুই দিকে, আর পা দুটি ভাঁজ হয়ে যায়। এতে একটি পা আটকে যায় এপিসির বাম দিকের পেছনের চাকার গায়ে। তখনো তিনি বহুকষ্টে নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন।

মৃতপ্রায় ইয়ামিনকে কয়েকজন পুলিশ মিলে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে চ্যাংদোলা করে ডিভাইডারের এক পাশ থেকে অন্য পাশে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। মুমূর্ষু অবস্থায় ইয়ামিনকে চাইনিজ রাইফেল দিয়ে গুলি করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এরপর অত্যন্ত নির্মমভাবে তার বুকের ওপর টিয়ার শেল নিক্ষেপ করা হয়। পরবর্তীতে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ সেখান থেকে পালিয়ে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে দায়িত্বশীল চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।

ছবি: শাইখ আশ-হাবুল ইয়ানমিনের মরদেহ

বীর শহীদের শেষ বিদায়

বাবার কাঁধে ছেলের লাশ, দুনিয়ায় এই ভার বহন করার সাধ্য আছে কার? ছেলে হারানোর বেদনায় শোকার্ত বাবা মো. মহিউদ্দিন চেয়েছিলেন, ইয়ামিনকে তার দাদা-দাদীর কবরের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত করতে। কিন্তু কুষ্টিয়ার পুলিশ তাতে বাধা দেয় এবং কঠোরভাবে জানিয়ে দেয় যে, তাদের অনুমতি ছাড়া লাশ দাফন করা যাবে না। এরপর ইয়ামিনকে সাভারে নানা-নানীর কবরের পাশে দাফন করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সেখানেও পুলিশ হুঁশিয়ারি দিয়ে জানায়, পোস্টমর্টেম ছাড়া কোনো লাশ দাফন করা যাবে না। তবে ইয়ামিনের মাজলুম বাবা, ছেলে হারানোর শোকে যিনি ইতোমধ্যেই মুহ্যমান, তিনি যে প্রিয় সন্তানের কাটাছেঁড়া লাশ সহ্য করতে পারবেন না, তা ছিল সুস্পষ্ট। অবশেষে ব্যাংকার সোসাইটির কবরস্থানে মাগরিবের পর ইয়ামিনকে দাফন করা হয়। 'পুলিশের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে আমার ছেলের বুক। সে শহীদ হয়েছে। তাই তাকে গোসল করানো হয়নি। সেভাবেই জানাজা পড়ে দাফন করেছি।'— শাইখ আশ-হাবুল ইয়ামিনের বাবা মো. মহিউদ্দিন।

সংক্ষিপ্ত জীবনে ইয়ামিনের যত অর্জন

শহীদ ইয়ামিনের জন্ম ২০০১ সালের ১২ ডিসেম্বর ঢাকার পিজি হাসপাতালে। পৈতৃক নিবাস কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার কয়া ইউনিয়নের সুলতানপুর গ্রামে। ইয়ামিনের পরিবারে আছেন তার বাবা মো. মহিউদ্দিন, মা নাসরিন সুলতানা এবং একমাত্র বোন। তিনি সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে

২০১৮ সালে এসএসসি এবং ২০২০ সালে এইচএসসি উভয় পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হন। বাংলাদেশ কেমিস্ট্রি ও গণিত অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করে ইয়ামিন বরাবরের মতোই সাফল্যের সাক্ষর রাখেন। এসএসসি-এইচএসসিতে ভালো ফলাফলের পর ২০২১ সালে বুয়েট এবং রংপুর মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পাওয়ার পরও, তিনি MIST তে পড়ার সিদ্ধান্ত নেন। ২০১৯ সালের ০৭ অক্টোবর বুয়েটের মেধাবী শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হওয়ায় এবং রাজনীতি থেকে দূরে থাকার ইচ্ছায় তিনি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ইয়ামিন ছিলেন রাজধানীর মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (MIST) কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী। তিনি এমআইএসটি ডিবেটিং ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সিএসসি বিভাগের ডিবেট ক্যাপ্টেন ছিলেন। কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ে ছিল তার অসাধারণ দক্ষতা। ২০২২ সালে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে এমআইএসটি কম্পিউটার ক্লাব কর্তৃক আয়োজিত কম্পিউটার প্রোগ্রামিং কনটেস্টে তার দল দ্বিতীয় রানার-আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এছাড়া ইয়ামিন এমআইএসটি কম্পিউটার ক্লাব এবং সাইবার সিকিউরিটি ক্লাবের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। সহপাঠীদের ভাষ্যমতে, ইয়ামিন ছিল একজন নিঃস্বার্থ এবং সাহসী তরুণ, যে বরাবরই ন্যায়ের পক্ষে সত্যের বিজয়ের জন্য সচেষ্ট থাকত, সবসময় বন্ধু-বান্ধবের বিপদে সাহায্য করতে ছিল তৎপর এবং অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে তার অবস্থান ছিল সুদৃঢ়। স্বভাবগতভাবে কিছুটা অন্তর্মুখী হলেও, সত্য ও বাস্তবতা প্রকাশে ইয়ামিন কখনও পিছপা হতো না।

Shykh Aashhabul Yamin
July 18

আমি মিলিটারি ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (MIST)-তে অধ্যয়নরত একজন শিক্ষার্থী। চলমান কোটা সংস্কার আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য যদি আমাদের প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষার্থীকে কর্তৃপক্ষ কোনভাবে হেনস্তা করে, হুমকি দেয় বা বহিষ্কার করে দেয়, সেক্ষেত্রে আমরা সম্মিলিতভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য সকল প্রকারের একাডেমিক কার্যক্রম বর্জন করার ঘোষণা দিব। ইতিমধ্যে আমাদের হলে অবস্থানরত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ১৭ জুলাই দিবাগত রাতে অন্যায়ভাবে হল থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য করেছিল কর্তৃপক্ষ, যা আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বিশাল বড় নিরাপত্তা ঝুঁকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একইসঙ্গে আমরা এখন থেকে এমআইএসটি-তে সংঘটিত সকল ধরনের অনুষ্ঠান, ক্লাব কার্যক্রম, খেলাধুলা ইত্যাদি সকল কিছু থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

Shykh Aash-Ha-Bul Yamin
লেভেল- ৪
গণনাযন্ত্র বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ
MIST

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, বিশেষত ফেসবুকে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক ইস্যুতে নিজের মতামত প্রকাশ করত ইয়ামিন। বাংলাদেশের ওপর ভারতীয় আধিপত্যবাদ, বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ভারতের রেল ট্রানজিট, এবং গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যার বিরুদ্ধে ইয়ামিন বরাবরই ছিল সরব। ফিলিস্তিনের

মাজলুম মুসলমানদের দুঃখ-কষ্টে ব্যথিত হয়ে ইসরায়েলি পণ্য বর্জনের পক্ষেও প্রচারণা চালিয়েছে বিভিন্ন সময়ে। বিশেষ করে, ১৫ জুলাইয়ের পর থেকে শাহাদাতের পূর্ব পর্যন্ত কোটা আন্দোলনের পক্ষে ইয়ামিন জোর প্রচারণা চালায় এবং শেখ হাসিনা সরকারের নির্মম হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। ইয়ামিনের বক্তব্য ও অবস্থান ছিল সত্য, ন্যায় এবং গণমানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে।

বন্ধু এবং পরিবারের ভাষ্যমতে ইয়ামিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত গুরুত্বের সাথে আদায় করত। বন্ধুদেরও নিয়মিত সালাতের জন্য দাওয়াত দিত এবং ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরত। শহীদ হওয়ার আগ মুহূর্তেও ইয়ামিন মসজিদে জামাতের সাথে জোহরের সালাত আদায় করে। ইয়ামিন পারিবারিকভাবে ইসলামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের শিক্ষা লাভ করেছিল, তার পরিবার যেন বাংলাদেশের ধর্মভীরু মুসলিম পরিবারের এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি। MIST এর ওসমানী হলের ৬১৯ নম্বর রুমে আর ফিরবেন না শহীদ আশ-হাবুল ইয়ামিন; তবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার অসীম সাহসিকতা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সাহসিকতা ও অনুপ্রেরণার বাতিঘর হয়ে থাকবে।

ভিডিও: গুলিবিদ্ধ ইয়ামিনকে ট্যাঙ্ক থেকে নির্মমভাবে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়।

তথ্যসূত্র

১. ইয়ামিনের বাবার সাক্ষাৎকার

২. ইয়ামিনের ভার্সিটির হলের রুমমেট এবং বন্ধু মো. নিয়ামুল হক বাছিত-এর সাক্ষাৎকার

৩. প্রত্যক্ষদর্শী - মুফতি সুলতান মাহমুদ এর সাক্ষাৎকার

৪. ভিডিও- ট্যাঙ্ক এর ওপর ইয়ামিনকে গুলি করা এবং ট্যাংক থেকে তাকে ফেলে দেয়ার ভিডিও

তথ্য সংগ্রহে:

মোঃ কামরুজ্জামান;

স্টোরি মেকিং: মোঃ কামরুজ্জামান এবং ড.মোহাম্মাদ সরোয়ার হোসেন

ভাইকে নিয়ে বাসায় ফেরা হলো না

যুবকটি পেশায় ছিলেন ডাক্তার। ১৮ জুলাই সকালে নরসিংদীর বাসা থেকে বের হয়েছিল ঢাকার উত্তরার ৩ নম্বর সেক্টরে ছোট ভাই আবদুল্লাহকে মাদরাসা থেকে বাসায় নিয়ে আসার জন্য। বাসা থেকে বের হওয়ার সময় মায়ের কপালে চুমু দিয়ে বাসা থেকে বের হন। ডা. সজিব সরকার ছোট ভাইয়ের মাদরাসায় না গিয়ে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে ছাত্রদের সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করে যোগ দেন উত্তরার আজমপুরে। একপর্যায়ে শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে পুলিশ গুলি চালালে, সেই গুলি এসে লাগে সজিবের বুকে। বুলেটের আঘাতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। আন্দোলনে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা তাকে মেডিকেলে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

শহীদের নাম: ডা. সজিব সরকার
বয়স: ৩১ বছর (১২ অক্টোবর ১৯৯৩)
মৃত্যুর তারিখ: ১৮ জুলাই ২০২৪
পিতা: মো হালিম সরকার
মাতা: ঝর্না বেগম
ঠিকানা: মাঝিরকান্দি, রায়পুরা, নরসিংদী
পেশা: প্রভাষক, (মেডিসিন) ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজে, ঢাকা মেডিকেল কলেজ

উত্তরার আজমপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী এবং সজিব সরকারের সঙ্গে একই জায়গায় গুলিবিদ্ধ হওয়া জুলাইয়ের আহত যোদ্ধা মাহফুজ আব্দুল্লাহ সেই সময়ে ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন—'আমি তখন উত্তরায় নেতৃত্ব দিচ্ছিলাম। শেষ বিকেলে আমরা মাঠে থাকব কিনা এবং পরিস্থিতি কেমন, তা বোঝার জন্য আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্কয়ার বিল্ডিংয়ের পেছনে একটি মিটিং করি। মিটিং শেষে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য আমি আজমপুর ফুটওভার ব্রিজের নিচে যাই।

সেখানেই খেয়াল করলাম, ডাক্তার সজিব সরকার আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন। এর আগেও ওই এরিয়ায় গেলে তাকে সেখানে দেখতে পেয়েছি। আমার সঙ্গে শাহীন নামে আর একজন আন্দোলন নেতৃত্বদানকারী ছিলেন। আমরা কী করব, তা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। হঠাৎ দেখি, উত্তরার পূর্ব থানা থেকে কিছু পুলিশ সদস্য অস্ত্রসহ নিয়ে বের হচ্ছে। আমি সবাইকে সতর্ক করে বললাম, 'চলো, দ্রুত চলে যাই, ওরা গুলি চালাবে।' এরপর আমরা দৌড়ে পালিয়ে যাই। এ সময় একটি সাউন্ড গ্রেনেড এসে আমার ডান পায়ের সামনে পড়ে, আর কয়েকটি গুলি এসে আমার মাথার পেছনে লাগে। সাইট থেকে ছোড়া গুলি নাক ও চোখের ওপর দিয়ে ভ্রু কেটে বেরিয়ে যায়। এ ঘটনায় আমরা মোট তিনজন গুলিবিদ্ধ হই, তাদের একজন ছিলেন ডাক্তার সজিব সরকার। পরে তাকে রিকশায় করে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা মেডিকেলে নিয়ে যায়।'

ডা. সজিব সরকার নরসিংদীর বাসা থেকে ঢাকায় যান তার ছোট ভাই আব্দুল্লাহকে উত্তরা তিন নাম্বার সেক্টরের আশরাফুল উলুম মাদরাসা থেকে বাসায় নিয়ে আসার জন্য প্রতি সপ্তাহের ন্যায়। ১৮ই জুলাই বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় বাসা থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা করেন। বের হওয়ার মুহূর্তটি স্মরণ করতে গিয়ে তার মা যেন এক শূন্যতার গভীরে ডুবে যান, স্মৃতির আবরণে তার দৃষ্টিতে ভেসে ওঠে সেই শেষ বিদায়ের মুহূর্ত। সজিবের বাসা থেকে বের হওয়ার আগের মুহূর্তগুলোর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তার মা বর্ণনা করেন—

'আমার ছেলে যেখানে যাইত না কেন, যাওয়ার আগে বলে যাইত এবং যাওয়ার সময় আমার কপালে একটা চুমু দিয়ে যাইত। ১৮ জুলাই সকালে বাসা থেকে বের হওয়ার সময় আমার কপালে একটা চুমু দিছে এবং পরে আমার হাতে চার হাজার টাকা দিছে। সজিব যাওয়ার সময় আমার মেজো ছেলের বউকে বলে গেছে, স্বর্ণা, আম্মারে দেখে রাখিস। যাওয়ার সময় তিনবার ডাক দিয়ে বলছে, মা আমি যাই। তিনবার ফিরে তাকাইছে। আমি বলছি, বাবা যাও, সাবধানে যাইয়ো, নিজের খেয়াল রাখিও। আল্লাহ হেফাজত করুক।'

ডা. সজিব সরকার তার ছোট ভাই আব্দুল্লাহকে মাদরাসা থেকে আনতে না গিয়ে শিক্ষার্থীদের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যোগদান করেন। তাদের প্রতি তার সমর্থন ছিল অবিচল। তার হাতে ধরা ছিল প্রতিবাদের বার্তা, তার মুখে ছিল শোষিত মানুষের কণ্ঠস্বর। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আন্দোলনের সম্মুখভাগে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। মিছিলের স্লোগানে সজিব সরকার যেন তখন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, প্রতিটি ধ্বনিতে উচ্চারিত হচ্ছিল মুক্তির আহ্বান।

সরকারি বাহিনী ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে চলমান ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার মাঝে, বিকেল চারটার দিকে আজমপুর ও বিএনএস সেন্টারের মাঝামাঝি স্থানে সজিবের হঠ্যাৎ দেখা হয় তার ছোট বোন সুমাইয়া সরকার স্বর্ণার সঙ্গে। এই মুহূর্তটি ছিল স্বর্ণার জন্য অবিস্মরণীয় ও বেদনামিশ্রিত।

বড় ভাইয়ের সাথে শেষ কথাগুলো স্মরণ করে স্বর্ণা বলেন—'বিকেল চারটার দিকে আজিমপুর এবং বিএনএস সেন্টারের মাঝামাঝি একটা পেট্রোল পাম্প আছে। পেট্রোল পাম্পের সামনে রাস্তার মাঝপথে ভাইয়া দাঁড়ায় ছিল, তখন আমার সঙ্গে ভাইয়ার দেখা হয়। আমি হেঁটে যাচ্ছিলাম আজমপুরের দিকে, তখন ভাইয়া পিছন থেকে বলতেছিল, এই ছোট লাঠি দিয়ে কি হবে? ভয়েসটা চেনাচেনা লাগছিল! পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখি ভাইয়া। সে আমার নাম ধরেও ডাকে নাই, অন্য কিছু বলে নাই, জাস্ট বলল, এই ছোট লাঠি দিয়ে কি হবে। পেছনে তাকিয়ে দেখি বড় ভাইয়া। ভাবতেছিলাম, ভাইয়া হয়তো বকা দিবে, আম্মাকে বিচার দিবে। তাই ভয়ে ভাইয়াকে উল্টো বলি, তুমি এখানে কেন? তুমি তো স্টুডেন্ট না, তুমি এখানে কি করছো? তোমার তো ঢাকায় কোনো কাজ নাই, তুমি ঢাকায় আসছো কেন? জানো না দেশের অবস্থা খারাপ, যাও তুমি বাসায় চলে যাও। পরে ভাইয়া বলতেছে, আব্দুল্লাহকে নিতে আসছি বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। ভাইয়া আমাকে বলে, তুইও, বাসায় যা। আমি বললাম, পরে যাবো, আমার সঙ্গে আরো অনেকে আছে। কথা শেষ করে আমি চলে যাই। একটু দূরে গিয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখি ভাইয়া কিছু মানুষের সঙ্গে কথা বলতেছিল।' স্বর্ণা চলে যাওয়ার পর বিকেল পাঁচটার দিকে সজিব ফোন করেন তার মাকে। ছেলের কণ্ঠ শুনে সজিবের মা স্বস্তি পেলেন।

-মা, তোমার মেয়ে কিন্তু আন্দোলনে আসছে।

মায়ের মন কেঁপে উঠলো, উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—

-তুমি কেন আন্দোলনে, আব্বু? তুমি তো সকালে বাসা থেকে বের হয়ে গেছো। এখন তো আব্দুল্লাহর মাদরাসায় থাকার কথা ছিল? তুমি কেন আজমপুরে? স্বর্ণার সাথে আন্দোলনে দেখা হয়েছে, তার মানে তুমিও আন্দোলনে? সজিব মৃদু হেসে উত্তর দিলেন—

-মা, আমি আন্দোলনে নেই তো, এমনিতেই এসেছি, একটু পরে আব্দুল্লাহকে নিয়ে বাসায় আসছি। এই কথা বলেই সজিব ফোন কেটে দিলেন। এটাই ছিল তার মায়ের সঙ্গে শেষ কথা।

সন্ধ্যা ছয়টা ত্রিশ মিনিটের দিকে ডা. অনিক, (সজিবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু) আতঙ্কিত কণ্ঠে সজিবের বোন স্বর্ণাকে ফোন করে বলেন 'তুমি তাড়াতাড়ি উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চলে যাও।' স্বর্ণা থমকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'কী হয়েছে, অনিক ভাইয়া? এখন কেন মেডিকেলে যাব হঠাৎ?' উত্তরে ডা. অনিক বেদনামিশ্রিত কণ্ঠে বলেন, 'সজিবের গুলি লেগেছে। দেরি করো না, দ্রুত চলে যাও।' স্বর্ণা কোনোভাবেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। সমস্ত দুনিয়াটা কেমন জানি অচেনা হয়ে উঠল। তারপরও বোন হাসপাতালের দিকে ছুটে যায়। হাসপাতালে পৌঁছে ভাইকে খুঁজতে থাকে, কিন্তু কোথাও সজিবকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কিছুক্ষণ পর, নার্সদেরকে সজিবের ছবি দেখান স্বর্ণা। তারপর পিছন থেকে একজন ডাক্তার তাকে ডেকে ইমার্জেন্সির সামনে নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে বোন স্বর্ণা দেখতে পেলেন স্ট্রেচারে ফেলে রাখা হয় দুটি লাশ। এক অজানা শঙ্কায় প্রথম লাশটির ওপর থেকে কাপড় তোলার সাথে সাথে বোন বিশ্বাস করতে পারছিল না, তার প্রিয় বড় ভাই সজিব আর নেই; মৃত্যুর কাছে হার মেনে পরপারে চলে গেছেন। স্বর্ণার অন্তর কেঁপে ওঠে। পৃথিবীটা যেন ওলটপালট হয়ে যায়, সমস্ত শব্দ স্তব্ধ হয়ে যায়।

পরে স্বর্ণা ও তার কিছু বন্ধু তামান্না, কুসুম, মুজাহিদ এবং বড় ভাই সকলে মিলে রাত এগারোটার দিকে সজিবকে শেষ গোসলের জন্য উত্তরা সাত নাম্বার সেক্টরের একটা মসজিদে নিয়ে যায়। গোসল শেষে রাত দেড়টার দিকে লাশ নিয়ে নরসিংদীতে সজিবের নানুর বাসায় তারা পৌছে, সজিবের মা তখনও জানেন না, তার আদরের সন্তান পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেছেন। পরে সজিবের ছোট খালা (মিলি) এসে সজিবের মাকে বলেন, মা অসুস্থ (সজিবের নানী), দেখতে যাবি না? চল যাই। এই বলে সজিবের মাকে তার বাবার বাসায় নিয়ে যায়। সজিবের মা গিয়ে দেখলেন, তার মা তো সুস্থ, চেয়ারে বসে আছেন। অবাক হয়ে বোন মিলিকে বলেন, তুই যে বললি মা অসুস্থ? এখন তো দেখছি মা সুস্থ। সজিবের মা মেয়ে স্বর্ণাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমার সজিব কই? স্বর্ণা বলে, চলো তোমাকে সজিবের কাছে নিয়ে যাই। স্বর্ণা মাকে শহীদ সজিবের লাশের সামনে দাঁড় করিয়ে দেন। মা কান্নায় ভেঙে পড়েন, পুরো পরিবার সজিবের মৃত্যুতে হতবিহ্বল হয়ে পড়ে।

পরের দিন ১৯ জুলাই শুক্রবার সকালে মাঝিরকান্দি, বাঙালিনগর, হাটুভাঙ্গা বাজার, রায়পুরা নরসিংদীর গ্রামের বাড়িতে তাঁকে দাফনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। সকাল ১১টায় জানাজা শেষে তাঁকে চরসুবুদ্ধি গণ-কবরস্থানে দাফন করা হয়। জানাযা পড়ান সেই মাদরাসাপড়ুয়া ছোট ভাই আব্দুল্লাহ, যাকে আনতে সজিব ঢাকায় গিয়েছিলেন।

সজিবের ফেসবুক প্রোফাইলে গেলে দেখা যায় তিনি আন্দোলনের শুরু থেকেই এক্টিভ ছিলেন। তিনি স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে পোস্ট করতেন। জুলাইয়ের প্রথম শহীদ আবু সাঈদকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করলে সজিব প্রতিবাদস্বরূপ তার ফেসবুকের প্রোফাইল পিকচারে আবু সাঈদের ছবি দেন, শহীদ আবু সাঈদ-এর সেই ছবিতে লেখেন 'বীর শহীদ আবু সাঈদ ভাই'। এবং ফেসবুকের কভার ফটোতে পুলিশের গুলির সামনে দুই হাত প্রসারিত করে দাঁড়ানো শহীদ আবু সাঈদেই সেই বীরত্বগাথা চিত্রের গ্রাফিতি শেয়ার করেন। এরপর থেকে সজিব শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক আন্দোলনে সাথে সংহতি জানিয়ে এবং জালিম সরকারের ধ্বংসের জন্য দোয়া করে ফেসবুকে বিভিন্ন সময় পোস্ট করেন।

ডা. সজিব সরকার ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ১২অক্টোবর নরসিংদী জেলার হাঁটুভাঙ্গা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন পিতামাতার প্রথম সন্তান। শৈশব থেকেই সজিব ছিলেন দায়িত্বশীল। পরিবারের সদস্যদের প্রতি তার ছিল গভীর মমত্ববোধ। স্বভাবের কোমলতা ও দায়িত্ববোধের জন্য তিনি পরিবারের সকলের পরম স্নেহভাজন ও সম্মানিত ছিলেন।

ডা. সজিব তায়রুন্নেছা মেমোরিয়াল মেডিকেল কলেজ থেকে ২০২০ সালে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজে প্রভাষক হিসেবে অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন শুরু করেন।

তার ফেসবুক আইডিতে গেলে বোঝা যায়, তিনি কতটা দেশপ্রেমিক ও সত্যের পক্ষে ছিলেন। তার ফেসবুকের প্রতিটি পোস্টে দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও মানুষের প্রতি অপরিসীম মমত্ববোধ স্পষ্ট। তিনি সবসময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতেন এবং যেকোনো সংকট বা জাতীয় ইস্যুতে সাহসিকতার সঙ্গে মতামত প্রকাশ করতেন। তার লিখনী ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক নিঃশব্দ প্রতিবাদ।

সজিব ছিলেন পরিবারের একমাত্র ভরসা, তার উপার্জনের ওপরেই পরিবার নির্ভরশীল ছিল। ছোট ভাইবোনের পড়াশোনা, পিতা-মাতার দেখাশোনা—সবকিছুই সজিব নিঃস্বার্থভাবে পালন করতেন। সজিব ক্লান্তি বা অসুবিধাকে বাধা মনে করতেন না। তার পরিশ্রম ছিল অবিরাম, শুধুই পরিবারকে সুখে রাখার জন্য। তার স্বপ্ন ছিল একদিন মাকে একটি সুন্দর বাড়ি উপহার দেওয়ার, আরও একটি স্বপ্ন ছিল মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার, যেখানে কোমলমতি শিশুরা দীন ইসলামের শিক্ষার আলোয় আলোকিত হবে।

সজিব মায়ের জন্য নিবেদিত ছিল; অশ্রুসিক্ত হয়ে তার মা স্মৃতিচারণ করেন—'সজিব প্রতিদিন রাতে ১২টা-১টা পর্যন্ত আমার হাত-পা টিপে দিত। তার মনটা ছিল শিশুর মত সরল। সে আমাকে বলত, মা, তোমাকে ভালো রাখার জন্য, তোমার চিকিৎসার জন্য যদি কেউ আমাকে বলে, জিহ্বা দিয়ে ময়লা চেটে পরিষ্কার করতে, আমি তা-ও করব।'

অশ্রুসিক্ত সজিবের পিতা স্মৃতিচারণ করে বলেন— 'স্বপ্ন দেখেছিলাম, আমার ছেলে বড় ডাক্তার হবে। তার চিকিৎসা দিয়ে মানুষের সেবা করবে। কিন্তু আমার সে স্বপ্ন ভেঙে গেছে। সরকার আমার স্বপ্নভঙ্গের প্রতিদানে আমার ছেলের লাশ উপহার দিয়েছে।

সজিব ডাক্তার হওয়ার পর আমাদের মধ্যে একটি কমিটমেন্ট ছিল—সে প্রতি সপ্তাহে ৪-৫ জন রোগী বিনামূল্যে চিকিৎসা করবে। আমার সন্তান সেই প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করত। প্রতি শুক্রবার সে ৫ জন রোগী ফ্রি দেখত। মানুষের সেবা করা যেন তার রক্তে মিশে ছিল। আজ আমি শূন্যতায় ডুবে আছি। আমার সন্তান সজিবের রক্ত যেন আমাকে ক্রমাগত প্রশ্ন করে, এই নৃশংস হত্যার বিচার কোথায়? আমি আমার ছেলের হত্যার ন্যায়বিচার চাই। এ পৃথিবীর কাছে আমি আমার সজিবের জন্য সুবিচারের দাবি জানাই।'

সজিব ছিলেন এক নিবেদিতপ্রাণ আল্লাহভীরু মানুষ, যার অন্তরে ছিল ঈমানের দৃঢ়তা এবং পরম আনুগত্যের অঙ্গীকার। তার মা স্মৃতিচারণ করে বলেন—'সাত বছর বয়স থেকে সজিব নামাজ, রোজা এবং কুরআন তিলাওয়াত শুরু করে। দ্বীনের পথে পা বাড়ানোর পর তাকে আর কখনো পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

সজিবের ছিল ইসলামের প্রতি এক অন্তর্গত ভালোবাসা, যা তাকে প্রেরণা দিত। টুপি, জায়নামাজ, তসবিহ এবং আতর মানুষকে উপহার দেওয়া ছিল তার প্রিয়তম কাজ। রমজান মাসে কুরআন ও বিভিন্ন হাদিসের কিতাব মানুষকে হাদিয়া দেয়া ছিল তার অন্যরকম এক আনন্দের কাজ।'

মায়ের ভাষায়—'সজিব প্রতি রমজানে কুরআন ও হাদিসের কিতাব মানুষকে উপহার দিত, মানুষকে সৎ পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করত। সে গোপনেও দান করতে, যা তার মৃত্যুর পর আমরা জানতে পেরেছি।'

সজিব শুধু নিজে দ্বীনের পথে অটল থাকার চেষ্টা করতেন না; বরং মায়ের জন্যও ইসলামিক বই এবং হাদিসের কিতাব এনে দিতেন, যেন তাদের সংসারে আলোর সঞ্চার হয়। মৃত্যুর মাত্র তিন দিন আগে তিনি মাকে একটি হাদিস শোনান, যার বিষয়বস্তু ছিল রাসুল সা.-কে কটূক্তির বিরুদ্ধে নবীর সতর্কতা। তার শেষ দিনগুলোতেও এই আলোকিত কথাগুলো যেন তার অন্তরের বিশুদ্ধতা এবং সত্যপথের প্রতি তার অটল বিশ্বাসের প্রমাণ বহন করে।

সজিবের জীবন ছিল এক অম্লান আদর্শের আলোকবর্তিকা। তিনি দেশপ্রেম, সততা এবং মানবসেবার প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। তার অকাল প্রয়াণ আমাদের সকলকে এক গভীর শোকের মাঝে নিমজ্জিত করেছে, সমাজ তার অমূল্য রত্নটি হারিয়েছে। সজিবের মৃত্যু, শুধু তার পরিবারের জন্য নয়, দেশের জন্যও এক অপূরণীয় ক্ষতি। তার জীবন ছিল এক পথপ্রদর্শকের মতো, যেখানে তিনি শুধু

নিজের স্বপ্নই পূরণ করেননি, বরং অন্যদের পথও আলোকিত করেছেন স্নিগ্ধ সম্ভাবনার আলোয়।

তার মধ্যে যে আত্মত্যাগ এবং নিষ্কলঙ্ক ভালোবাসা ছিল, তা ছিল এক অপূর্ব মায়ার প্রতীক। পরিবার, সমাজ, দেশ—সবকিছুর জন্য নিজেকে নিবেদন করা ছিল সজিবের জীবনদর্শন। তার মা-বাবার প্রতি যে গভীর অনুরাগ এবং স্নেহ ছিল, তা কোনোদিনও তার পরিবারের মনের পর্দা থেকে মুছবে না। সজিবের হৃদয়ে ছিল মানুষের জন্য সমব্যথা, তার চোখে ছিল মানুষের প্রতি অটুট এক ভালোবাসা।

সজিবের প্রস্থান আমাদের সামনে রেখে গেছে এক গভীর শূন্যতা, যা কখনো পূর্ণ হবে না। তার আদর্শ, তার কর্ম, তার ভালোবাসার অঙ্গীকার আমাদের হৃদয়ে চিরকাল তাজা থাকবে ইনশাআল্লাহ। তিনি চলে গেলেও, তার জীবনচিত্র, তার নিঃস্বার্থ ত্যাগ, তার প্রতি মানুষের অগাধ ভালোবাসা—এই সব কিছুই চিরকাল আমাদের পথপ্রদর্শক হয়ে থাকবে ইনশাআল্লাহ। তিনি ছিলেন এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, যে আগুন এখনও আমাদের হৃদয়ে জ্বলছে, এবং যার আলো কখনো নিভে যাবে না।

তথ্যসূত্র:

১. মা, বোন এবং প্রত্যক্ষদর্শী মাহফুজ আব্দুল্লাহ

তথ্য সংগ্রহে:

মোঃ নাহিদ হাসান সজীব, মোঃ কামরুজ্জামান; স্টোরি মেকিং: মোঃ নাহিদ হাসান সজীব এবং ড. মোহাম্মাদ সরোয়ার হোসেন

মেরে ফেললে তো শহীদ হয়ে যাব

-আম্মু, আমার ভালো লাগতেছে না। আমার মন চাইতেছে ঢাকা যাইয়া আন্দোলনে যোগ দিতে।

-তুমি সেখানে যাইয়া কী করবা? তুমি তো ছোট মানুষ। বড় বড় মানুষদেরই তো মাইরা ফালাইতাছে। তারাই তো পারতেছে না।

-মাইরা ফালাইলে তো শহীদ হইয়া যামু

সতের জুলাই রাতে তাহমিদ এভাবেই মায়ের কাছে ব্যথাতুর হৃদয়ের আকুতি ও আন্দোলনে যোগ দেওয়ার তীব্র ইচ্ছা প্রকাশ করে । পরের দিন মায়ের নিষেধ অমান্য করেই আন্দোলনে চলে যায়। আর কখনো মায়ের বুকে ফিরে আসেনি ছোট্ট তাহমিদ। হয়তো জান্নাতের কোনো সবুজ পাখির সাথে কথা বলছে এখন তাহমিদ।

শহীদের নাম: তাহমিদ ভূঁইয়া
বয়স: ১৫ বছর ৬ মাস (জন্ম-৮ জানুয়ারি ২০০৯)
মৃত্যুর তারিখ: ১৮ জুলাই ২০২৪
পিতার নাম: রফিকুল ইসলাম
মাতার নাম: তাইয়্যেবা ভূঁইয়া
ঠিকানা: সদর, নরসিংদী
শিক্ষা: নবম শ্রেণি, নাছিমা কাদির মোল্লা হাই স্কুল এন্ড হোমস্ স্কুল, সদর নরসিংদী

নরসিংদী জেলার চিনিশপুর ইউনিয়নের নন্দীপাড়া গ্রামে ২০০৯ সালের ৮ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন তাহমিদ ভূঁইয়া। তার পিতা রফিকুল ইসলাম পল্লী চিকিৎসক এবং মাতা তাইয়্যেবা ভূঁইয়া গৃহিনী। তিন সন্তানের মধ্যে তাহমিদ ছিল জ্যেষ্ঠ। ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলে পড়ালেখা দিয়ে শিক্ষাজীবন শুরু করলেও পরবর্তীতে মধ্যবিত্ত বাবার পক্ষে সেই খরচ বহন করা সম্ভব না হওয়ায় তাকে ভর্তি করা হয় স্থানীয় নাছিমা কাদির মোল্লা হাই স্কুল এন্ড হোমস্ স্কুলে। শাহাদাতের সময় তাহমিদ ওই স্কুলের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিলেন।

১৬ জুলাই আবু সাঈদের বীরত্বপূর্ণ শাহাদাত ও এরপর শিক্ষার্থীদের ওপর চালানো হত্যাযজ্ঞ দেখে স্থির থাকতে পারেনি ১৫ বছরের এই টগবগে তরুণ। ওই দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করে তাহমিদের মা বলেন—'আবু সাঈদকে যখন মারছে, সে এসব সহ্য করতে পারেনি। ১৭ জুলাই রাতেও সে আমার সাথে আন্দোলন নিয়ে অনেক কথা বলছে। ১৮ জুলাই যোহরের নামাজ পড়ার পর কিছুক্ষণ সে কুরআন তেলাওয়াত করে। তারপর তাহমিদ, তার দাদু ও বাবার সাথে একসাথে খাবার খায়।

আমি পরে খেতে বসলে, সে আমার পাশে বসে আর বলে, 'মেজো ভাইয়া (ফুফাতো ভাই, যোবায়ের) আন্দোলনে যাবে, আমিও যাব।' আমি তাকে নিষেধ করে বললাম, 'তুমি যাইও না। আজকে তুমি ঘর থেকে এক পা-ও বের করতে পারবে না। আজকে ঘর থেকে বের হইলে তোমার পা ভাইঙ্গা ফেলমু।' পরে আমাকে বলতেছে, 'তুমি আমাকে কোথাও যাইতে দাও না। আমি বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে যাইতে চাইছিলাম, যাইতে দাওনি। তুমি শুধু আমাকে মহিলাদের মতো ঘরে বসাইয়া রাখো।' আমি বললাম, 'ঘরে থাকাই ভালো। বাইরে কত দুর্ঘটনা ঘটে দেখো না?' তখন সে ছোট বোনের সঙ্গে মোবাইলে গেম খেলছিল। খাবার শেষে আমি বাসার বাইরে যাওয়ার সময় তাকে আমার সঙ্গে যেতে বলি। কিন্তু সে বলল, 'আমার ভালো লাগছে না, আম্মু। আমি যাব না।' অনেক বুঝিয়েও তাকে নিতে পারিনি। আমি একাই বের হয়ে যাই।

তাহমিদের মা ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার অল্প সময় পরেই সাড়ে তিনটায় তাহমিদ আন্দোলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। আন্দোলনে যাওয়ার সময় পাশের বাড়ির এক মহিলা তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'তাহমিদ, কোথায় যাচ্ছ?' 'আন্টি, আন্দোলন দেখতে যাচ্ছি।' উনি তাহমিদকে যেতে নিষেধ করলে তাহমিদ বলেছিল, 'আন্টি, এখনই ফিরে আসব।' ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস! বাড়ি থেকে বের হওয়ার মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই পুলিশের গুলিতে পৃথিবীর সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে পরকালে পাড়ি জমান তাহমিদ।

তাহমিদ গুলিবিদ্ধ হওয়ার সময় তার পাশেই ছিলেন নরসিংদী সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী (এইচএসসি-২০২৪) আশরাফুল ইসলাম। তাহমিদকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠাতে সাহায্য করেন তিনি। এর কিছুক্ষণ পর একই স্পটে পুলিশের গুলিতে চোখের দৃষ্টিশক্তি হারান আশরাফুল ইসলাম। এরপর আহত অবস্থায়ই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে কারাগারে প্রেরণ করে।

ওই সময়ের বিস্তারিত ঘটনা এবং আন্দোলনে তার সম্পৃক্ততা বর্ণনা করতে গিয়ে আশরাফুল বলেন—

১৮ জুলাই, ২০২৪

সেদিন আমাদের কর্মসূচি ছিল নরসিংদীর জেলখানার মোড় এলাকায়। বাসা থেকে আন্দোলনের স্থানে যেতে ১০০ টাকা দরকার ছিল, কিন্তু আমার কাছে কোনো টাকা ছিল না। আম্মার কাছে টাকা চাইলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'টাকা দিয়ে কী করবি?' আমি আন্দোলনের কথা বললে উনি ভয় পেয়ে যান। অনেক জোরাজুরির পর তিনি রাজি হলেন, কিন্তু তার কাছেও টাকা ছিল না। আম্মা একজনের কাছ থেকে ৫০ টাকা ধার করে আমাকে দেন। যার কাছে চেয়েছেন ওনার কাছেও এর বেশি ছিল না। আমি চিন্তা করলাম, ৫০ টাকায় যেতে তো পারব। যাওয়া হলেই হলো, ফেরার চিন্তা পরে করব।

আমি কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে সিএনজি দিয়ে জেলখানার মোড়ে পৌঁছাই। মোড়ের একটু আগে নেমে আমরা হেঁটে মোড়ের দিকে আগাতে থাকি। হঠাৎ দেখি, মোড় থেকে ছাত্ররা পুলিশের ধাওয়া খেয়ে আমাদের দিকে দৌড়ে আসছে। পুলিশ তখন মোড়ে অবস্থান করছিল। বেশ কিছুক্ষণ পর আমাদের দিক থেকে ও ডিসি রোড থেকে আমরা ছাত্ররা একই সময়ে জেলখানার মোড়ের দিকে আগাতে থাকি এবং বৃষ্টির মতো ইট নিক্ষেপ করতে থাকি। আমাদের ইটের সামনে টিকতে না পেরে বেশির ভাগ পুলিশ পালিয়ে যায় আর কয়েকজন পুলিশ পাশের হারুন-অর-রশিদ খাঁন মার্কেটের গলির ভেতরে আশ্রয় নেয়।

আমরা হাজার হাজার ছাত্র-জনতা জেলখানার মোড় দখল করে মিছিল করতে থাকি। আর গলির ভেতরে থাকা পুলিশ অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকে। আমি-সহ কয়েকজন গলির পাশেই ছিলাম। বিকেল চারটার পর গলির ভেতর থেকে পুলিশ গুলি চালাতে শুরু করলে, আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাই। আমরা কয়েকজন গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ইট নিক্ষেপ করতে থাকি। হঠাৎ, বিকট এক শব্দে আমার বাম পাশ দিয়ে একটি গুলি চলে যায়। তখন আমার পাশে থাকা আনুমানিক ১৫-১৬ বছর বয়সী জার্সি পরা একটি ছেলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ছেলেটির বুক ও গলা দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। পরে জানতে পারি, ছেলেটির নাম তাহমিদ।

আমি দ্রুত একটি অটোর পেছনে গিয়ে তাহমিদের পা ধরে কাছে টানার চেষ্টা করি। পা ধরতেই মনে হলো, সে অনেক ভারী। এত হালকা-পাতলা ছেলেটা এত ভারী কেন?

আমি চিৎকার করে উঠলাম—'ভাই, ভাই! আমার ভাই গুলি খাইছে, কেউ ওকে বাঁচাও, আমাকে সাহায্য করো!' আমরা তাহমিদকে অটোরিকশায় তুলে রাস্তায় বের হই। তখন আমি খুব দুর্বল হয়ে পড়ি—মাথা ঘুরছিল, গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, আর বাম কানে শুনতে পাচ্ছিলাম না। একপর্যায়ে আমি ওর দেহ ছেড়ে বসে পড়লাম, বাকিরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। পানির পিপাসায় আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। তখন, টিউবওয়েল খুঁজে বের করলাম। আমার হাতে তাহমিদের রক্ত লেগে ছিল। এই কাজটা কেন করলাম জানি না, প্রথমে আমি আমার হাতের রক্ত গালে মাখি। এরপর পানি পান করে মাটিতে বসে পড়ি। ধীরে ধীরে শক থেকে বের হয়ে আমি হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করি বলতে থাকি, 'আমার ভাই গুলি খাইছে! ফুলের মতো ছেলেটা। আল্লাহ! আল্লাহ গো! 'তখন অনেকেই আমাকে ঘিরে ধরেছিল, কেউ ভিডিও করছিল, কেউ সান্ত্বনা ও সাহস দিচ্ছিল।

আমার এলাকার ফাহিম ভাই এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আশরাফুল, তোর কিছু হয়েছে?' আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, 'না ভাই, ছেলেটা মারা গেলো!' সেখানে থাকা একটি ছেলে বলল, সে একটি কাভার নিয়ে গলির ভেতর ঢুকবে, আর সবাই তার পেছনে যাবে। দরকার হলে সে গুলি খাবে, তবুও পুলিশকে ধরবে। ওর এই সাহস দেখে আমি মুগ্ধ হলাম। আমিও অনুপ্রাণিত হই যে, আমিও সামনে থাকব। আমি একটি স্টিলের পাত ঢালের মতো সামনে নিয়ে এগোতে থাকি। সামনে দেখার জন্য মাথা উঁচু করে উঁকি দিতেই হঠাৎ বাম চোখে গুলি লাগে। কী হলো বুঝতে পারলাম না। সবকিছু ঘোলা দেখছিলাম, মুখ রক্তে ভেসে গেছে, চোখ দিয়ে রক্ত বের হচ্ছিল। কোনোভাবে বেরিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম।

আমি ডান চোখে কম দেখি। ৮ বছর বয়সে একটি দুর্ঘটনায় ডান চোখে আঘাত পেয়েছিলাম। বাম চোখেই সব দেখতাম। কখনো নিজেকে দুর্বল মনে হয়নি, কারণ বাম চোখ ছিল শক্তিশালী। গুলি লাগার পর দোয়া করতেছিলাম, 'আল্লাহ, আমি যেন চোখে দেখতে পারি।' আবার ভাবতেছিলাম, গুলিটা যদি ডান চোখে লাগত, যে চোখে এমনিতেই কম দেখি। বর্তমানে আমি বাম চোখে দেখতে পারি না, চোখের পেছনে অপটিক নার্ভে গুলি এখনো রয়ে গেছে। তখনও বুঝিনি যে, এটা ছিল আমার ধৈর্যের পরীক্ষার কেবল শুরু। আমি কোনোভাবে গলি থেকে বের হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ি। আন্দোলনকারীরা আমাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়, কিন্তু কোনো হাসপাতালেই গেট খুলছিল না। শেষে ছাত্র ভাইয়েরা একটি প্রাইভেট হাসপাতালের গেট ভাঙার চেষ্টা করলে, তারা বাধ্য হয়ে আমাকে ও আরও কয়েকজনকে ভেতরে নিয়ে যায়।

আমার চোখ থেকে রক্ত বের হচ্ছিল। তারা চোখে বরফ ও পানি দিচ্ছিল। কিন্তু, ৫ মিনিটের মধ্যে আবার ব্যথা শুরু হয়ে যায়, ভয়ঙ্কর ও অসহনীয় ব্যথা। আমি কাতরাতে থাকি, মনে হচ্ছিল এই ব্যথাতেই মারা যাব। চিৎকার করে বলতে থাকি, 'আমাকে পেইনকিলার ইনজেকশন দাও, না হলে আমি মরে যাব!' অবশেষে তারা ইনজেকশন দেয়, আর ব্যথা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। কিছুক্ষণ পর পরিচিত কয়েকজন এসে আমাকে নরসিংদী সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে আমাকে জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে রেফার করা হয়।

১৯ জুলাই, ২০২৪

ওই দিন ঢাকায় জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে আমার চোখের অপারেশন হয়। অন্য দিকে নরসিংদীতে জেল ভেঙে কয়েদি ও হাজতিরা পালিয়ে যায়।

২০ জুলাই, ২০২৪

চোখ থেকে ব্যান্ডিজ খুলে আমাকে রিলিজ করে দেয় এবং বাসায় চলে আসি। আসলে, ওই সময় হাসপাতালে থাকার মতো পরিবেশ ছিল না। সিভিল পোশাকে পুলিশ আসত।

২২ জুলাই, ২০২৪

বিকাল বেলা রুমে বসে সাইরেন এর আওয়াজ শুনতে পাই। কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হয়। আম্মা দরজা খুলতেই প্রায় ২৫-৩০ জন পুলিশ ঢুকে পড়ে। তারা ঘরে ঢুকে আমাকে মারতে থাকে এবং আম্মাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। এক পর্যায়ে তারা লাঠি নিয়ে আম্মাকে মারার চেষ্টা করে। সেই মুহূর্তে নিজেকে এতটা অসহায় লাগছিল, যা শুধু আমি আর আল্লাহ জানি। আমি তাদের বলি, 'জোরাজুরি কইরেন না। আমি যেতে প্রস্তুত। আমার চোখের ভেতর এখনো গুলি আছে।' আমাকে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে তাদের গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। রাস্তায় বন্দুক লোড করতে করতে জিজ্ঞাসা করে আমার সাথে কে কে ছিল? আমি কারো নাম বলি নাই, মরলে একাই মরব। এরপর ওরা আমাকে পলাশ থানায় নিয়ে যায়।

ওই দুই রাত ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর রাত। পলাশ থানার হাজতিখানার ভেতর পেশাবে ভরা ছিল। আমি শুধু একটি ছোট হাফপ্যান্ট পরে ছিলাম, খালি গায়ে। প্রচণ্ড ক্ষুধায় পেট মোচড়াচ্ছিল, কিন্তু চোখের কারণে কিছু চিবাতে পারছিলাম না। মাটিতে শোয়ার উপায় ছিল না—ময়লা ও পেশাবের কারণে

ইনফেকশনের ভয় হচ্ছিল। থানায় আমার সঙ্গে রায়হান ভাই, ঘোড়াশাল ও ওয়াপদা গেটের আরেকজন ভাই ছিলেন। তারা অনেক সহায়তা করেছেন।

২৩ জুলাই, ২০২৪

পলাশ থানা থেকে নরসিংদী মডেল থানায় আমাকে হ্যান্ডওভার করে। ওইদিনই রাত দশটার দিকে আমাকে নরসিংদী কোর্টে তুলে এবং রাত তিনটার দিকে আমিসহ অনেকজনকে বিস্ফোরক-দ্রব্য মামলায় কাশিমপুর কারাগারে প্রেরণ করে।

রাতে যখন কাশিমপুর নিয়ে যাওয়া হয়, প্রিজন ভ্যানে আমাদের প্রায় ৫০ জন ছিল। ভেতরটা প্রচণ্ড গরম। ক্ষুধা, ক্লান্তি আর বমির গন্ধে পরিবেশ অসহ্য হয়ে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল, যেন এখানেই আমার শেষ নিঃশ্বাস চলে আসবে। আল্লাহর রহমতে কিছুক্ষণ পর ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু অল্প সময়েই ঘুম ভেঙে যায়। ভোরবেলা ঘোলা চোখে দেখি, আমরা কাশিমপুর প্রশাসনিক ভবনের প্রধান গেটের সামনে।

২৪ জুলাই, ২০২৪

আমাকে প্রথমে ২ দিন আমদানি ওয়ার্ডে রাখা হয়, এরপর সেলে পাঠানো হয়। আমার হাজতি নং ছিল ৩১৭/২৪। নাম আশরাফুল, পিতা শাব্বির হোসেন। আমি কাশিমপুর কারাগারের হাই সিকিউরিটি ৪ নম্বর চন্দ্রা বিল্ডিংয়ের ৫ তলার ৮ নম্বর সেলে ছিলাম। সেলে আমরা মোট ৬ জন ছিলাম।

আমি জানতাম না কবে মুক্তি পাব, বা আমার সাথে কী হবে। ওই সময় আমার ইন্টারমিডিয়েটের চলমান পরীক্ষার ৬টি পরীক্ষা বাকি ছিল। কিন্তু আমি তখন জেলে। ওই তলায় থাকা ৪৫ জনের সবাই নরসিংদীর একই মামলার আসামি। এর মধ্যে আমরা ২-৪ জন ছিলাম আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, আর বাকিরা ছিল নিরীহ সাধারণ মানুষ। এলাকার মধ্যে যারা বিএনপি পন্থী বা আওয়ামী বিরোধী ছিল তাদেরকেই ধরে নিয়ে এসেছে। বাইরে থেকে সবাই শক্ত থাকার ভান করলেও ভেতরে সবাই ভেঙে পড়েছিল। ৩ দিনের মধ্যে কেউ একা, কেউ লুকিয়ে, আবার কেউ সবার সামনে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

একদিন শুক্রবার মাগরিবের আজানের পর সেলের ভেতরে সবাই একসাথে জিকির শুরু করি। এরই মধ্যে সবাই চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। আহাজারি চলতে থাকে প্রায় ২ ঘণ্টা। বয়স্ক থেকে শুরু করে যুবক—সবাই আল্লাহর নিকট কান্না করে করে সাহায্য চাইতে থাকে। দেখতে দেখতে জেলে দশটা দিন কেটে যায়।

৩ আগস্ট, ২০২৪

ওই দিন, আমরা যারা এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিলাম আমাদের সবাইকে জামিন দিয়ে দেয়। আমরা পলাশ বাজার এলাকায় একটি বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতাম। ওই বাসার মালিক ছিলেন ঘোড়াশাল পৌরসভার ১, ২, ৩নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর সেলিনা আক্তার। তিনি এবং তার লোকজন আমার পরিবারকে বাসা থেকে বের করে দেন এবং ঘরে তালা লাগিয়ে দেন। এরপর আমার পরিবার নদীর ওপারে গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার জামালপুরে, আমার দাদা ও নানার বাড়িতে আশ্রয় নেয়। আমি প্রথমে নানার বাড়ি যাই। ওই রাত নানার বাড়িতে থেকে পরের দিন দাদার বাড়ি চলে যাই।

০৫ আগস্ট, ২০২৪

সেদিন ছিল 'লং মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচি। সকাল দশটা পর্যন্ত আমি আল্লাহর কাছে সবার জন্য দোয়া করি এবং লং মার্চের খবর দেখছিলাম। একসময় ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ি। কেউ আমাকে জোরে ডাকছে, 'আশরাফুল! আশরাফুল!' ভয়ে চোখ খুলে দেখি, আমার দাদি আমাকে ডাকছে। তিনি বললেন, 'হাসিনা পালাইছে।' এই খবর শুনে আমি আলহামদুলিল্লাহ বলে উঠে পড়ি। চারপাশে আনন্দের বৃষ্টি। সবাই আনন্দিত। দৌড়ে টিভির সামনে গিয়ে দেখি, হাসিনা হেলিকপ্টারে পালাচ্ছে। সাধারণ মানুষ গণভবনে সবাই উল্লাস করছে, আনন্দ মিছিল করছে।

এটা ছিল আমার জীবনে প্রথম স্বাধীনতার স্বাদ। বুঝতে পারলাম, এই স্বাধীনতা আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন, ছাত্রজনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। আমি খুশিতে কান্না করে ফেললাম। আমার দেশ বাংলাদেশ। আমি বাংলাদেশকে ভালোবাসি। নতুন একটি দেশ দেখতে চাই, যেখানে কোনো বৈষম্য, চাঁদাবাজি, অত্যাচার বা নিপীড়ন থাকবে না, থাকবে বাকস্বাধীনতা, শান্তি, ঐক্য, আর দরিদ্রশূন্য সমাজ। বিজয় চিরজীবী হোক।

***

তাহমিদের গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর অল্প সময়ের মধ্যেই পরিবারের কাছে পৌঁছে যায়। তবে তাহমিদকে কোন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে তারা কোনো সুস্পষ্ট তথ্য পাননি। পরিবারের সবাই তখন দিশেহারা হয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে তাহমিদকে খুঁজতে থাকেন।

অবশেষে আবদুল কাদির মোল্লার মসজিদের সামনে স্ট্রেচারে শোয়ানো সন্তানের নিথর দেহ খুঁজে পান পিতা রফিকুল ইসলাম।

ওই মুহূর্তের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে গিয়ে প্রত্যক্ষদর্শী কাজী আইমান বলেন—'গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর প্রথমে তাহমিদকে জেলা হাসপাতালে নেওয়া হয়। জেলা হাসপাতালে মৃত ঘোষণা করার পর ওখান থেকে জেলখানার মোড় হয়ে ডেন্টাল হাসপাতালে আনা হয়। জেলখানার মোড় থেকে যখন ডেন্টাল হাসপাতালের দিকে নেওয়া হয়, তখন থেকে আমি তাহমিদের লাশের সাথে ছিলাম। ডেন্টাল হাসপাতালের ভেতর ঢুকানোর পর হাসপাতালের কর্মরত লোকেরা তার বুকে পাম্প দেয়। ওর বুকের বুলেটের আঘাতের স্থান থেকে রক্ত পরিষ্কার করে। তখন কিন্তু সে মৃত। তারপর ছাত্ররা তাহমিদের লাশ স্ট্রেচারে করে মিছিল করতে করতে তার স্কুল নাছিমা কাদির মোল্লা হাই স্কুল এন্ড হোমস্ এর দিকে নিয়ে যায়। স্কুলের সামনে যাওয়ার পর কাদির মোল্লা মসজিদের সামনে পুলিশ মিছিল লক্ষ করে গুলি শুরু করে। তখন ছাত্ররা লাশ স্ট্রেচারে ফেলেই আশে-পাশে সরে পড়ে। আর গুলিগুলো লাশের দেহে আর স্ট্রেচারে লাগতেছিল।'
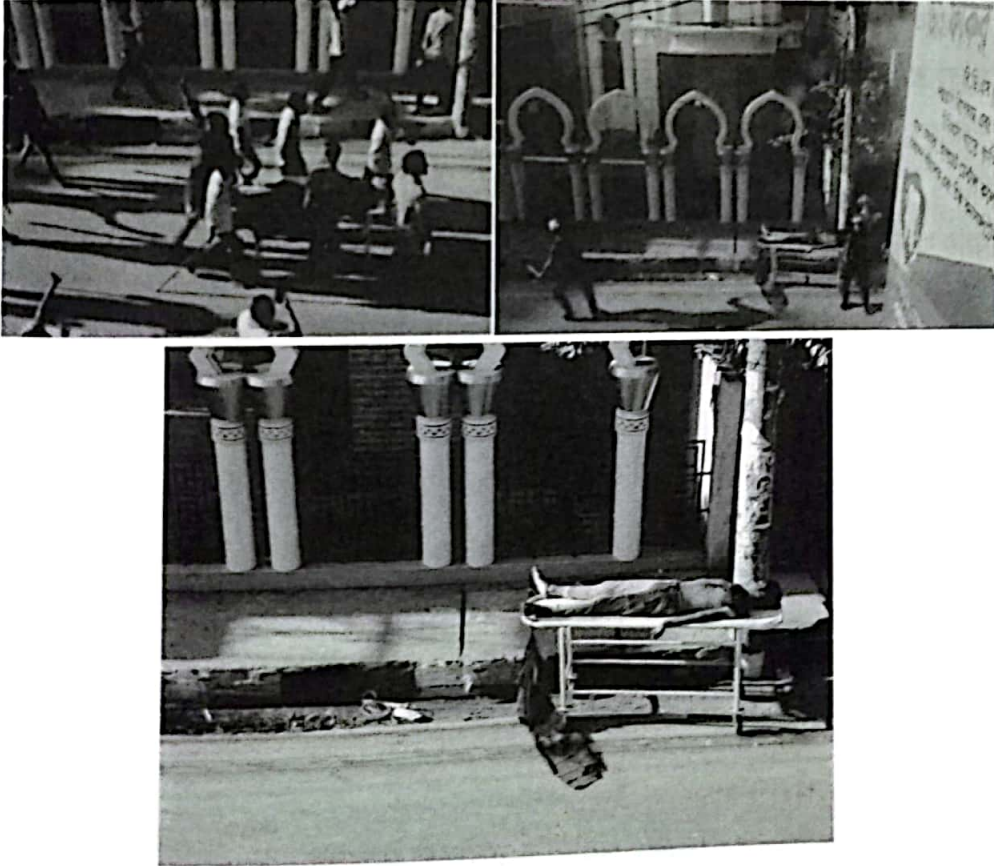
ছবিঃ তাহমিদের লাশ নিয়ে মিছিলরত শিক্ষার্থীদের উপর পুলিশ গুলি করলে গুলি তাহমিদের নিথর দেহে লাগে।

তাহমিদের বাবা বলেন—'যখন কাদের মোল্লা মসজিদের সামনে আমার ছেলের লাশের ওপর গুলি করতেছিল, তখন আমি হাত উপরে তুলে বলছি, গুলি কইরেন না, গুলি কইরেন না। তখন আমাকে একজন টাইনা নিয়ে গেছে আর বলছে, ছেলে গেছে, আপনিও যাবেন।'

ভিডিও: তাহমিদের নিথরদেহ নিয়ে মিছিলরত আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়।

কী নিদারুন করুণ দৃশ্য! বাবার চোখের সামনে ছেলের লাশের ওপর গুলি করছে হায়েনারা; অসহায় বাবা চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করতে পারছে না। একজন বাবার জীবনে এর চেয়ে বড় কষ্ট ও বড় বেদনা আর কিছুই হতে পারে না! দুনিয়ার যাবতীয় কষ্ট এর সামনে নিতান্তই ম্লান ও তুচ্ছ। বিকাল পাঁচটার দিকে শহীদ তাহমিদের লাশ বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়। রাত সাড়ে আটটায় স্থানীয় ঈদগাহ মাঠে এবং রাত সাড়ে দশটায় তার স্কুল মাঠে জানাজা শেষে চিনিশপুর কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

ছেলের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তাহমিদের মা বলেন—তাহমিদ ক্রিকেট খেলতে খুব পছন্দ করত। সে ইন্টার স্কুল ফুটবল টুর্নামেন্টে স্কুল টিমের হয়েও খেলত। স্কুলের ছুটির দিনগুলোতে তার প্রতিটি মুহূর্ত খেলাধুলা করে সময় কাটত। তাহমিদ ছোটবেলা থেকেই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ত ও নিয়মিত কোরআন তিলাওয়াত করত।

ছবিঃ শহীদ তাহমিদের মরদেহ

আমার তো সবসময় ওরে মনে পড়ে। আমার কোন কিছুর প্রয়োজন পড়লেই ওরে আনতে পাঠাইতাম। ওই দিন আমার মেয়ে আইসা বলতাছে, 'আম্মু, A4 সাইজ পেপার লাগবে।' তখন, আমার এত খারাপ লাগতেছিল! আজকে আমার আদরের ছেলেটা থাকলে তো তাকেই পাঠাইতাম।

১৮ জুলাই, দুপুরে বাইরে থেকে বাসায় ফেরার সময় রাস্তায় জানতে পারলাম, তাহমিদ আন্দোলনে গেছে। তখন একবার ভাবলাম,আমি যাইয়া ওকে খুঁইজা নিয়ে আসি। আবার চিন্তা করলাম, আমি যাইয়া কই খুঁজব? বাসায় যাইয়া কাউরে পাঠাই। এখন আমি বলি, আমি যদি যাইতাম হয়তো আমি ফিরাইয়া আনতে পারতাম।

তথ্যসূত্র

১. তাহমিদ ভুঁইয়ার বাবা এবং মায়ের সাক্ষাৎতকার

২. প্রত্যক্ষদর্শী: আশরাফুল ইসলাম (যিনি আন্দোলনের সময় এক চোখে গুলিবিদ্ধ হোন) এবং আয়মান-এর সাক্ষাতকার।

৩. ভিডিও: তাহমিদের লাশ নিয়ে মিছিল করার সময় মিছিলের ওপর গুলি করার ভিডিও

তথ্য সংগ্রহে:

মোঃ কামরুজ্জামান, মোঃ নাহিদ হাসান সজীব এবং মোঃ শিহাবুল ইসলাম; স্টোরি মেকিং: মোঃ কামরুজ্জামান, মোঃ নাহিদ হাসান সজীব এবং ড. মোহাম্মাদ সরোয়ার হোসেন

পানি লাগবে কারও? পানি, পানি

শহীদের নাম : মীর মাহফুজুর রহমান (মুগ্ধ)।
বয়স : ২৫ বছর ৯ মাস (জন্ম ৯ অক্টোবর ১৯৯৮)
মৃত্যুর তারিখ : ১৮ জুলাই ২০২৪।
পিতার নাম : মীর মোস্তাফিজুর রহমান।
মাতার নাম : শাহানা চৌধুরী।
ঠিকানা : কাজীপাড়া, টি এ রোড, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
শিক্ষা : স্নাতক (গণিত), খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৮ জুলাই, এদিন রাজধানীর উত্তরা আজমপুর এলাকায় ছাত্র-জনতা যখন দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, তখন মীর মাহফুজুর রহমান (মুগ্ধ) প্রথমে আহতদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যান তারপর ক্লান্ত শিক্ষার্থী জনতাকে পানি বিতরণ করেন। কিছুক্ষণ পর সামান্য বিশ্রামের জন্য ডিভাইডারের ওপর বসার পর ঘাতকের গুলিতে ভারসাম্য হারিয়ে তিনি রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে, পাশেই পড়ে থাকে সদ্য কেনা বিস্কুটের প্যাকেট আর পানির বোতলগুলো। পুলিশের গুলিতে শহীদ হওয়ার আগ মুহূর্তে ক্যামেরাবন্দী মুগ্ধর সেই দরদমাখা আহ্বান, ‘পানি লাগবে কারও পানি, পানি?’ এই মর্মস্পর্শী দৃশ্যটি দেশের আপামর জনসাধারণের মাঝে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। আবু সাঈদের শাহাদাতের পর মুগ্ধর এই নির্মম মৃত্যু রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়।

মুগ্ধর বাল্যকালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু নাইমুর রহমান আশিক শাহাদাতের মুহূর্তে মুগ্ধর সাথেই ছিলেন। সেদিন তিনি আর মুগ্ধ একসাথে পানি বিলি করছিলেন, ভিডিও ফুটেজে তাকেও দেখা যায় মুগ্ধর সাথে। বন্ধু আশিক মুগ্ধর শেষ মুহূর্তের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন—

১৮ জুলাই, ২০২৪ বেলা ১২ টায় ফোন কলে মুগ্ধ বলল—

মুগ্ধ : চলে আয়!

আমি : অফিস শেষ হবে আড়াইটায়, তখন বাসায় গিয়ে বাইক (মোটরসাইকেল) রেখে খেয়ে আসতেছি। বাইক নিয়ে ঝামেলায় যাব না!

মুগ্ধ : আরে মামা, আমি তোর খাওয়ার ব্যবস্থা করতেছি! আমার বাসায়ই বাইক রাখ! একসাথে বের হব! তুই আমার বাসায় আয়, তাড়াতাড়ি! তোর বাসায় গেলে তুই দেরি করবি!

এই বলে ফোন রাখল। আমি গেলাম ওর বাসায়, ফোন করার সাথে সাথেই দরজা খুলল। ভাত এনে দিল মুগ্ধ নিজেই। বুয়াকে মাঝখানে একবার রাগও করল, শুধু ডিম দিয়েই কেন খাবার দেয়া হলো! আমি বললাম, 'বাদ দে, বাসায় কেউ নাই, যা পারছে দিসে।' খেয়ে তাড়াতাড়ি রওনা হতে বললাম, 'ফরমাল প্যান্ট পরেই যামু?'

স্নিগ্ধ বলল, 'এমনিতে যাস না, তোকে তো ছাপড়ি লাগতেসে!' আমি বললাম, 'তোর প্যান্ট দে একখান!' মুগ্ধ হেসে বলল, 'যে সাইজ পড়স, আমাদের প্যান্ট তোর হবে? আচ্ছা, এইটা দেখ, হয় কি না'

মুগ্ধর দেয়া প্যান্ট পরেই বের হচ্ছি, পায়ে মুগ্ধের স্যান্ডেলও, কারণ আমি অফিস থেকে ফরমাল প্যান্ট পরেই আসছিলাম। বের হওয়ার সময় স্নিগ্ধ হেসে বলল, 'তোরা আসলেই যাইতেছিস?'

মুগ্ধ : হ্যা! যাইতেছি, তুই স্পাইনলেস যাইতে পারতেসোস না!

স্নিগ্ধ : (হাতের ব্যান্ডেজ দেখিয়ে) সুস্থ থাকলে আমিও বের হইতাম। (স্নিগ্ধ ২ দিন আগে বাইক এক্সিডেন্ট করেছে)

আমরা বের হয়ে রিক্সায় মামাকে জিজ্ঞেস করলাম মামা, আন্দোলন কোন দিকে হচ্ছে? রিক্সাওয়ালা মামা বলল আজমপুরে মারামারি লাগছে!

আমি : মুগ্ধ, যাবি?

মুগ্ধ : ভিডিও দেখলাম, হাউসবিল্ডিংয়েও গেঞ্জাম! আচ্ছা, চল যাই।

রিক্সায় চলতে চলতে দেশের পরিস্থিতি এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল থেকে ছাত্রছাত্রীদের বের করে দেয়ার ব্যাপারে হতাশা প্রকাশ করল মুগ্ধ। আজমপুর পৌঁছাতে না পেরেই মুগ্ধ বলল, 'এ কী অবস্থা! এইটা তো পুরা মুভির মতো দেখতেছি!'

আমি : 'না, গেমসে ওয়ারজোনগুলা এমন দেখায় না?'

মুগ্ধ : 'হ্যা! হ্যা!!'

আমরা একটু সামনেই দেখলাম, গুলির স্প্লিন্টারের আঘাতে আহত ছাত্রদের মানুষ কোলে করে নিয়ে যাচ্ছে। কারোর মুখ ফেটে রক্ত বের হচ্ছে, কারো পিঠ ঝাঁঝরা হয়ে গেছে! পরক্ষণেই রিক্সার ভাড়া দিয়ে মুগ্ধকে বললাম, 'ধর, হাসপাতালে নিতে সাহায্য করি!' এরপর দুইজন মিলে বেশ কয়েকজনকে হাসপাতালে নিলাম। মাঝখানে আলাদা হয়ে গেলে আবার কল করে বলল, 'কই, তুই? আলাদা হইস না! ফ্যামিলি নিডস (ডিপার্টমেন্টাল স্টোর)-এর সামনে আয়, আমি দাড়াইছি।' একসাথে হয়ে আমির কমপ্লেক্সের দিকে চললাম! পরিস্থিতির ভয়াবহতা দেখে মুগ্ধ আমাকে বেশ কয়েকবার সাবধান করল, 'কীরে! সামনের দিকে যাস না! এদিকে আয়!'

এদিকে খবর পাইসি, IUBAT এর এক বন্ধু দীপিত দাস এর গায়ে বেশ কিছু স্প্রিন্টার ও রাবার বুলেট লাগসে, এখন মসজিদে অবস্থান নিয়েছে। মুগ্ধ বলল, 'চল, যেয়ে দেখে আসি!' আমরা গেলাম। মুগ্ধের সেদিন প্রথম দেখা দীপিতের সাথে, কিন্তু মনে হলো, সে ওর অনেক কাছের বন্ধু। সবকিছু দেখে মুগ্ধ আবার জিজ্ঞেস করল, 'ভাই, আপনার কিছু লাগবে? পানি আইনা দিব? নাইলে চলেন, আপনারে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাই!' দীপিতের সহজ উত্তর, 'আমি ঠিক আছি ভাই!'

আমরা আবার বের হলাম। এর মধ্যে মুগ্ধর সাথে জাকিরের কথা হয়। জাকিরের সাথে দেখা করতে গিয়ে আমরা পুলিশি আক্রমণের শিকার হলাম। পুলিশের ছোঁড়া টিয়ারশেলের ধোঁয়া আসছিল, চোখ, নাক জ্বলছিল। দম বন্ধ হয়ে আসছিল! মুগ্ধ আমাকে ফোন দিয়ে বলল, 'কই, তুই? আমি 'ইষ্টি কুটুম' কমিউনিটি সেন্টার-এর সামনে আছি, আয়!' দেখলাম, মুগ্ধের হাতে এক কেইস পানির বোতল আর অনেকগুলো বিস্কিটের প্যাকেট! আমাকে বলল, 'সামনের দিকে ঝামেলা, ওইদিকে যাস না! এখানে থাক!'
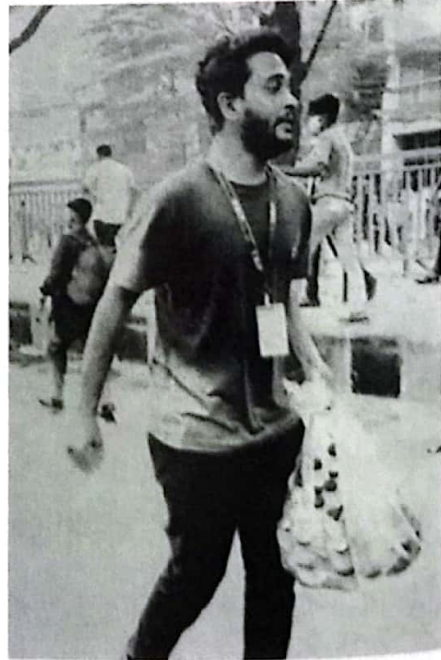
ছবি : মুগ্ধ বিক্ষোভকারীদের হাতে পানির বোতল তুলে দিচ্ছিলেন, এর কিছুক্ষণ পরই তিনি মারা যান।

আমিও দুর্বল আর ক্লান্ত হয়ে, কথামতো মুগ্ধকে বললাম, 'যেই পরিস্থিতি, আজকে তুই রাতে আমার বাসাতেই থাক! যাস না! জাকিরকেও রেখে দিবনে!'

আমি : 'তুই বললেই হইল? আমার অফিস আছে না? সকালেই অফিসে যাইতে হবে!'

মুগ্ধ : 'আর তো, তোর ড্রেস তো বাসায় আছেই! আমার বাসা থেকে সকালে যাস!'

আমি : 'দেখা যাক!'

এক পর্যায়ে আমরা ইষ্টি কুটুমের মুখোমুখি হয়ে রোড ডিভাইডারের ওপর বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। জাকির বলল, 'আমার আর মুগ্ধর একটা ছবি তুলে দে!' আমি ওদের দুজনের ছবি তুললাম মুগ্ধের ফোন দিয়ে, ঠিক বিকেল ৫:৪৬ মিনিটে। কিছুক্ষণ পর, হঠাৎ সবাই আমির কমপ্লেক্স আর রাজউক কমার্শিয়াল এর দিকে দৌড়ে আসলো! আমরা ভাবলাম, এবার দৌড়াতে হবে!

দৌড়াতে দৌড়াতে, কিছুক্ষণ পর আমার সামনে দেখলাম, জাকির আগে দৌড়ে গেছে। কিন্তু আমার পাশে মুগ্ধ ছিল না! থেমে গেলাম, পেছন ফিরে তাকাতেই দেখি, মুগ্ধ বসা অবস্থায় মাটিতে পড়ে গেছে, চোখ দুইটা বড় করে আমার দিকে তাকাচ্ছে। হাতে সেই অবশিষ্ট বিস্কুট আর পানির বোতলের পলিথিন, কপালে গুলির স্পষ্ট চিহ্ন। আমি চিৎকার করলাম, 'জাকির, মুগ্ধ গুলি খাইসে!'

গোলমাল শুরু হয়ে গেল! মাথা কাজ করছিল না! শরীর নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছিল! একবার মনে হলো, মুগ্ধের কাছে যাওয়ার আগেই আমাকেও হয়তো গুলি করবে! তবুও আমি দৌড়ে মুগ্ধের কাছে গিয়ে তাকে তুলে ধরতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু একা পারছিলাম না। পাশে কেউ সাহস করে আসলো, চেহারা মনে নাই! আমরা মুগ্ধকে কোলে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যেতে লাগলাম!

রিক্সায় বসে, শরীরে কোনো শক্তি ছিল না! মুগ্ধের রক্তে ভেজা শরীর! কেউ একজন বলল, 'কপাল দিয়ে রক্ত পড়তেছে, কপালটা ধরেন!' আমার হাতে শক্তি না থাকায়, গাল দিয়ে মুগ্ধের কপাল চেপে ধরলাম, যেন রক্ত না বের হয়। (একটু আগেই, মুগ্ধ আমার সাথে আহতদের হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল, এখন আমি নিজেই মুগ্ধকে কোলে নিয়ে যাচ্ছি)। বন্ধু হয়ে, প্রাণপ্রিয় বন্ধুর মাথায় গুলি লাগা অবস্থায় কোলে নিয়ে, অসহায়ের মতো ভাবছিলাম, 'এখন আমি কী করব? কী করলে মুগ্ধ ঠিক হয়ে যাবে?' ইমারজেন্সিতে নিয়ে গিয়ে, বেডে রেখে এক কোণায় মাটিতে বসে পড়লাম। স্নিগ্ধর কাছে কল করে বললাম, 'মুগ্ধ গুলি খাইছে, তাড়াতাড়ি ক্রিসেন্ট হাসপাতালে আয় ভাই!' স্নিগ্ধ আসলো, দেখতে দেখতে আমার পাশে বসে গেল। মুগ্ধর মাথায় ব্যান্ডেজ করা, বেডে শোয়ানো।

কিছুক্ষণ পর ডাক্তার বলল, 'পালস পাচ্ছি না।' স্নিগ্ধ বলল, 'কী বলেন? আবার চেক করেন আমাদের সামনে!' ডাক্তার কনফার্ম করল! তখন আমি বুঝলাম! মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল! স্নিগ্ধ আমাকে ধরে কান্না করল, 'ভাই প্লিজ! আরেকবার দেখেন না!' ওই দিনের প্রতিটি সেকেন্ড আমি জীবনের মতো অনুভব করি। প্রতিটি মুহূর্ত যেন কিছু ঘণ্টার সমান ভার বহন করে! হয়তো একটুও দেরি করলে আজকে আমি মুগ্ধের সাথেই থাকতাম। কিন্তু এই স্মৃতি... ক্লাস সিক্স থেকে শুরু করে এত পথ একসাথে চলা, শেষমেশ পাশে বসে থেকেও কিছুই করতে পারলাম না!

২০ জুলাইয়ে আমরা বন্ধুরা একত্রিত হয়ে টাঙ্গুয়ার হাওরে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলাম! টিকিট ও বোটসহ সব কনফার্ম করা ছিল! মুগ্ধই সব ব্যবস্থা করেছিল। সেদিন বিকেলে মুগ্ধ বারবার বলছিল, রাতে যেন তার বাসাতেই থাকি। আমি তার কথামতো রাতে ওর সাথেই ছিলাম, কিন্তু মুগ্ধ আর আমাদের মাঝে ছিল না। মুগ্ধ তখন হয়ে গিয়েছিল এক নিঃশব্দ লাশ।

১৯৯৮ সালের ৯ অক্টোবর ঢাকার উত্তরায় জন্মগ্রহণকারী মীর মুগ্ধ ছোটবেলা থেকেই স্পষ্টবাদী, দায়িত্বশীল ও পরোপকারী ছিলেন। তার পিতার নাম মীর মোস্তাফিজুর রহমান এবং মায়ের নাম শাহানা চৌধুরী। তিন ভাইয়ের মধ্যে মুগ্ধ ও তার জমজ ভাই মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ ছিলেন একে অপরের ছায়া।

বড় ভাই মীর মাহমুদুর রহমান দীপ্ত বলেন, 'আমাদের তিন ভাই-ই ছোটবেলা থেকে দেশ ও সমাজের প্রতি আগ্রহী ছিলাম। মুগ্ধর স্বপ্ন ছিল দেশের ৬৪টি জেলার প্রতিটি সার্কিট হাউসের সামনে তার প্রিয় বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে ছবি তোলা। ও এ উদ্দেশ্যে একটি ব্লগিং পেজ শুরু করেছিল এবং ইতোমধ্যে ৩৪টি জেলা ঘুরে এসেছিল।'

মুগ্ধ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিত বিষয়ে স্নাতক শেষ করেন। স্নাতকোত্তরের জন্য তিনি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসে (বিইউপি) এমবিএ-তে ভর্তি হন এবং ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষার জন্য নেদারল্যান্ডসে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন। মুগ্ধ তার লেখাপড়ার পাশাপাশি ফ্রিল্যান্সিংয়ে দারুণ সফল ছিলেন। তিনি প্রতি মাসে আড়াই থেকে তিন হাজার ডলার আয় করতেন এবং এই আয়ের একটি বড় অংশ দান করতেন।

চতুর্থ শ্রেণি থেকেই মুগ্ধ ও স্নিগ্ধ স্কাউটিং করত বলে জানান দীপ্ত। এ ক্ষেত্রে বাবা উৎসাহ দিতেন। বাবা সীমিত আয়ের মধ্য থেকেই অর্থ দিতেন ক্যাম্পিংয়ে যেতে আর দুর্গতদের সাহায্য করতে। মুগ্ধ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন স্কাউট গ্রুপের

ইউনিট লিডার ছিল। ২০১৯ সালে বনানী এফআর টাওয়ারে অগ্নিকাণ্ডের সময় উদ্ধারকাজে সহায়তা করায় বাংলাদেশ স্কাউট থেকে 'ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড' অর্জন করে মুগ্ধ।

অন্যের উপকার করার ক্ষেত্রে মুগ্ধর ছিল সবিশেষ আগ্রহ। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ও হলে থাকত। এক জুনিয়র শিক্ষার্থীর আর্থিক সমস্যার কারণে থাকার জায়গার সমস্যায় পড়েছিল। এটা জানার পর মুগ্ধ সেই ছাত্রের থাকার জন্য নিজের হলের সিট ছেড়ে দিয়েছিল। মুগ্ধ ফ্রিল্যান্সিং থেকে আয় করত, তাই সে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে একটি রুম ভাড়া নিয়ে থাকা শুরু করে।

দীপ্ত বলেন, আমরা তিনজনই খেলাধুলা পছন্দ করি। মুগ্ধ খুবই ভালো স্পোর্টসম্যান। মুগ্ধ ও স্নিগ্ধ ডিভিশনাল ফুটবল খেলেছে। দুটো ফুটবল ক্লাবের হয়ে নিয়মিত খেলত তারা।

বাংলাদেশের সাধারণ ধর্মভীরু মধ্যবিত্ত পরিবারে বেড়ে ওঠে মুগ্ধ । দীপ্ত বলেন, 'আম্মার হেয়ারিং এইডের প্রয়োজন পড়ে, তিনি বাসায় থাকলে এটি ব্যবহার করেন না। সে কারণে একটু কম শুনতে পান। তো আম্মা যাতে মনে কষ্ট না পান, সে কারণে বাসায় থাকলেই মুগ্ধ নিয়ম করে তার কাছে গিয়ে বলত, 'আম্মু নামাজের সময় কি হয়েছে? তখন আম্মু ঘড়ি দেখে বলত, হ্যাঁ নামাজের সময় হয়েছে, নামাজ পড়ব।'

মুগ্ধ ছিল পরিবারের মধ্যমণি, সবার প্রিয়। তার বড় ভাই দীপ্ত বলেন, 'মুগ্ধ মায়ের খুব ক্লোজ ছিল। আমাদের তিন ভাইয়ের সমপরিমাণ টাকা মায়ের হাতে তুলে দিতে হতো মাসের শুরুতে। আমরা দুই ভাই যা দিতাম তার সঙ্গে আরো ৫ থেকে ৭ হাজার টাকা মায়ের হাতে তুলে দিয়ে বলত, 'ভাইয়া আর আব্বু যেন না জানে, এটা তোমার হাত খরচ।'

পরিবারের শেষ ইচ্ছা ছিল উত্তরার চার নাম্বার সেক্টরের করবস্থানে মুগ্ধকে দাফন করা, যেখানে দাদা-দাদীকেও কবর দেয়া হয়েছিল। করবস্থান বাসার কাছাকাছি থাকলে প্রতি মাসে ভিজিট করে দোয়া করার সুযোগ থাকবে। কিন্তু তৎকালীন ফ্যাসিবাদী সরকারের ভয়ে কবরস্থান কর্তৃপক্ষ মুগ্ধর দাফনের অনুমতি দেয়নি। অবশেষে টঙ্গির কামারপাড়া কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

তথ্যসূত্র :

১. নাইমুর রহমান আশিক: মুগ্ধর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী।

২. মাহমুদুর রহমান (দীপ্ত): মীর মুগ্ধর বড় ভাই।

৩. মীর মুগ্ধকে হত্যা করার ভিডিও: https://tinyurl.com/3h5fpx2d

স্মার্টফোনে নীচের দেয়া QR code স্ক্যান করে সরাসরি ভিডিও দেখা যাবে—

তথ্য সংগ্রহে:

ড. মোহাম্মাদ সরোয়ার হোসেন, মোঃ নাহিদ হাসান সজীব;

স্টোরি মেকিং: ড. মোহাম্মাদ সরোয়ার হোসেন

কই চইলা গেল আমার পোলা

শহীদ ইবরাহীম খলিলের মায়ের বক্তব্য হুবহু তুলে দেয়া হলো—

আমার ছেলে ইবরাহীম খলিল মাদরাসায় লেখাপড়া করত। ১৭পারার হাফেজ হইছিল। ১৮ পাড়া পড়তেছিল। মাদরাসা থেকে ছুটি নিয়া দুই দিনের জন্য বাড়ি আইছে, কারণ ওর শরীর ভালো ছিল না। সেদিন শুক্রবারের দিন, জুলাই মাসের ১৯ তারিখ। তখন অনেক গণ্ডগোল হইতেছে।

শহীদের নাম: হাফেজ ইবরাহীম খলিল
বয়স: ১৩ বছর ৪ মাস (জন্ম-১৪ মার্চ ২০১১)
মৃত্যুর তারিখ: ১৯ জুলাই ২০২৪
পিতা: মোঃ হানিফ
মাতা: সকিনা বিবি
ঠিকানা: হাজী বাদশা মিয়া রোড, মাতুয়াইল,
ডেমরা, ঢাকা
শিক্ষা: কুরআনের হাফিজ (১৭ পারা), বাইতুস সুজুদ জামে মসজিদ ও মাদরাসা, সাইনবোর্ড, ঢাকা।

সংসারের খরচ আমার চালাইতে হয়। তাই আমার কাজ করতেই হয়। ওদের নিয়া আমি বইসা থাকতে পারতাম না। আমি ওরে কইছি, 'বাবা, তুমি কোথাও যাইও না, আমি তো কাজে যাইতেছি, ডিউটিতে যাইতেছি।' -কাজে যাও, আমি কোথাও যামু না'—এই কথা বলল। এই কথা সকাল নয়টার দিকে। নাস্তাপানি দিছি, ভাত দিছি, কিন্তু সে ভাত খাইল না। নরমাল খানা ছিল, তাই খাইল না।

-মা, শাক দিয়া ভাত খামু না, আজকে ভাল্লাগতাছে না।' শরীরডাও এমনে ওর খারাপ ছিল। তখন সে ভাত খাইল না। পুঁইশাক ভাজি করছিলাম আর ভাত রান্না করছিলাম। আমি কইলাম, 'আমি এইহানে রাখতেছি। তুমি কিছুক্ষণ পরে খাইয়ো।'

আমার আগেই সে ঘর থেকে বের হইয়া গেছে। ওই বের হইয়া গেলে আমি সব কিছু গোছগাছ কইরা বের হইয়া সামনে আমার এক বোনের বাসা আছে, ওইখানে গেছি। ওইখানে যাওয়ার পরে দেখি, আমার যাওয়ার আগেই সে তার খালার বাসায় যাইয়া, ওর খালার সাথে আর খালুর সাথে অনেক খেলাধুলা আর পাড়াপাড়ি করতেছে।আমি যাইয়া তারে একটা ধমক দিলাম, 'তুমি এত বড় ছেলে, তুমি এইভাবে খালুর সাথে খেলাধুলা করবা? মানুষে খালুর সাথে এইভাবে খেলাধুলা করে?'

তখন সে দৌড়াইয়া আইসা আমার মুখ চাপা দিয়া ধইরা বলল, 'মা, তোমারে না বলছি, তুমি খারাপ কথা বলবা না, তুমি অভদ্র কথা কইলা কে?'

আমি কইলাম, 'না বাবা, আর কমু না। খালুর সাথে এইরকম কইরা খেলে?' এই কথা বইলা আমি আইসা খাটের ওপর বইসি। বসার সাথে সাথে সে আমার ডাইন পাশে আইসা আমার ঘাড় ধইরা যাইত্তা বসল। ওর খালায় আমারে একটু নারকেল দিল, নারকেলটা আমার হাত থেকে সে নিয়া খাইয়া ফেলল। নেওয়ার পর আমি নারকেলটা তারে দিয়া দিলাম। সে এই নারকেলটুকুই খাইছে। সারাদিন আমার হাতের আর কিছু খায় নাই। তখন আমি তার মাথায় হাত দিয়া, হাতে ধইরা বুঝাইয়া বললাম, 'বাবা, তুমি কোথাও যাইও না। তোমার খালার এইখানে খেল, গেইটের সামনে।' সে বলল, 'আচ্ছা, যামু না। তখন আমি ওরে রাইখা কাজে গেছি।

এই এলাকায় (হাজি বাদশা মিয়া রোড, মাতুয়াইল, ডেমরা, ঢাকা) আমরা অনেক দিন ধইরা থাকি। কাজ থেইকা দৌড়াইয়া বাসায় আইসা দেখি আড়াইটার মতো বাজে। পোলায় গোসল কইরা প্যান্টটা, গেঞ্জিটা ফালাইয়া রাইখা গেছে। পাঞ্জাবি পইড়া নামাজে গেছে। নামাজ থেইকা আইসা পাঞ্জাবিটা উল্টাভাবে খুইলা চৌকির উপরে ফালাইয়া রাইখা, সে কই জানি গেছে। তারে আর পাই না।

ওইদিন, মিথ্যা কথা বইলা লাভ নাই, আমার ঘরে একটুও চাল ছিল না। তখন চিন্তা করলাম, কিছু আটা আছে, তাইলে পরোটা বানাইয়া দিমু। দুইডা পোলার একটাও বাসায় নাই। বড় পোলা মাদরাসায়, ছোট পোলাডা ঘরে আছিল, এহন নাই। বড় পোলাডা মাদরাসায় পড়ে, কোরআনের হাফেজ। এখন মাওলানা পড়তেছে। দুই পোলা একই মাদরাসায় পড়ত। তখন কী করলাম? আমার মনে একটু রাগ আসল। বড় পোলাপানের কাপড়-চোপড় এখনো আমার ধুইতে হয়। মাইনষের বাড়ি কাম কইরা আই। মনে মনে রাগে গিজগিজ কইরা কাপড় চোপড় ধুইলাম, কিন্তু চিপলাম না, নামাজে দাঁড়াইয়া গেলাম।

তিনটার কাছাকাছি বাজে, জায়নামাজে দাঁড়াইতেই দেখলাম আমার পোলা ইবরাহীম খলিল আসতেছে। জানালা দিয়া দেইখা মনে মনে কইলাম, 'আরে, আইসা তো দুইখান ভাত চাইব!' ভাবলাম, যাক, নামাজে দেখলে আর চাইব না; একটু খাটে বইব। এই চিন্তা কইরা নামাজের নিয়ত বাঁইধা নিলাম। ও আইসা দরজাডা একটু ফাঁক কইরা খালি আমারে এক পলক দেখল যে, আমি নামাজে দাঁড়াইয়া আছি। ঘরে ঢুকল না। আমারে ঠিকই দেইখা চইলা গেল, কিন্তু আমি পোলার মুখটা দেখতে পারলাম না। চার রাকাত নামাজ শেষ কইরা চারদিকে দেইখা রাস্তায়ও খুঁইজা পাইলাম না। নামাজের টাইম যাইতাছে, তাই আবার বাকি নামাজ পড়তে বইলাম। আল্লাহ আমারে ভুলাই রাইখা দিছে। নামাজ শেষে অনেক কান্না করছি। আজকে নামাজের ভেতর খালি কান্নাই আইতাছে। পরে জায়নামাজেই একটু ঘুমাইয়া গেলাম। কামের শরীর আর কান্নাও করছি একটু বেশি, শরীর কাহিল হইয়া গেছিল।

হঠাৎ চারটার দিকে জাইগা উঠলাম। দেখি চারটা বাইজা গেছে! তাড়াতাড়ি খুঁইজা দেখলাম পোলা দুইডা কই আছে—ওরাও খাইল না, আমিও খাইলাম না। পাশের বাসা থেইকা দুই পট চাল নিয়া আইসা রান্না বসাই দিলাম। রান্না বসানোর পরও পোলাডা আর আমার কাছে আইল না।

আসরের আজান দিছে, ভাবলাম আসরের নামাজটা পড়ি আগে। তরকারি রান্না করতে গেলে নামাজের টাইম শর্ট হইয়া যাইব। আসরের নামাজটা পড়া শুরু করলাম, নামাজের মাঝখানে একটা ফোন আইল। সালাম না ফিরাইয়াই ফোনটা ধরলাম। মনে একবার চিন্তা আসল, আরে ইবরাহীমরে যে অনেকক্ষণ ধইরা দেহি না। কে ফোন দিল, জানি না। ফোন ধরলাম।

ফোন ধরতেই শুনি, 'আন্টি, আপনি কি নাম্বারটা চিনেন?' মনে মনে ভাবছি, ইবরাহীম তো না। কইলাম, 'বাবা, তোমরা কী কইবা বলো, নাম্বার চিনি।' তখন কইল, 'আন্টি, মনে কষ্ট নিয়েন না, আমনের ছেলেডা মারা গেছে। ঢাকা মেডিকেলে লাশ।' আমি এক চিৎকার দিয়া দৌড় দিছি, সোজা বড় ছেলের মাদরাসায় গিয়া হাজির। মাদরাসায় যাইয়া এক ছেলেরে কইছি, 'ইবরাহীম মারা গেছে, তোমরা যাইয়া আমার বড় পোলাডারে একটু বলো।'

মাদরাসার একটা ছেলে দৌড়াইয়া গিয়া আমার বড় পোলারে কইছে। বড় পোলার হাতে খালি মোবাইলডা দিয়া কইলাম, 'এই নাম্বারে যোগাযোগ কর।' আর কিছু কইতে পারি নাই। মাদরাসার মধ্যে পইড়া গেছি।

বড় পোলা তহন কইতেছে, 'মা, তুমি যদি সুস্থ হইয়া কথা না বলো, আমি কই যামু এই গণ্ডগোলের মাজে?' আমি কইলাম, 'এই মোবাইলে কল দেও।' বড় পোলায় কল দিয়া কথা বলল।

বড় ছেলে প্রথমে দৌড় দিয়া মহিলা মাদরাসা (তামিরুল মিল্লাত মহিলা মাদরাসা, মাতুয়াইল, ডেমরা) মোড়ে গেছে। সেই লোকে ফোনে কইল, 'আপনে ঢাকা মেডিকেলে চইলা আসেন, আপনার ভাইয়ের লাশ ঢাকা মেডিকেলে আনা হইছে।' তখন ছেলে আমার কেমনে যাইব! সিএনজি-গাড়িও চলে না। একটা রিকশা ডাইরেক্ট ঢাকা মেডিকেলের দিকে নিছে। ছেলে মেডিকেলে যাওয়ার পর তার হুজুরকে(ফারুক হুজুর) কল দিয়া সব জানাইছে। তখন হুজুর জিজ্ঞাসা করছে, 'তোমার সাথে টাকা আছে কিনা?' তখন ছেলের কাছে তেমন টাকাও ছিল না। হুজুর বিকাশ নাম্বার চাইয়া নিয়া তার মোবাইল থেইকা পাঁচ হাজার টাকা পাঠাইয়া দিল। আর কইল, 'এইডা থেইকা যা লাগে, খরচ করো; পরে আমি আরও পাঠাইতাছি।' পরে গিয়া লাশ খুঁইজা বাইর করছে। লাশ দেখাইছে—এইডা ইবরাহীম খলিলের লাশ। লাশ দেইখা সব কিছু কইরা রাত বাজল প্রায় নয়টা। তখন বড় ছেলে ফোন দিল, 'আম্মু, তুমি কান্না থামাও, সুস্থ হও। আর ওইখান থেইকা কাউরে লইয়া তোমার আইডি কার্ড নিয়া আসো। আইডি কার্ড ছাড়া লাশ নিতে পারুম না।' আমি তখন কান্না করতাছি।

বাড়িওয়ালি মহিলারে লইয়া একটা সিএনজি ভাড়া কইরা সাইনবোর্ডের দিকে গেলাম। সাইনবোর্ডে গিয়া দেখি, ছাত্ররা রাস্তা বন্ধ কইরা রাখছে, যাইতে দিব না। কইলাম, 'আমার পোলাই তো গুলিতে মারা গেছে।' তারা শুনে রাস্তা ক্লিয়ার কইরা দিল আর একটা কাগজে লেইখা দিল যে এভাবে যাইতে। আমরা সেই কাগজটা দেখাইতে দেখাইতে গেছি। অনেকখানে আটকাইছে, কিন্তু কাগজটা দেখাইছি আর কান্না করছি, তহন আমাগো যাইতে দিছে। ঢাকা মেডিকেলে যাইতে যাইতে এগারোটা বাইজা গেল। তখন হাসপাতালের লোকেরা কইল, 'বারোটা বাজলে কারফিউ, এখানে থাকাও যাইব না, কিছু করাও যাইব না' ওইখানে লাশটা রাইখা আমরা চইলা আসলাম। আসার সময় তারা কইল থানার পারমিশন লাগবে।

ছবিঃ শহীদ ইবরাহীম খলিলের নিথর দেহ

পরের দিন ভোর সকালে বড় ছেলে থানায় গিয়া পারমিশন নিয়া মেডিকেলে গিয়া দেখে, অনেক সিরিয়াল পড়ছে পোস্টমর্টেমের। সারাদিন পার হইতে থাকল, মানুযে অনেক টাকা ঘুষ দিয়া আগেই লাশ বাইর কইরা নিল। আমার ছেলের তো টাকা ছিল না, ঘুষ দিতে পারে নাই। আমাগো টাকা না থাকায় সিরিয়ালে নাম পাই নাই, তাই সবার শেষে কইরা দিল। রাত সাড়ে আটটার দিকে আমার ছেলের লাশ নিয়া বাড়িতে ফিরলাম। নয়টার সময় জানাজা হওয়ার পর মাতুয়াইল কবরস্থানে দাফন হইল।

আমার ইবরাহীমরে যারা ঢাকা মেডিকেলে পাঠাইছে, তারা আমার বড় ছেলের কাছে কইছে যে, সাইনবোর্ড এলাকায় যখন আন্দোলনকারীদের সাথে পুলিশের ধাওয়া পাল্টা-ধাওয়া হয়, তখন এক পর্যায়ে আন্দোলনকারীরা সবাই পুলিশকে ধাওয়া দিলে, পুলিশ পাশের ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়। এরপর পুলিশ হঠাৎ গুলি করা শুরু করলে আন্দোলনকারীরা পেছনের দিকে দৌড় দেয়। ইবরাহীমও দৌড় দিলে পিছন দিক থেকে ওর মাথায় গুলি লাগে। আমার ইবরাহীমসহ আরও কয়েকজন পইড়া যায়। পরে পুলিশ সরে গেলে অন্যরা ইবরাহীমরে ঢাকা মেডিকেলে পাঠাইছে।

দুই ছেলের জন্মই এই এলাকায়। বড় ছেলে হাফেজ মো. ইয়াকুব আলী সাগরের বয়স ২০ বছর, আর ছোট ছেলে ইবরাহীম খলিলের বয়স ১৪ বছর বয়স ছিল। বড় ছেলের সাত বছর, ছোট ছেলের তিন মাস বয়স থেকে একাই লালন পালন করতেছি। বহুত কষ্ট কইরা দুই ছেলেরে লেখাপড়া শিখাইছি। ওই সময় আমারে কেউ বাচ্চা নিয়া কাম দেয় না। তখন আমি এক ঘি তৈরির কারখানায় যাইয়া বলছি, 'দেখেন বাচ্চার বাবা নাই, আমারে কেউ কাজ দেয় না। আপনেরা কাউরে যদি ছয় হাজার টাকা বেতন দেন আমারে তিন হাজার টাকা বেতন দিবেন। কাউরে যদি তিন হাজার টাকা বেতন দেন আমারে পনেরো শো টাকা বেতন দিয়েন। আমি একটু ডাইল ভাত খাইয়া পুলাপান দুইডারে মানুষ করতে পারমু।' মালিক বলল, আহারে! মহিলা এতো অসহায় হইছে। ম্যানেজাররে বলল, 'ঠিক আছে, ওরে একটা কাজ দেও, মানুষের অর্ধেক কাজও কি এই মহিলা করতে পারব না? পারব।' আমারে ঘি প্যাকেজিং-এর কাজ দিছিল মাসে আড়াই হাজার টাকায়। এই আড়াই হাজার টাকায় আমি খাইতাম, বাসা ভাড়া দিতাম। ওই সময় বাসা ভাড়া কম ছিল।

আমার বড় ছেলে কিতাব বিভাগে পড়াশোনা করত। ছোট ছেলে মারা যাওয়ার পর থেকে আমি কাজকর্ম করতে পারি না। বড় ছেলে কোরআনের হাফেজ, দুই বছর মাওলানা পড়ল। এহন আর লেখাপড়া করব না। ছেলে কইছে, 'তুমি বহুত করছ। দুইডা পুলারে অনেক কষ্ট কইরা লেখাপড়া করাইছো।' এহন তো আর

আমি পারি না। কি করমু। ঘর ভাড়া দিয়া, জিনিশপত্র সবকিছুর অনেক দাম। ছেলের লেখাপড়ায় এত খরচ, সব কিছু।

ওদেরকে আমি এত কষ্ট কইরা বড় করলাম, আমার জীবনে সুখের মুখ দেখমু, দুইডা ছেলে কামাই করব, আমারে সুখ দিব, হেই সময় আমার ছেলেডা গেল হারাইয়া। আমি তো এহন এইডা মানাইতে পারিনা, দিন রাইত কান্দি, অসুস্থ থাকি। হেইলাইগা বড় ছেলে কয়, 'আর তোমার কাজ করা লাগব না। তুমি গরীব মা হইয়া আমাগো যতটুকু লেখাপড়া করাইছ আমার এতোটুকুই যথেষ্ট।' এই কারণে বড় ছেলে লেখাপড়া ছাইড়া দিল।

মাদরাসার উস্তাদরা খুজখবর নেয়। দাফনের সময় উনারা অনেক সাহায্য করছে। বেতন দুই হাজার টাকা হইলে আমাগো কাছ থেইকা পনেরো শো টাকা নিত। জানে আমি দুইটা ছেলেরে অনেক কষ্ট কইরা পড়াই। প্রথমে হেরা এক পোলার বেতন নিত। বড় ছেলের বেতন নিত ছোটটার নিত না। আস্তে আস্তে এহন মাদরাসার খানা-দানা সবকিছু দাম বেশি। বেশির যায়গায় আমার থেইকা কম নিত।

আমার ছোট ছেলে সব চাইতে ভালো ছিল। আমার ছেলের কথা আমি ভুলতেই পারি না। সে কইত, 'মা, তুমি আমাগো অনেক কষ্ট কইরা লেখাপড়া করাইছো। আমি বড় হইলে সব আমি দেখমু, তোমারে কষ্ট করতে দিমু না। কামেও যাইতে দিমু না। খালি একটু বড় হইয়া লই মা।' যদি একটু কাহিল হইতাম বা আমার একটু জ্বর আসত, তখন কপালে হাত দিয়া কইত, 'মা, তোমার তো জ্বর আইছে, তুমি আজকে কামে যাইও না।' আমারে অনেক আদর করত। অসুস্থ হইলে নিজে দৌড়াইয়া ঔষধ বের কইরা আমারে খাওয়াইয়া দিত, নাপা ট্যাবলেট আর পানি মশারির তলে নিয়া আসত। কইত, 'মা, কালকে তুমি কাজে যাইও না।' পরের দিন বাহির দিয়া ছিটকারি দিয়া তালা দিয়া যাইত, 'মা তুমি আজকে বাহিরে যাইও না, তোমারে বাইরে দিয়া লাগাই থুইয়া গেলাম।' এই রকম বলত। কাজে যাইতে দিত না। আমি কইতাম, 'কাজে না গেলে তোমাদের আমি কীভাবে খাওয়ামু?' বড় ছেলে তো কথা কম বলে। ছোট ছেলে অনেক কথা বলত। অনেক হাসি খুশি থাকত, মায়া-মমতায় ভরা আছিল আমার পোলা। মোবাইলডা ছিল দেইখা লাশ পাইছি। না হলে লাশ পাইতাম না।

ছেলে কইত, 'আমি কোরআনের হাফেজ পর্যন্ত পড়মু। হাফেজ হইয়া বিদেশ চইলা যামু। বিদেশ যাইয়া অনেক টাকা কামাইয়া তোমারে দিমু। সেই টাকা দিয়া তুমি বাড়ি করবা, আর আমি তোমারে দোতলায় রাখমু। নিচতলায় আমরা দুই

ভাই থাকুম। এখন শুধু ভাত খাই, অনেক সময় না খাইয়া থাকি, কষ্ট করি। কিন্তু হেইসময় মা, তোমারে শুধু ভাত খাইতে দিমু না। তোমারে অনেক টাকা দিমু, যা খুশি কিইনা খাইবা। টাকা জমায়া তুমি একটা বাড়ি করবা।' কই জানি চইলা গেল আমার পোলা, কোন বাড়িতে গেল তাও আর বুইঝা উঠতে পারলাম না।

বল খেলার দিকে তার অনেক আগ্রহ ছিল। মাদরাসায় কোনদিন ছুটি পাইলে, সারাদিন খেলত। আমি বকা দিতাম, কইতাম, 'রোদের ভেতর কালো হইয়া যাবি এইভাবে খেললে সারাদিন!' ও কইত, 'একদিন ছুটি পাইছি মা, একটু খেলি। কী অইব?' খালা-খালু অনেক আদর করত ওরে, তাদের সাথে অনেক দুষ্টামিও করত।

ওই এতো সুন্দর গজল গাইত। ওর কন্ঠ এতো সুন্দর ছিল। একা একাই গজল গাইত। আমার ছেলে কই যে গেল। হয়তো, হাজি বাদশা মিয়া রোডের ০২ নং রোডের সেই সাধারণ ঝুপড়ি বাসাটিতে এখনো মাঝে মাঝে শহীদ ইবরাহীম খলিলের মমতাময়ী মা শুনতে পায়, তার ছেলে গুনগুনিয়ে একা একা সুমধুর কণ্ঠে গজল গাইছে। ঘরময় তার সেই সুর অনুরণিত হয়ে হঠাৎ দপ করে নেমে আসে হিংস্র নীরবতা। বেরিয়ে আসে এক অন্তর্ভেদী দীর্ঘশ্বাস।

তথ্যসূত্র

১. হাফেজ ইবরাহীম খলিলের মা এবং ভাই (হাফেজ মোঃ ইয়াকুব আলী সাগর)-এর সাক্ষাৎকার

তথ্য সংগ্রহে:

মোঃ কামরুজ্জামান, মোঃ নাহিদ হাসান সজীব;

স্টোরি মেকিং: মোঃ কামরুজ্জামান এবং ড. মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন

আমার আসতে দেরি হলে তোমরা খেয়ে পড়তে বসো

শহীদের নাম: হাফেজ মাসুদুর রহমান
বয়স: ৪১ বছর (১ জানুয়ারি ১৯৮৩)
মৃত্যুর তারিখ: ১৯ জুলাই ২০২৪
পিতার নাম: মো. ওলিউল্লাহ
মাতার নাম: আনোয়ারা বেগম
ঠিকানা: অর্জনতলা, বরুড়া, কুমিল্লা
শিক্ষা: জালালাইন (হাফেজ)

বাবা পরামর্শ দিলেন, 'রাস্তায় থাকিস না, বাসায় চলে যা।' উত্তরে মাসুদুর রহমান বললেন, 'আচ্ছা, যাচ্ছি।'

১৯ জুলাই ২০২৪, শুক্রবার। জুমার নামাজ আদায় শেষে শহীদ হাফেজ মাসুদুর রহমান উদ্বেগের সুরে বাবাকে ফোন করে বললেন, 'আব্বা, ঢাকার অবস্থা খুবই খারাপ। চারদিকে শুধু গোলাগুলির শব্দ। মোবাইলে কান দেন, গুলির আওয়াজ শুনতে পাবেন।'

বাবা উদ্বিগ্ন হয়ে পরামর্শ দিলেন, 'রাস্তায় থেকো না, বাসায় ফিরে যাও।' উত্তরে মাসুদুর রহমান আশ্বস্ত করে বললেন, 'আচ্ছা, যাচ্ছি।'

কিন্তু বাবার সাথে কথা শেষ করেই তিনি গুলশান-বাড্ডা লিংক রোডে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সাথে একতত্রতা পোষণ করে আন্দোলনে শরীক হন। হঠাৎ পাশের একটি ভবন থেকে আওয়ামী সন্ত্রাসীদের বন্দুক থেকে ছোঁড়া গুলি সরাসরি তার বুকে বিদ্ধ হয়। মুহূর্তেই ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝড়তে থাকে, তিনি রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা দ্রুত তাকে রিকশায় করে নিকটবর্তী এইমস হাসপাতালে নিয়ে যান। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যেই তার স্ত্রী পৌঁছে যান এইমস হাসপাতালে। গিয়ে দেখতে পান তার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছেন।

শেষ বিদায়

বিকাল ৪টার দিকে শহীদ মাসুদুর রহমানের মরদেহ তার ভ্যানে করে নিজ প্রতিষ্ঠান মাদরাসাতুর রহমান আল ইসলামিয়া, মধ্যবাড্ডা, বাগানবাড়িতে আনা হয় এবং সেখানে গোসল করানো হয়। এরপর তার স্ত্রী ও সন্তানরা মরদেহ নিজ গ্রাম অর্জুনতলা, বরুড়া, কুমিল্লায় নিয়ে যান। শনিবার (২০ জুলাই) ভোর ৪টার দিকে মরদেহ গ্রামে পৌঁছায় এবং সকাল ৮টায় জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

শহীদ মাসুদুর রহমান স্ত্রী ও তিন কন্যাসন্তান নিয়ে মধ্যবাড্ডার মাদরাসাতুর রহমান আল ইসলামিয়া-এর বাসায় থাকতেন। তার সন্তানেরা হলো: হাফেজা মাহমুদা (১৪), মাহবুবা (১১), মায়মুনা (৮)। তিনি মাদরাসা তুর রহমান আল ইসলামিয়া-এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিলেন। উনার স্ত্রীও হাফেজা।

হাফেজ মাসুদুর রহমান ১ জানুয়ারি ১৯৮৩ সালে কুমিল্লার বরুড়ার অর্জুনতলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকার একটি মাদরাসা থেকে হিফজ সম্পন্ন করেন এবং পরে কওমি মাদরাসায় জালালাইন পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি নিজ প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব পালন করছিলেন। জুমার

নামাজে যাওয়ার আগে তিনি সন্তানদের বলেছিলেন, 'আমার আসতে দেরি হলে তোমরা খেয়ে পড়তে বসো।' তার এই কথাগুলো আজও তার পরিবারের হৃদয়কে দুঃখপ্লাবিত করে তোলে।

তথ্যসূত্র

১. পিতা, স্ত্রী এবং প্রত্যক্ষদর্শী (মো. ইব্রাহিম, মাদরাসের পাশের দোকানদার, বাড্ডা, ঢাকা)

তথ্য সংগ্রহে:

মোঃ নাহিদ হাসান সজীব; স্টোরি মেকিং: মোঃ নাহিদ হাসান সজীব এবং ড মোহাম্মাদ সরোয়ার হোসেন

মা-ই ছিল যার পৃথিবী

শহীদের নাম : মোঃ আশিকুল ইসলাম।
বয়স : ১৪ বছর ২ মাস (জন্ম-৭ মে ২০১০)
মৃত্যুর তারিখ : ১৯ জুলাই ২০২৪
পিতা : ফরিদুল ইসলাম
মাতা : আরিশা আফরোজ
ঠিকানা : বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা
শিক্ষা : ৯ম শ্রেণি, নিবরাস মাদরাসা, বনশ্রী, ঢাকা

মা-পাগল বলতে যা বোঝায়, আশিক ছিল ঠিক তাই। মাকে খুবই ভালোবাসত সে। কিশোর মোঃ আশিকুল ইসলাম আশিকের পুরো জগৎ বলতে ছিল তার মা এবং তিন মাস বয়সী ছোট ভাই আয়াত। মায়ের কী লাগবে, মাকে কীভাবে সাহায্য করবে, কোন কাজটা করলে লাঘব হবে মায়ের কষ্ট—এই-ই ছিল তার ধ্যানজ্ঞান।

১৯ জুলাই ২০২৪, শুক্রবার, জুমার নামাজের পর দুপুরের খাবার খেয়ে মায়ের শত বাধা সত্ত্বেও আশিক সেই যে বের হলো, আর এলো না ফিরে। কোটা সংস্কার আন্দোলনে সারাদেশে গণহত্যার প্রতিবাদে ১৯ জুলাই, শুক্রবার, বনশ্রী ও রামপুরা এলাকার মসজিদগুলো থেকে মুসল্লিরা দলবেঁধে রাস্তায় নেমে, বিক্ষোভ মিছিল করতে থাকেন। কিশোর থেকে বৃদ্ধ—সবাই যোগ দেয় সেই মিছিলে। বনশ্রী মেইন রোড ব্লক করে ছাত্র-জনতা আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে।

মিছিলের স্লোগান শুনে আর ঘরে থাকতে পারেনি আশিক। দুপুরের খাবারের পর আশিক যখন আন্দোলনের উদ্দেশ্যে বের হতে যাচ্ছিল, তখন মা তার হাত ধরে আটকাতে চেষ্টা করেন। মায়ের এক হাতে ছিল ছোট আয়াত, আরেক হাতে আশিককে শক্ত করে ধরে রেখে বলেন, 'বাবা, বাইরে যাওয়া যাবে না।' কিন্তু আশিক মায়ের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। মায়ের সাথে আশিকের শেষ কথা ছিল, 'আম্মু একটু যাই, আম্মু একটু যাই।'

আশিক যোগ দেয় সেদিনের সেই উত্তাল মিছিলে। স্লোগান ধরে, 'আমার ভাই কবরে, খুনি কেন বাহিরে? আমার ভাই মরল কেন, প্রশাসন জবাব চাই।'

শাহাদাতের পূর্ব মুহূর্ত

বিকেল চারটার দিকে বনশ্রী মেইন রোডে বিজিবি যখন গুলি ছোড়া শুরু করে, তখন আশিক ছোট ছোট বাচ্চাদের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দিচ্ছিল এবং নিজেও পিছিয়ে যাচ্ছিল। বিজিবি গুলি করতে করতে সামনের দিকে আগাচ্ছিল। যখন আশিক বনশ্রীর এক নম্বর রোড, জি ব্লকে এসে পড়ে তখন এক নম্বর রোডের চার রাস্তার মোড় থেকে ঘাতকের গুলি এসে লাগে আশিকের মাথার পেছনের অংশে। পেছন দিকে লাগার পর গুলি পুরো মাথা ভেদ করে সামনের দিক দিয়ে বের হয়ে যায়। সেই সময় আরও অনেকে বুলেটের আঘাতে আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। গুলি লাগার পর সহযোদ্ধারা আশিককে পাশের অ্যাডভান্স হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে নেওয়ার পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাকে মৃত ঘোষণা করে। শাহাদাতের সময় তার বয়স ছিল মাত্র ১৪ বছর।

ছবি : শহীদ আশিকুল ইসলামের গুলিবিদ্ধ লাশ। ঘাতকের গুলি মাথার পেছন দিক দিয়ে ঢুকে পুরো মাথা ভেদ করে সামনের দিক দিয়ে বের হয়ে যায়।

বিকালের দিকে গলির মুখে যারা আহত হয়েছে, গুলিবিদ্ধ হয়েছে, তাদেরকে আশিকের মা সহ আরও কয়েকজন নারী নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। পরে আহতদের মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। আর এদিকে মায়ের অজান্তে আশিক পাড়ি জমিয়েছে পরপারে।

সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত প্রায় নয়টা, আশিক তখনো বাসায় ফেরেনি। ও তো রাতে কখনো বাহিরে থাকে না। মা আরিশা আফরোজের মনে জেঁকে বসল ভয়, 'আমার ছেলে কেন আসছে না? আমাকে ছেড়ে ও এক মুহূর্তও বাসার বাহিরে থাকে না।' রাত নয়টার দিকে তিনি আশিককে খুঁজতে বের হলে, বনশ্রীর অ্যাডভান্স হাসপাতালে থাকা একটি বেওয়ারিশ লাশের ব্যাপারে জানতে পারেন। সেখানে গিয়ে খোঁজ নিতেই সন্তানের রক্তমাখা লাশের সন্ধান পান।

অশ্রুসিক্ত আরিশা আফরোজ কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে ছেলের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন—মাঝে মাঝে বকা দিয়ে বলতাম, 'একটু বাইরে যাও, মানুষ তো মাঝে মাঝে ঘুরতে যায়।' কিন্তু না, আশিক আমার সাথেই থাকবে। আর সে আমাকে এতো সাহায্য করত, মানে সে-ই ছিল আমার সব কিছু। সকাল বেলা দোকানটা (টেইলার্স) খুলবে, একটু ঝাড়ু দিয়ে দিবে। স্কুল-পড়াশোনার বাহিরে যেটুকু সময় পাবে, দোকানে বসবে। সেলাই এর কাজে সাহায্য করবে, লেন্স বিক্রি করে দেবে। ওর জন্য নিজের কোনো সময় ছিল না, সম্পূর্ণ সময় আমাকেই হেল্প করত। আমার আর কেউ নেই। আমি আমার মাকে কখনো দেখিনি, আমার বাবাকে হারিয়েছি ১৫ বছর আগে। এই ছেলেটাই ছিল আমার একমাত্র আপনজন।

ওর প্রাণের চেয়েও প্রিয় ছিল তার ছোট ভাই আয়াত। আয়াতকে উদ্দেশ্য করে বলত, ও হচ্ছে আমার কলিজা, আমার ছোট কলিজা।

আয়াতুল ইনতে আরবা (আয়াত) নামটিও আশিক নিজেই রেখেছিল। আয়াতকে নিয়ে খেলত, ঘুরতে যেত, খাওয়াতেও সাহায্য করত। আয়াতও যেন আশিকের কোল ছাড়া অন্য কারও কোলে যেতে চাইত না।

ও বলত, 'আম্মু, পড়াশোনা করে তো বাংলাদেশে কিছু করতে পারব না। আমাকে স্টুডেন্ট ভিসায় বাহিরে পাঠিয়ে দিও।' আমি জানতাম, আমার সেই সামর্থ্য নেই। তবুও ছেলেকে আশ্বাস দিতাম, 'বাবা, তোমাকে আমি অবশ্যই বাইরে পাঠাব। ইতালি পাঠাব, কানাডা পাঠাব, ইউরোপের কোনো দেশে পাঠাব। তুমি শুধু মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করো, আর আল্লাহর পথে চলো। মৃত্যুর কিছুদিন আগে

আশিক ৩ দিনের জন্য তাবলিগে গিয়েছিল। আশিক বনশ্রীর নিবরাস মাদরাসার নবম শ্রেণীর ছাত্র ছিল। খুব সহজেই পড়া আত্মস্থ করতে পারত। শিক্ষকরা আশিককে খুব পছন্দ করতেন।

আশিকের মা আশিকের এই আত্মত্যাগে গর্বিত। তার ছেলের মতো হাজারো শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা একটি নতুন বাংলাদেশ পেয়েছি। 'তা-ও তো আমি আমার ছেলের লাশ পেয়েছি। কিন্তু অনেকেই তো লাশই পায়নি। আমার এক সন্তানের বিনিময়ে কত হাজারো লাখো সন্তান এখন নিরাপদে থাকে' যোগ করেন, আশিকের মা আরিশা আফরোজ।

১৯ জুলাই রাত, তখন সমগ্র দেশব্যাপী কারফিউ চলছিল। নিস্তব্ধ রাতে, জনমানুষহীন রাস্তায় আরিশা আফরোজ সন্তানের লাশ নিয়ে যান দিনাজপুরে। মায়ের কাছে এই পথ যেন হাজার বছরের পথ, এই রাত যেন হাজার বছরের রাত। রাত যেন শেষই হতে চায় না। পরদিন সকাল প্রায় আটটার দিকে আশিকের লাশ দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ থানায় পৌঁছায়। জোহরের নামাজের পর জানাজা অনুষ্ঠিত হয় এবং তাকে দাফন করা হয়।

তথ্যসূত্র :

১. আশিকের মায়ের সাক্ষাৎকার

তথ্য সংগ্রহে:

মোঃ কামরুজ্জামান এবং মোঃ নাহিদ হাসান সজীব;

স্টোরি মেকিং: মোঃ কামরুজ্জামান এবং ড. মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন

'আমরা যদি না জাগি মা, কেমনে সকাল হবে'

শহীদের নাম: আব্দুল্লাহ আল-তাহির
বয়স: ৩১ বছর(১৭ এপ্রিল ১৯৯৩)
মৃত্যুর তারিখ: ১৯ জুলাই ২০২৪
পিতার নাম: মোঃ আব্দুর রহমান
মাতার নাম: মোছাঃ শিরিনা বেগম
ঠিকানা: স্টেশন রোড জাহাজকোম্পানি মোড়ে রংপুর
শিক্ষা: ইনস্টিটিউট অফ গ্লাস অ্যান্ড সিরামিক্সের, সিরামিক্স ডিপার্টমেন্টে ৮ম সেমিস্টারে অধ্যায়নরত ছিলেন

১৯ জুলাইয়ের দুপুরে ছাত্র-জনতার ঢল ছিল অপ্রতিরোধ্য। ন্যায্য অধিকার আদায়ের দাবিতে তাদের কণ্ঠে ছিল সাহসী স্লোগান আর উত্তাল ছিল রাজপথ। সেদিন রংপুর সদরে আন্দোলনের প্রথম সারিতে ছিলেন আব্দুল্লাহ আল-তাহির। তার চোখে ছিল অন্যায়ের অন্ধকারে আলো ছড়ানোর অঙ্গীকারের দীপ্তি। তার কণ্ঠে ছিল প্রতিবাদের দৃঢ় ধ্বনি—সে ধ্বনি যেন শুধু নিজেরই ছিল না; বরং ছিল পুরো জাতির। কিন্তু শান্তিপূর্ণ সেই মিছিলে নেমে আসে নির্মমতার কালো ছায়া।

স্বৈরাচার শাসকের পুলিশ বাহিনীর গুলিতে শহীদের রক্তে লাল হয়ে যায় রংপুরের রাজপথ। রংপুর রাজা রামমোহন মার্কেটের সামনে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশ প্রথমে রাবার বুলেট, পরে ছররা বুলেট এবং এরপর সরাসরি AK-৪৭ থেকে গুলি চালায়। এক পর্যায়ে পুলিশের ছোড়া গুলি আব্দুল্লাহ আল-তাহিরের শরীরে লাগে। গুলি লাগার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি।

১৯ জুলাই শুক্রবার, অন্যান্য দিনের মতোই তাহির ফজরের সালাত দিয়ে দিন শুরু করেন। সেই সকালের কথা স্মরণ করে তার মা বলেন—'তাহির ফজরের সালাত

পড়ে আবার একটু শুয়েছিল। ঘুম থেকে উঠে আমার সেলাই মেশিনে বসে জামার হাতার কুচি দেয়ার কাজ শেষ করল। পরে বলল, আম্মু, আম্মু, আসেন আপনাকে একটা সারপ্রাইজ দেখাই। আম্মু দেখেন, আপনার ভাগিনা মেহেদী ফেসবুক স্ট্যাটাসে লিখেছে— আজ থেকে আমার আইডি থেকে সব ছাত্রলীগ বিদায়। তাদের আমি ঘৃণা করি।' মেহেদীর এই স্ট্যাটাস দেখে তাহির অনেক খুশি হয়েছিল।

১৮ জুলাই আন্দোলনে গিয়ে তাহিরের শরীরে বেশ কয়েকটি রাবার বুলেট লেগেছিল। একদম চোখের কাছেও রাবার বুলেট লাগে, এতে শরীর খুব খারাপ হয়ে পড়ে। ১৯ তারিখ সকালে খাবার শেষে যখন সে আন্দোলনে যেতে বাসা থেকে বের হচ্ছিল, তখন আমি বললাম, বাবা, তুমি আজ এই শরীর নিয়ে যেও না। তুমি অসুস্থ। আন্দোলনে তো আরও অনেক মানুষ আছে।'প্রতিউত্তরে তাহির বলেন— 'আম্মু, সবাই যদি এমন করে, তাহলে কীভাবে হবে? সবার বাবা-মা সবাইকে ফোন করে বলছে বাসায় চলে যেতে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এভাবে আন্দোলন করার দরকার নেই। আম্মু, আপনিও যদি এভাবে বলেন, তাহলে (কীভাবে হবে), আপনার মুখে এসব কথা শোভা পায় না। এটা তো আমি আশা করি না।'

বাসা থেকে বের হওয়ার সময় আমাকে বলল— 'আমরা যদি না জাগি মা, কেমনে সকাল হবে? তোমার ছেলে উঠলে মাগো রাত পোহাবে তবে। আমরা যদি মাঠে না থাকি, তাহলে স্বৈরাচার সরকারের পতন হবে কীভাবে, আম্মু?' এই কথা বলে সে সকাল ১০:৩০ টায় বাসা থেকে বের হয়ে যায়। আন্দোলনে যোগ দিতে ও বন্ধুদের সঙ্গে একত্রিত হয়। বাসা থেকে বের হওয়ার পরের ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন তাহিরের বন্ধু আসিফ—

'তাহির ভাইয়া খুব অসুস্থ ছিল, কিন্তু নাজির (তাহিরের বন্ধু) আর আমি বের হব শুনে সে-ও বের হয়। খালামনি নিষেধ করেছিল ভাইয়াকে বের হতে। খালামনির বাধা উপেক্ষা করে তাহির ভাইয়া বের হয়। ইন্টারনেট নাই, কোনোদিকে কোনো তথ্য নাই। সকাল ১১টায় শাপলা চত্বরে এসে তিনজন একত্রিত হলাম। বেগম রোকেয়া ভার্সিটির দিকে গেলাম, সব ফাঁকা। মর্ডান মোড়ের দিকে গিয়েও সব ফাঁকা দেখলাম। অটো নিয়ে সোজা চলে গেলাম রংপুর জেলা স্কুলের কাছে। সেখানে গিয়েও দেখি পরিস্থিতি একদম ঠান্ডা। হাঁটা শুরু করলাম, হাঁটতে হাঁটতে নবাবগঞ্জ বাজার মসজিদে এসে জুম্মার সালাত একসাথে আদায় করলাম। নামাজ শেষে বাহিরে বের হয়ে আমাদের এক পরিচিত, জাহাঙ্গীর ভাইয়ের দোকানে আখের রস খেলাম। ভাই কখনোই আমাদের কাছ থেকে বিনিময় নেন না, জোর করলেও না।

যাই হোক, ভাইকে বিদায় দিয়ে একটি রিকশা নিলাম। উদ্দেশ্য শহীদ আবু সাঈদ চত্বর, রিকশা চড়ে যাওয়ার সময় বললাম, আওয়ামীলীগ অফিসে নাকি আগুন দিছে? আমি দেখি নাই। রিক্সাওয়ালা মামা বলল, আপনি দেখেন নাই মামা? চলেন দেখাই। দুইটা অফিসেরই অবস্থা খুবই বিধ্বস্ত ছিল। খুব খুশি হয়েছিলাম সেদিন। আবু সাঈদ চত্বরে নেমে মামাকে ভাড়া দিতে গেলে মামা ভাড়া নিল না। সেই সময়টা খুব আবেগপ্রবণ হয়ে গিয়েছিলাম। আবু সাঈদ চত্বরে নামতেই এক পরিচিত জন এসে দুই ব্যাগ খাবার দিয়ে গেল। আমি আর তাহির ভাইয়া সেই খাবার সকলের মাঝে বিতরণ করলাম। তাহির ভাইয়ের কত পরিচিত মানুষ, যেই দেখছে বুকে জড়িয়ে নিচ্ছে। তখনও আবু সাঈদ চত্বরে আমরা গুটিকয়েকজন মাত্র। ধীরে ধীরে জমায়েত বাড়তে শুরু করল। যেহেতু ইন্টারনেট বন্ধ, কোথাও কোনো প্রকার ইনফরমেশন নাই। তাই সবাই এলোমেলোভাবে ঘুরছিল। তাহির ভাইয়া বলল, ভাইয়া এদেরকে লিড দেওয়া দরকার, এখানে লিড দেওয়ার মতো কেউ নাই, চলেন লিড দেই। এরই মধ্যে খবর আসল, রংপুর সিটি বাজারের দিকে নাকি ব্যাপক গ্যাঞ্জাম লেগেছে। তাই ধীরে ধীরে সবাইকে একত্রিত করে, শহীদ আবু সাঈদ চত্বর থেকে এগোতে শুরু করলাম সিটি বাজারে দিকে।

গতকাল ভাইয়া অনেক হেঁটেছে, নাজির ভাইও ক্লান্ত, তাই একটা রিকশা নিলাম; মোটামুটি অনেক দূরের পথ। রাস্তা যেন সেদিন জনসমুদ্রে রূপ নিয়েছিল। তারপরও ভিড় ঠেলে রিকশা নিয়ে চলে গেলাম একদম সামনে। সবাই সামনে এগোতে চাচ্ছিলাম, তবে পুলিশের বাধার মুখে কেউই এগোতে পারছিলাম না। পুলিশ প্রথমে রাবার বুলেট, পরে ছররা বুলেট এবং তার পরে পরেই সরাসরি ak-৪৭ থেকে গুলি করা শুরু করে। আমরা তখন রাজা রামমোহন মার্কেটের ঠিক সামনে। ভাইয়া বারবার বলছিল আমার সাথেই থাকিয়েন। পুলিশ ধাওয়া দিলে একপাশে চেপে যাবেন।

হঠাৎ বৃষ্টির মতো গুলি শুরু হল, আমি রাস্তার পাশেই, ফার্মেসির শাটারের সাথে লেগে গেলাম, পাশ ফিরে দেখি ভাইয়া নাই। এখনই তো সাথে ছিল। এদিক ওদিক খুঁজতেই দেখি নাজির ভাই আর একজন কাকে যেন দুই হাত পা ঝুলিয়ে নিয়ে আসছে । প্রথমে বিশ্বাস হলো না। ওটা তাহির ভাইয়া? ওটা কি আসলেই আমার ভাই? নাজির ভাই, ভাইয়ার ঠিক পেছনেই ছিল। বুকটা কেমন যেন কেঁপে উঠল। ভাইয়াকে নিয়ে কয়েকজন কৈলাস রঞ্জন স্কুল রোডে চলে আসল। ভাইয়ার গায়ের খয়েরি রংয়ের শার্টটা যেন গারো খয়েরী রং ধারণ করেছে, নাভির ডানদিকে একটু

ওপরে একটা ছোট্ট ছিদ্র হয়েছে। ভাবলাম খুব কাছ থেকে রাবার বুলেট লেগেছে হয়তো। অঝোরে কাঁদছিলাম আর ভাইয়াকে বলছিলাম, আপনি কেন এত সামনে গেলেন ভাইয়া? ভাইয়ার মুখে তখন তৃপ্তির হাসি। বলে বোঝাতে পারব না, কতটা তৃপ্তির ছিল সে হাসি। আর মুখে অনবরত কালেমা পড়েই যাচ্ছেন। সবাই একটা রিকশায় আমাদের তুলে দিল, রিকশায় আমি আর নাজির ভাই উঠলাম। রিক্সায় উঠে ভাইয়ার রুমালটা পেটে চেপে ধরলাম, কিন্তু ঘুরিয়ে দিতেই অবাক হয়ে গেলাম, পিঠের ঠিক বাম দিকে অনেক বড় একটা ছিদ্র হয়েছে। তখন বুঝতে পারলাম, এটা রাবার বুলেট নয়, বরং AK-৪৭-এর বুলেট, ভাইয়ার পেট ফুরে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। হায় কি রক্ত, রুমাল ভিজে যাচ্ছে। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে যাচ্ছে ভাই কিন্তু তার চোখে এক ফোঁটা পানি নাই।

হনুমানতলা হয়ে রংপুর সরকারি কলেজের সামনে যেতেই, অ্যাম্বুলেন্স পেয়ে গেলাম। সরকারি কলেজের সামনে ছাত্ররা সবাই সাহায্য করল। ভাইয়াকে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে নিয়ে রংপুর মেডিকেল কলেজের দিকে রওনা হলাম। ভাইয়া তখনো অনবরত কালেমা পড়ছে। ভাইয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভাইয়া আপনার রক্তের গ্রুপ কী? ভাইয়া উত্তর দিল, বলল এবি পজেটিভ। ভাইয়াকে ডাকলে ভাইয়া হাত দিয়ে ইশারা দিচ্ছিল। আমি ভাইয়াকে বলতে লাগলাম, ভাইয়া আপনার মতো শক্ত মানুষ আমি আমার জীবনে দেখি নাই। এখনো বিজয় দেখার বাকি, এখনো অনেক যুদ্ধ বাকি। আপনি হার মানবেন না ভাইয়া। ভাইয়া হাত দিয়ে সাড়া দিতে লাগল। আসলেই তার মতো সংগ্রামী ধৈর্যশীল মানুষ আমি আমার জীবনে দেখি নাই।

খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে মেডিকেলে পৌঁছে গেলাম। কি অবাক করা বিষয়, অ্যাম্বুলেন্স কোনো টাকা চাইল না। ভর্তি ফরমে কোনো সময় লাগল না। কোনো মেডিকেল স্টাফ কোনোরকম বিল চার্জ করল না। সবাই যেন সেদিন আমার ভাই, তাহির ভাইয়ের ভাই। পুরুষ ওয়ার্ডে নিয়ে ভাইয়াকে ভর্তি করা হলো, সেদিন পাশের বেডের বৃদ্ধ রোগীটাও ভাইয়ার দিকে তার ফ্যান ঘুরিয়ে ধরে রেখেছিল। ডাক্তাররা এসে ইমার্জেন্সি কিছু ইনজেকশন পুশ করলেন ও ব্যান্ডেজ করে দিলেন। খুব শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল ভাইয়ার। আমি খালামণিকে কল দিলাম, বললাম খালামণি আমরা মেডিকেলে আছি আপনাকে লাগবে। খালামনি বলল, তোমার ভাইয়া কি আছে? নাকি নাই? আমি বললাম, খালামণি, আছে; তবে আপনাকে লাগবে। এই বলে ফোন কেটে দিলাম। ভাইয়া তখন ভীষণ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল। আমাকে বলছিল, ভাইয়া আমার কোমর আর পায়ের জয়েন্টে খুব ব্যথা করছে। একটু ডাক্তারকে ডাকেন। ডাক্তারকে ডাকলাম,ডাক্তার বলল, সময় লাগবে, মাত্র ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে। ভাইয়ার খুব শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল,

আর বারবার কপাল ঘেমে যাচ্ছিল। আমি হাত দিয়ে বারবার কপাল মুছে দিচ্ছিলাম। ভাইয়া নাজিরকে বলল, ভাই আমার পা টা একটু উঁচু করে ধরেন। এর মধ্যে খালামণি চলে এলো। ভাই আমার পানি খেতে চেয়েছিল তখন। কিন্তু হাতে স্যালাইন লাগানো, তাই নাকি পানি খাওয়ানো যাবে না।

রংপুরের অভ্যন্তরীণ যেসব সাংগঠনিক ভাইদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে, তারা সবাই এসেছিলেন, কেউ অর্থ দিয়ে কেউ সাহস দিয়ে পাশে ছিলেন। আমাদের বন্ধু আরিফ শাহরিয়ার নিলয় আর শাহরিয়ার হোসেনও খবর শুনে চলে আসে। সবাই সবার সাধ্যমতো সাহায্য করার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। এমনকি অপরিচিতরাও এগিয়ে এসেছিল সেদিন।

রাত আটটার দিকে ভাইয়াকে অপারেশন থিয়েটারে নেওয়া হলো। তার আগ পর্যন্ত ভাইয়ের জ্ঞান ছিল। টানা দুই ঘণ্টা অপারেশন চলল, প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে। গুলিটা তীর্যকভাবে বেরিয়েছে, যার ফলে পেটের অভ্যন্তরে ৭-৮ জায়গায় অনেক বড় ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। নারীর কিছু অংশ কেটে বাদ দিতে হয়েছে। ডাক্তারের সেদিন সর্বোচ্চ চেষ্টা করছিল। আমি রক্তের যোগান করতে পাগলের মতো ছুটছিলাম। ৬ ব্যাগ রক্ত জোগাড় করেছিলাম। তিন ব্যাগ রক্ত অপারেশন থিয়েটারেই চলে গেছেন। বাকি তিন ব্যাগ তখনও ব্লাড ব্যাংকে জমা। রাত দশটায় ভাইয়াকে অপারেশন থিয়েটার থেকে বের করে আইসিইউ-তে নেওয়া হয়। সময়গুলো যেন খুব দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছিল। আইসিইউতে নেওয়ার সময় ভাইয়ার জ্ঞান ছিল না। এর মধ্যে আঙ্কেলও চলে এসেছে। আঙ্কেলের বয়স হয়েছে তাই জানাতে চাইনি। ভাইয়ার ছোট বোনের কাছে খবর পেয়ে আর থাকতে পারেনি। চলে এসেছে।

এর মধ্যে ডাক্তারের সাথে বারবার কথা হচ্ছিল আমাদের, প্রয়োজনীয় অনেক ওষুধ মেডিকেল থেকেই দেয়া হচ্ছিল। রাত সাড়ে এগারোটায় ডাক্তার আঙ্কেল আর খালামণিকে ভেতরে ডাকলেন, আমিও সাথে ভেতরে গেলাম। ডাক্তার বলল আপনার ছেলেকে দোয়া করে দেন। আমার ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছিল। বুঝতে পেরেছিলাম, ভাইয়া হয়তো আর থাকবেন না। আঙ্কেলের চোখ থেকে টপটপ করে পানি পড়ছিল। খালামণি দুই হাত তুলে মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করলেন। ডাক্তার খালামণি ও আঙ্কেলকে নিয়ে বাহিরে যেতে বললেন। পৌনে বারোটায় আমাকে আর নাজির ভাইকে ভেতরে ডাকলেন। বললেন, আপনার খালামণি আর আঙ্কেলকে সান্ত্বনা দেন। কিন্তু আমি তো নিজের মনকেই সান্ত্বনা দিতে পারছিলাম না।

ছবি: আব্দুল্লাহ আল-তাহিরের মৃতদেহ

পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে আব্দুল্লাহ আল-তাহির ওপারে পারি জমিয়েছেন। ১৯ জুলাই রাতে তাহিরের মরদেহ বাসায় নিয়ে যেতে দেয়নি মেডিকেল কর্তৃপক্ষ। পরের দিন ২০ জুলাই বেলা দশটার দিকে শহীদ তাহিরের লাশ নিয়ে আসা হয় রংপুরের ভাড়া বাড়িতে। পরে শহীদ তাহিরের লাশকে গোসল করানো শেষে বাদ জোহর জানাযা পড়ানো হয়। জানাযা পড়ান চাচা আব্দুর রহমান। জানাযা শেষে তাকে পূর্ব জুম্মাপাড়া কবরস্থানে দাফন করা হয়।'
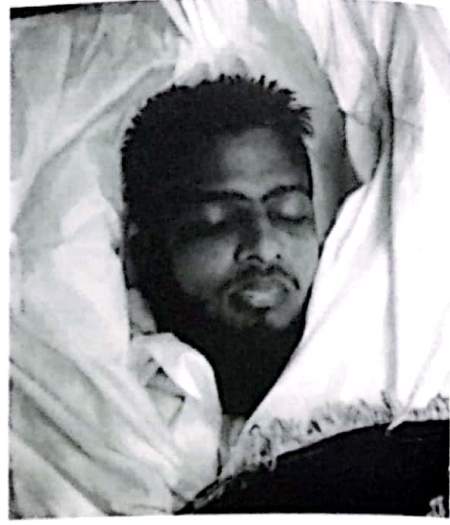
তাহিরের বোন স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন—

'শহীদ হওয়ার আগের দিন, ১৮ই জুলাই, ভাইয়ার সাথে কথা বলার জন্য ফোন করেছিলাম। শুনলাম ভাইয়া ব্যস্ত। আম্মুকে জিজ্ঞেস করলাম, শহরে কী অবস্থা? ভাইয়া আন্দোলনে যায় না? আম্মু বললেন, তোমার ভাইয়া আবার যাবে না? প্রতিদিনই যায়। আম্মুকে বললাম, আবু সাঈদ কত ভাগ্যবান! নিজে গিয়ে বুক পেতে দিল, গুলি খেয়ে জান্নাতে চলে গেল। এখন তো শহীদ হওয়ার কী চমৎকার সুযোগ! মিছিলে থাকার সময় যদি একটা গুলি লাগে, তাহলে তো লটারি জিতে যাবে—সোজা জান্নাতে চলে যাবে। তখন কি জানতাম, আল্লাহ ভাইয়ার জন্যও এমন সৌভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছেন?

অনেক বছর ঢাকায় থাকার পর ভাইয়া সিদ্ধান্ত নেয় বাড়িতে ফিরে যাওয়ার। ৫ই জুলাই সীতাকুণ্ড ঘুরতে যায়। ফেরার পথে আমার বাসায় আসে, দুইদিন ছিল আমার বাসায়, ভাইয়াকে নিয়ে গ্রামে ঘুরতে গিয়েছিলাম, পুকুরপাড়ে বসে গান গাইল, প্রিয় গানগুলো শোনাল। কে জানত, ওটাই ভাইয়ার কণ্ঠে শোনা শেষ গান হবে! আমার বাসা থেকে গিয়ে ছোট ভাইয়ের সাথে দেখা করে, ঢাকায় যত শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল, সবার সাথে দেখা করে বিদায় নেয়। সারারাত মেসের বন্ধুদের সঙ্গে গান, গল্পে আড্ডা দেয়। সবাইকে সুন্দরভাবে বিদায় জানিয়ে রংপুরে ফিরে যায়। রংপুরে ফেরার মাত্র নয় দিন পর শহীদ হন।

হঠাৎ চলে গেলেও কত গুছিয়ে, কত সুন্দরভাবে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন—এটা সত্যিই বিস্ময়কর! কখনো মন খারাপ থাকলে ভাইয়াকে ফোন দিতাম। ভাইয়া এত সুন্দর করে বুঝাত, এত মোটিভেশন দিত যে, সব কষ্ট দূর হয়ে যেত। বিশেষ করে দীন

সম্পর্কে আরও সচেতন হওয়ার জন্য সবসময় তাগিদ দিত। ভাইয়া দীনের ব্যাপারে খুবই সংবেদনশীল ছিলেন। আমার বাসায় এলে পাশের বাসার ওয়াইফাইও ব্যবহার করত না। বলত, না বলে ব্যবহার করলে কিয়ামতের দিন এটুকুরও হিসাব দিতে হবে।

ভাইয়ার জীবনটা ছিল অনেক কষ্টের, একের পর এক পরীক্ষা। করোনাকালে দুইবার করোনা হয়েছিল, কিছুদিন আগে ভয়ংকরভাবে পক্স উঠেছিল, কুকুরের কামড়ে ভোগান্তি পোহাতে হয়েছিল, ডেঙ্গু জ্বরে দীর্ঘদিন হাসপাতালে ছিল। কিন্তু কখনোই হতাশ হননি। হাসপাতালের বেডে শুয়ে ফেসবুকে লিখেছিলেন—'আলহামদুলিল্লাহ! ঈদের আনন্দে ভিন্ন অনুভূতি!' কতটা ইতিবাচক মনোভাবের হলে এভাবে ভাবা যায়! শহীদি মৃত্যু মুমিন নর-নারীর চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষা। তবে এই মর্যাদা সবার ভাগ্যে জোটে না। আল্লাহ বেছে বেছে তার প্রিয় বান্দাদেরকেই শহীদি মৃত্যু দান করেন। ভাইয়া সবসময় শহীদি মৃত্যু কামনা করতেন। গুলি লাগার পর যারা ভাইয়ার পাশে ছিল, তারা বলেছে—ভাইয়ার মুখে তখন ছিল এক তৃপ্তির হাসি, যেন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, জান্নাত তার জন্যই অপেক্ষা করছে।

যারা শহীদ হন, তারা সত্যিই অন্য সবার থেকে আলাদা। তাদের চলাফেরা, আচরণ, ব্যবহার—সবকিছুতেই ভিন্নতা থাকে। তারা যেন অল্প সময়ের জন্য দুনিয়ায় এসে অন্ধকারের মাঝে আলো ছড়িয়ে, সবার হৃদয়ে ভালোবাসা গেঁথে দিয়ে, সবাইকে কাঁদিয়ে হাসিমুখে বিদায় নেন। ভাইয়ার সঙ্গে যাদেরই পরিচয় হয়েছে, কাছের হোক বা দূরের—সবাই বলে, ভাইয়ার মতো অমায়িক ব্যবহারের মানুষ তারা আর কখনও দেখেনি। স্বল্প পরিচয়েও সে হয়ে উঠত সবার প্রিয়। কেউ তার কথায় বা কাজে কষ্ট পেতে পারে—এ বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সচেতন থাকতেন।

শহীদ আব্দুল্লাহ আল-তাহির ১৬ জুলাই তার সহকর্মীদের নিয়ে নিজের গলায় গাওয়া স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে গানের ভিডিও ফেসবুকে পোস্ট করেন—

গানটি শুনতে QR Code স্ক্যান করুন

আব্দুল্লাহ আল-তাহির এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের মানুষ ছিলেন—যে কখনো উচ্চস্বরে কথা বলেনি, যে কখনো মানুষের হৃদয়ে আঘাত করেনি। তাহির তার মাকে কেমন ভালোবাসতো, কীভাবে তাহিরের সব সপ্ন ছিল তার মাকে ঘিরে, সেই বর্ণনা দিতে গিয়ে তার মা বলেন—তাহির নামাজ পড়ে এসে কল দিয়ে বলতো, আম্মু ভালো লাগতেছে না, একটু শুইলাম। কলেজ যাওয়ার সময় কল দিয়ে বলত, আম্মু আমি এখন রেডি হচ্ছি, বের হয়ে কল দেই। আম্মু কলেজ যাওয়ার জন্য বের হলাম। সে বাসে উঠবে, আম্মু বাসে উঠে কথা বলতেছি। সে এভাবে কথা বলতে বলতে যাইত। আম্মু এখন বাস থেকে নামব,একটু ওয়েটিংয়ে থাকেন। আম্মু এখন কলেজে ঢুকব। আমি কলেজ থেকে বের হয়ে আপনাকে কল দিব। আমার বাবা যখন গানের রেকর্ডিং করত রাত ৩টার সময় কল দিয়ে বলত, আম্মু শুধু ১ মিনিট কথা বলি আম্মু, এখনো রেকর্ডিং শেষ হয়নি। এমনিভাবে রেকর্ডিং-এর ফাঁকে ফাঁকে কল দিত। আবার যেদিন স্টুডিওতে একক গান হতো, বাবা বাহিরে এসে কল দিয়ে বলত, আম্মু আমারটা শেষ হলো। ভাইয়ারা এখনো রিহার্সেল করতেছে,আম্মু শুধু এক মিনিট কথা বলি আম্মু। কল দিয়ে বলত, আম্মু আমি এই যে অভিভাবকদের নিয়ে আছি চিন্তা করিয়েন না।'

মায়ের অনেক বয়স হয়েছে, একা রংপুরে থাকতে কষ্ট হয়। এ কারণে তাহির ঢাকা ছেড়ে রংপুর চলে আসেন এবং সিদ্ধান্ত নেন, ঢাকা থেকে একবারে রংপুরে গিয়ে সেখানে তার আম্মুর সঙ্গে থাকবেন এবং হাঁস-মুরগির খামার দিবেন এবং সেটা দিয়েই তার সংসার চালাবেন।

৯ জুলাই ২০২৪-এ তাহির ঢাকা থেকে রংপুর চলে যান। শহীদ তাহিরের বন্ধু আসিফ বলেন—এই তো জুলাই মাসের ১০ তারিখের কথা, ভাইয়া ঢাকা থেকে চলে এলো। বলল, আসিফ ভাইয়া, এবার রংপুরে একবারে চলে আসলাম। কোথাও একটা বিশ শতকের মতো জমি বর্গা নিব, সেখানে হাঁস-মুরগি, ছাগল পালন করব, শাকসবজি চাষ করব। হাতে তো টাকা-পয়সা নাই, কিছু টাকা হাতে আসলে ছোটখাটো কিছু ব্যবসা শুরু করব। আম্মুর বয়স ৬০ হলো, আব্বুর সে হিসাবে ৬৯। আর কতদিন তারা কষ্ট করবে বলেন। এখন তাদেরকে নিয়ে একসাথে থাকতে চাই. শেষ সময়টা তাদের আর কোনো কষ্টে রাখতে চাই না। শহীদ তাহিরের যেন সব কিছু ঘিরেই ছিল শুধু মা, মা এবং মা।

শহীদ তাহির ছিল ভ্রমণ-পিপাসু মানুষ। তিনি ঢাকা থেকে গ্রামের বাসা রংপুরে যাওয়ার আগের দিন ৫ জুলাই সীতাকুণ্ড থেকে ঘুরে এসেছেন বন্ধু সামিউলের

সঙ্গে। দেশের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে তার মাকে নিয়ে ঘুরতে যেতেন। মাকে নিয়ে সিলেট, কক্সবাজার, সেন্ট মার্টিন ঘুরতে গিয়েছিলেন।

শহীদ তাহিরের বন্ধু সামিউল ইসলাম বলেন—তাহির ছিলেন খুবই শান্তশিষ্ট ও নম্র মেজাজের এবং প্রখর মেধাবী। এমন কোনো কাজ নেই যা তিনি পারতেন না। ভ্রমণ করা ছিল তার নেশা। তিনি ঘুরতে অনেক পছন্দ করতেন। নতুন কিছু নিজে শেখা ও নতুন নতুন জায়গায় ভ্রমণ করতে তিনি খুবই পছন্দ করতেন। তার সবচেয়ে বড়ো স্বপ্ন ছিল তার আম্মুকে নিয়ে তিনি হজ্ব করবেন কিন্তু তার সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। আমি তার সঙ্গে বাংলাদেশের অনেক জায়গায় সফরের ভ্রমণসঙ্গী হিসেবে ছিলাম। তিনি পাহাড়, সমুদ্র এবং ঝর্ণা দেখতে পছন্দ করতেন। এগুলো দেখতেন এবং মহান রবের শুকরিয়া জ্ঞাপন করতেন। তিনি অনেকবার চট্টগ্রাম, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত, কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন, সিলেট, খুলনা এবং আরও অনেক জায়গায় আমাকে নিয়ে ট্যুরে যেতেন। তিনি খুব সুন্দরভাবে দিকনির্দেশনা এবং গাইড করতে পারতেন, সেজন্য অনেক পরিচিতজন তার সঙ্গে গ্রুপ ট্যুরে যেত; কারণ তিনি ভালো নেতৃত্ব দিতে পারতেন। তার সঙ্গে আমার সর্বশেষ সফর ছিল ৪-৬ জুলাই ২৪-এ চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড পাহাড়, গুলিয়াখালী সী-বীচ এবং রূপসী ঝরনা।

শহীদ আব্দুল্লাহ আল তাহিরের ফেসবুক প্রোফাইলে গেলে দেখা যায় তিনি বিভিন্ন সময় ফেসবুকে ইসলামিক স্টাটাস দিতেন, নিচে কিছু স্টাটাসের স্ক্রিনশট দেওয়া হল—
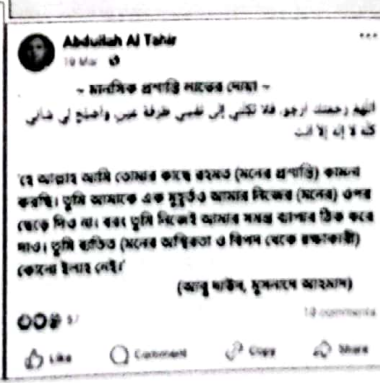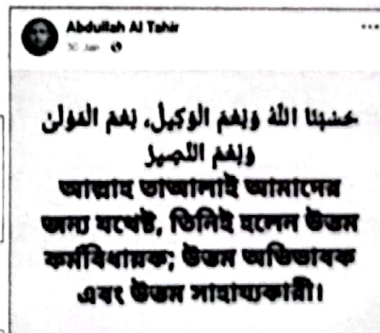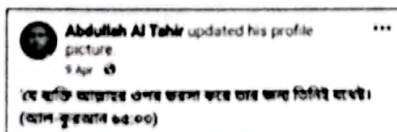
শহীদ আব্দুল্লাহ আল তাহির ১৯৯৩ সালের ১৭ এপ্রিল রংপুরের স্টেশন রোড জাহাজকোম্পানি মোড়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মোঃ আব্দুর রহমান এবং মাতা মোছাঃ শিরিনা বেগম দম্পতির ২য় সন্তান ছিলেন আব্দুল্লাহ আল তাহির। তিনি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গ্লাস অ্যান্ড সিরামিক্সের একজন শিক্ষার্থী। তিনি সিরামিক্স ডিপার্টমেন্টে ৮ম সেমিস্টারে পড়াশোনা করছিলেন। তিনি অনেক পারদর্শী একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ। ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও সুমিষ্ট কণ্ঠের অধিকারী। রংপুরে স্কুলে থাকাকালীন সময়ে অটো চালিয়ে তার পড়াশোনা এবং পরিবারের খরচ চালাতেন। তিনি ঢাকায় পড়াশোনার পাশাপাশি ঢাকা শহরের বিভিন্ন মসজিদ, বাজার এবং ফুটওভার ব্রিজে ভ্রাম্যমাণ আতর বিক্রি করে ঢাকায় তিনি তার নিজের উপার্জিত অর্থ দিয়ে পড়াশোনা করতেন এবং তা থেকে কিছু টাকা দিয়ে তার মা-এর খরচ বহন করতেন।

তাহির আজ আর আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তার আত্মত্যাগ আমাদের চিরদিনের জন্য একটি নতুন পথের দিশা দিয়ে গেছে। তার অকাল প্রয়াণ, তার প্রতিটি রক্তকণা এবং তার সাহসী প্রতিবাদ একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক অগ্নিসংকেত হয়ে রইল—এই পৃথিবীতে জুলুম বেশি দিন টিকতে পারে না। সেই শাসক, যিনি ক্ষমতার অহংকারে অগণিত নিরীহ ছাত্রের জীবন কেড়ে নিয়েছিল, আজ আঁধারে সেই শাসক গোষ্ঠী বিলীন। তাহিরের রক্তস্নাত সেই ভূমি আজ এক নতুন আলোর প্রতীক—স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার এবং মানবাধিকারের এক নবতর জাগরণ।

স্বৈরাচারী শক্তি, যারা মানুষের অধিকার দমন করে নিজেদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছিল, তারা আজ ইতিহাসের শিক্ষা নিয়ে হারিয়ে গেছে। তাহির কোনো সাধারণ নাম নয়, এটি একটি প্রতীক, একটি জাগ্রত চেতনা। তার জীবন আর মৃত্যুর গল্প কোটি মানুষের মুখে ছড়িয়ে পড়েছে, যারা দৃপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেছে, 'অবিচারের কাছে মাথা নত করব না, মুক্তি আমাদের অধিকার।'

তথ্যসূত্র

মা, বোন, বন্ধু সামিউল ও প্রত্যক্ষদর্শী বন্ধু আসিফ

তথ্য সংগ্রহে:

মোঃ নাহিদ হাসান সজীব;

স্টোরি মেকিং: মোঃ নাহিদ হাসান সজীব এবং ড. মোহাম্মাদ সরোয়ার হোসেন

ঘরের ভেতরেও রেহাই পায়নি শিশু সামির!

১৯ জুলাই, ২০২৪, শুক্রবার। সন্ধ্যা সাতটার কাছাকাছি সময়। মিরপুরের কাফরুল এলাকার পরিস্থিতি অন্যদিনের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তীব্র সংঘর্ষে পুরো এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

শহীদের নাম : সাফকাত সামির চৌধুরী
বয়স : ৯ বছর ১ মাস (জন্ম- ৮ জুন ২০১৫)
মৃত্যুর তারিখ : ১৯ জুলাই ২০২৪
পিতা : মো. সাকিবুর রহমান চৌধুরী
মাতা : ফারিয়া ইবনাত পিংকি
ঠিকানা : মিরপুর ১৪, ঢাকা
শিক্ষা : নূরানি, জামেউল উলুম মাদরাসা

সামিরদের বাসা কাফরুল থানা এলাকায়। ঘরের ভেতরে সামির তার চাচা মশিউরের সঙ্গে গল্প করছিল। মশিউর দশম শ্রেণির ছাত্র, আর সামির তার চেয়ে ছোট হলেও তাদের সম্পর্ক ছিল দুই বন্ধুর মতো। মাগরিবের কিছুক্ষণ পর, আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ টিয়ারশেল ছোঁড়ে। কাঁদানে গ্যাসের ধোঁয়া সামিরদের ঘরে ঢুকে পড়ে, ফলে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। মশিউর জানালাটা বন্ধ করতে এগিয়ে যায়। সামির কৌতূহলবশত মশিউরের পেছনে তার পড়ার টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে বাইরে উঁকি দেয়। হঠাৎ বিকট শব্দে একটি গুলি ঘরে ঢুকে পড়ে। গুলিটি প্রথমে মশিউরের কাঁধে আঘাত করে, এরপর সামিরের ডান চোখ ভেদ করে মাথার পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে দেয়ালে আঘাত করে। মুহূর্তেই সামির নিথর হয়ে মেঝেতে পড়ে যায়। সামিরের ছোট্ট জীবন এক মুহূর্তেই শেষ হয়ে যায়।

ওই ঘটনার স্মৃতিচারণ করে সামিরের চাচা মোঃ মশিউর রহমান বলেন— মাগরিবের কিছুক্ষন পর আমি, সামির এবং আমার ছোট বোন একসাথে ঘরে বসে ছিলাম। যখন জানালা দিয়ে টিয়ারশেলের ধোঁয়া আসতেছিল, তখন আমি জানলা

বন্ধ করতে গেছিলাম। সামির আমার পিছে পিছে গেছিল। সামির আমার পিছনে ওর পড়ার টেবিলের ওপর দাড়াইয়া আমার কাঁধের ওপর দিয়া উঁকি মারতেছিল। দেখতেছিল, ধোঁয়া উঠতেছে কেন?

জানলা বন্ধ করতে যাব, এমন সময় একটা বিকট আওয়াজ আসল। আওয়াজটা আসার সাথে সাথে আমি একটু নিচু হয়ে গিয়েছিলাম। সামির যেহেতু আমার বরাবর পিছে ছিল, গুলিটা আমার কাঁধে লাইগা একদম পিছে যাইয়া ওর ডান চোখ দিয়া ঢুইকা মাথার পিছন দিয়া বের হইয়া দেয়ালে আঘাত করে। সামিরের গায়ে গুলি লাগার সাথে সাথে আমার ছোট বোন সে চিল্লায়া উঠছে। আর আমি পিছে তকাইয়া দেখি যে সামির মেজেতে পইড়া গেছে। সামিরের মা রান্নাঘরে ছিল। তারা দৌড় দিয়া রুমে আসে।

সামিরের বাবা মো. সাকিবুর রহমান চৌধুরী একটি সিকিউরিটি এজেন্সিতে কন্ট্রোল রুম অফিসার হিসেবে চাকরি করতেন। সেদিন তার অফিস ছিল না। সন্ধ্যার পর তিনি বাসার কাছেই বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিচ্ছিলেন। ওই সময় তার বন্ধু নুর ইসলাম তাকে খবর দেয়, 'তুই বাসায় আয়, তোর বাসায় গুলি ঢুকছে, তোর ছেলের গায়ে গুলি লাগছে।' সাকিবুর রহমান দৌড়ে বাসায় ফিরে আসেন। বাসায় এসে দেখেন, সারা ঘর রক্তে রঞ্জিত। ততক্ষণে সামির ও মশিউরকে মার্কস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। সেখানে গিয়ে সাকিবুর রহমান নিথর সামিরের মরদেহ দেখতে পান। দায়িত্বরত চিকিৎসক সামিরকে মৃত ঘোষণা করেন।

রাত নয়টার দিকে সামিরের মরদেহ তার প্রিয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান জামেউল উলুম মাদরাসায় নেওয়া হয়। মাদরাসার মাঠে রাত সাড়ে নয়টায় জানাজা হয়। এলাকায় জানাজার খবর মাইকিং করতে দেওয়া হয়নি। জানাজা শেষে সামিরের মরদেহ নেওয়া হয় তার নানাবাড়ি আশুলিয়ায়, যেখানে সে বড় হয়েছে। পরদিন সকাল সাড়ে আটটায় সামিরকে দাফন করা হয়।

ছবিঃ ঘাতকের গুলি সামিরের ডান চোখ দিয়ে ঢুকে মাথার পিছন দিয়ে বেরিয়ে যায়।

সাকিবুর রহমানের মনের মধ্যে আক্ষেপ থেকে যায়, টাকার অভাবে ছেলের শখ পূরণ করতে পারেননি। সামিরের শখ ছিল ফুটবলের জুতা পড়ে খেলতে যাওয়ার, যা পূরণ হয়নি। ১২ ঘণ্টার ডিউটি করার কারণে ছেলের সঙ্গে বেশি সময় কাটানোও সম্ভব হয়নি।

সাকিবুর রহমান তার ছেলের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, 'আমার একমাত্র সন্তান সামির। তাকে মাদরাসায় নুরানি পড়াতাম। আশা ছিল, ও অনেক বড় হবে। এভাবে হারাতে হবে, কখনো ভাবিনি। সামিরের মা সামিরের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে। নিজের অনেক ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়েছে। সে কখনো আমার কাছে তেমন কিছু চায়নি, আর আমি চাইলেও তার জন্য বেশি কিছু করতে পারিনি। তার একটাই ইচ্ছা ছিল—তার সন্তানের জন্য আমি যেন কিছু করি।'

আজ সামিরের ছোট্ট পড়ার টেবিল, খেলনাগুলো সবই আছে, শুধু সামির নেই। বাবার জীবনে আর কোনো স্বপ্ন নেই। প্রতিদিন সাকিবুর রহমান নিজেকে প্রশ্ন করেন, 'কেন সামিরকে এভাবে চলে যেতে হলো?'

তথ্যসূত্র :

সাফকাত সামিরের বাবা এবং চাচার (মোঃ মশিউর রহমান) সাক্ষাৎকার

তথ্য সংগ্রহে:

মোঃ কামরুজ্জামান এবং মোঃ নাহিদ হাসান সজীব;

স্টোরি মেকিং: মোঃ কামরুজ্জামান এবং ড. মোহাম্মাদ সরোয়ার হোসেন

‘বুকের মাঝখান দিয়ে গুলি ঢুকে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেল’

আমি উমর, ইমরানসহ কয়েকজন লক্ষ্মীবাজারে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে যোগ দিই। আমরা স্লোগানে মুখরিত ছিলাম, অন্যায়ের বিরুদ্ধে কণ্ঠ তুলে ধরছিলাম। সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল, হঠাৎ করেই পরিস্থিতি বদলে গেল। ‘আমার চোখের সামনেই উমর পড়ে গেল। বুকের মাঝখান দিয়ে গুলি ঢুকে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেল। উমর! উমর, তুই কেমন আছিস? কিছু বল! আমরা তোকে বাঁচাব, ভয় পাবি না।’

শহীদের নাম: উমর ফারুক
বয়স: ২৪ বছর, ৬ মাস ৬ দিন (১৩ জানুয়ারি ২০০০)
মৃত্যুর তারিখ: ১৯ জুলাই ২০২৪
পিতার নাম: আব্দুল খালেক
মাতার নাম: কুলসুমা আক্তার
ঠিকানা: নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর উপজেলার বাকলজোড়া ইউনিয়ন, সিংধা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
শিক্ষা: বি.এ অনার্স স্নাতক তৃতীয় বর্ষ, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা।

আলাউদ্দিন বেলাল শহীদ উমর ফারুকের রুমমেট। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে কবি নজরুল সরকারি কলেজে দু‘জনই তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। একসাথে তিন বছর একই রুমে অতিবাহিত করেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে আলাউদ্দিন বেলাল উমর ফারুকের পাশেই ছিল। উমরের শাহাদাতের মাধ্যমে বিচ্ছেদ হয় তাদের বন্ধুত্বের! একসাথে আন্দোলন যোগদান। চোখের সামনে উমরকে নির্মমভাবে হত্যার দৃশ্য বন্ধু আলাউদ্দিন বেলালকে কুরে কুরে শেষ করছে!

প্রত্যক্ষদর্শী আলাউদ্দিন বেলালকে উমর ফারুকের মৃত্যু ও মৃত্যু-পরবর্তী দুর্বিষহ ঘটনার বর্ণনা দিতে বললে 'আলাউদ্দিন বেলাল' নির্বাক হয়ে যান। কীভাবে এই দুঃসহ দৃশ্যর কথা বলবেন? আলাউদ্দিন বেলাল বন্ধু উমর ফারুকের আন্দোলনে জড়ানো থেকে নিয়ে মৃত্যু-পরবর্তী তিন দিন লাশ নিয়ে বিড়ম্বনা এবং তাঁকে চিরবিদায় জানানোর পর তাদের জেলে নিয়ে যাওয়ার পূর্ণ বিবরণ লিখে দেন। আলাউদ্দিন বেলালের দেওয়া সেই হৃদয়স্পর্শী ঘটনার বিবরণ হুবহু তার লেখনীতে তুলে ধরা হলো— '১৯ জুলাই, শুক্রবার। সকাল থেকেই দিনটা ছিল অস্বাভাবিক। বাসায় পানি ছিল না বলে মিজানের বাসায় গিয়ে গোসল সেরে জুমার নামাজ পড়লাম। নামাজ শেষে দুপুরে হোটেলে খেয়ে বাসায় ফিরি। কিন্তু বিকেলটা আমার জীবনের গতিপথ বদলে দিল।

আমি, উমর, ইমরান-সহ কয়েকজন লক্ষ্মীবাজারে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে যোগ দিই। আমরা স্লোগানে মুখরিত ছিলাম, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের কণ্ঠ তুলে ধরছিলাম। সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল, হঠাৎ করেই যেন পরিস্থিতি বদলে গেল।

আমি: 'এভাবে গ্যাস ছুড়ছে কেন? আমরা তো কিছুই করিনি!'

ইমরান:'ওরা চায় না আমরা একত্রিত হই। আমাদের কণ্ঠ তারা সহ্য করতে পারছে না।'

পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছুড়তে শুরু করল, মুহূর্তেই চারপাশ ধোঁয়ায় ঢেকে গেল। চোখ জ্বালা করছিল, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। আমরা সরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু এর মধ্যেই শুরু হলো গুলির শব্দ। আমার চোখের সামনেই উমর পড়ে গেল। বুকের মাঝখান দিয়ে গুলি ঢুকে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি ছুটে গিয়ে তাকে ধরে বললাম—আমি (কাঁপা কণ্ঠে): 'উমর! উমর, তুই কেমন আছিস? কিছু বল! আমরা তোকে বাঁচাব, ভয় পাবি না।' কিন্তু উমর কোনো কথা বলল না। তার নিথর শরীরটা আমার হাতে পড়ে ছিল। আমি আর ইমরান তাকে ধরে দ্রুত আজগর আলী হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। সেখানে ডাক্তার উমরকে পরীক্ষা করে বললেন, 'গুলি বের করেছি, কিন্তু... তাকে এখনই ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যেতে হবে। তার অবস্থা খুবই খারাপ।'

আমরা উমরকে নিয়ে ছুটে যাই ঢাকা মেডিকেলে। কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর আগেই আমাদের প্রাণপ্রিয় বন্ধু আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। হাসপাতালের বিছানায় তার নিথর দেহ পড়ে ছিল। আমরা কেউ কথা বলতে পারছিলাম না। ছানি (কান্নায় ভেঙে পড়ে): 'এটা কী হলো ভাই? আমরা সবাইকে হারিয়ে ফেলছি। এই দেশে কি বেঁচে থাকাই অপরাধ?'

হাসপাতালের করিডোরে তখনও যেন তার স্লোগানের প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। হঠাৎ করেই মেডিকেল চত্বর ঘিরে ফেলল পুলিশ। আমাদের স্বজন হারানোর শোক তখনো শেষ হয়নি, আরেক ভয়াবহ অধ্যায়ের সূচনা হতে চলল।

মেডিকেলের পরিবেশ তখন থমথমে। উমরের নিথর দেহের পাশে দাঁড়িয়ে আমরা যেন পৃথিবীর সব শব্দ হারিয়ে ফেললাম। মোবাইলে আসিফ আর রফির বারবার কল আসছিল। কিন্তু আমাদের কানে ভেসে আসছিল দূরে কোনো রোগীর আর্তনাদ, সাইরেনের গর্জন, আর পুলিশের বুটের ঠক ঠক আওয়াজ—সব কিছু মিলিয়ে মনে হচ্ছিল যেন আমরা যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি। আমি ফর্মালিটিগুলো শেষ করার চেষ্টা করছিলাম। ছানি, সুজন, ইমরান, হাসিব, আর মোস্তফা সবাই উমরের দেহের পাশে নিঃশব্দে বসে ছিল। ঠিক তখনই পুলিশ বাহিনীর সশস্ত্র দল কাছাকাছি চলে আসে, আর তাদের গর্জে-ওঠা আওয়াজ শোনা যায়—'সবাই সরে দাঁড়া, কোনো নড়াচড়া করবি না!'

এতক্ষণ আমরা যে পরিবেশে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তাতে মুহূর্তের মধ্যে অরাজক পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেল। ছানি চিৎকার করে বলল, 'পুলিশ এসে গেছে! সবাই দ্রুত বের হও!' পুলিশ আক্রমণ শুরু করল, আর সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। ধাক্কাধাক্কির মধ্যে ছানি আর মোস্তফা আহত হয়ে গেল। হাসপাতালে এক ভীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হলো। এমন সময়, একজন বৃদ্ধ কাঁদতে কাঁদতে হাসপাতালে বাইরে পালানোর চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু পুলিশ তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। আমাদের মনে তখন একটাই প্রশ্ন—এখানে কি আমাদের কেউ বাঁচাতে আসবে না?

এর মধ্যে আমার নজরে আসে, সুজন কোথায়? সুজনকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তার ফোনও বন্ধ। তার কথা ভেবে ভেতরে একটা চাপা ভয় ছড়িয়ে পড়ল। আমি ফর্মালিটির কাজ সেরে সুজনকে খুঁজতে শুরু করলাম। এর মধ্যে উমরের বাড়ি থেকে ফোন আসতে থাকল। কিন্তু উমরের মা-বাবাকে সরাসরি সত্যি বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমরা শুধু বললাম, 'উমর গুলিবিদ্ধ হয়েছে, এখন আইসিইউতে আছে।' কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছিল, তারা হয়তো কিছু আন্দাজ করতে পেরেছেন।

আমরা সুজনকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না, আর উমরের মৃত্যু—দুটোই এক সাথে আমাদের মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল। কলেজের স্যারদের সাহায্য চাইতে ফোন দিলাম। এক স্যার বললেন, 'ক্যাম্পাস বন্ধ। কিছু করার নেই।' আরেকজন বললেন, 'আমি জানি না এখন কী করতে হবে।' কিছুক্ষণ পর, তাদের ফোনও বন্ধ হয়ে গেল।

তবে, এক সময় শিমুল ভাই ফোন করে জানালেন, সুজন বাসায় ফিরে গেছে। সে আহত ছিল কিছুটা, আর ফোন বন্ধ থাকার কারণে যোগাযোগ করতে পারেনি। তার খবর পেয়ে কিছুটা স্বস্তি পেলেও, আমাদের ভেতরের আতঙ্ক কমেনি।

ঠিক তখনই হাসিব ছুটে এসে বলল, 'তোমরা জানো? আমাদের জিহাদ ভাইও চলে গেছে।' হাসিব থেমে থেমে কাঁপা গলায় বলল, 'জিহাদ ভাইকে যাত্রাবাড়ীতে গুলি করা হয়েছে। পিঠে গুলি লেগেছিল। রক্তে ভিজে পুরো শরীর লাল হয়ে গিয়েছিল।' ভাইটা শেষ পর্যন্ত বাঁচার জন্য কেবল বলে যাচ্ছিল—'মা, আমাকে বাঁচাও। আমি মরে যেতে চাই না।' কিন্তু কেউ তাঁকে সাহায্য করতে পারল না। তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিল এমন যে কাউকে পুলিশ ধমক দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছিল। আমরা সবাই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। হাসিবের কথা শেষ হওয়ার আগেই সে নিজেই ভেঙে পড়ল। তার কাঁধ ধরে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমাদের হাত তখন ঠান্ডা বরফের মতো। জয়ের বাবা তখন এসে বললেন, 'তোমাদের এভাবে ভেঙে পড়লে চলবে না। শক্ত হও। আরও অনেক কিছু করা বাকি।' কিন্তু তার কণ্ঠেও কান্নার চাপ স্পষ্ট ছিল। এই ভয়াবহ সত্যগুলো তখন চারপাশের পরিবেশকে আরও ভারী করে তুলছিল। 'ডেথ সার্টিফিকেট কোথায়?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন। আমরা বুঝতে পারলাম, সুজনকে খুঁজতে গিয়ে তা নেওয়াই হয়নি। অনেক খোঁজাখুঁজি করে এক ডাক্তারের সাহায্যে সেটা পেলাম। কিন্তু এরপর পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠল।

ছবি: লাশঘরে বেওয়ারিশ লাশের সাথে শহীদ উমর ফারুক।

ডোম এসে বলল, 'আপনাদের একটা ফর্ম দিতে হবে। থানায় গিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে আনলেই লাশ নিয়ে যেতে পারবেন।' জয় ভাইয়ের বাবা বললেন, 'ফর্মে কী লেখা থাকবে?' ডোমের ঠান্ডা গলায় উত্তর, 'লেখা থাকবে, দেশের বিরুদ্ধে কাজ করায় পুলিশ গুলি করেছে।'

এই কথা শোনার পর জয় ভাইয়ের বাবা আর আমরা সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আংকেল ধীরে ধীরে বললেন, 'এ লাশ আমরা নিতে চাই না। আমাদের উমরকে দেশদ্রোহী বানিয়ে দেবে—এমন লাশের কোনো দরকার নেই।' এরপর আংকেল ইমরানের শারীরিক অবস্থা খারাপ দেখে তাকে বাসায় পাঠিয়ে দিলেন। মোস্তাফাকে দিয়ে তাকে পৌঁছে দিতে বললেন। এদিকে, আংকেল আমাদেরকে বললেন, 'তোমরা সূত্রাপুর থানায় যাও। সব ঠিক করতে হবে।' আমি, ছানি, আর হাসিব থানায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, এরই মধ্যে সোহরাওয়ার্দী কলেজের বন্ধু সোহানকে কলে ডেকে সাহায্য চাইলাম।

আমার জীবনে নেমে এসেছিল ভয়ংকর এক অধ্যায়, যা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। লাশের গাড়ি বিদায় দিয়ে মেডিকেল থেকে আসার পথে পাঁচটার দিকে সুজন ও হাসিবকে ভিক্টোরিয়া পার্ক থেকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর সুজনের মোবাইল থেকে আমাকে কল দিয়ে ভিক্টোরিয়া পার্কে ডাকা হয়। আমি ছিলাম প্রচণ্ড ক্লান্ত; তবু যাই। সেখানে যাওয়ার পর আমাদেরকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। আমার গায়ে ছিল উমরের রক্ত মাখা টি-শার্ট। এক রুমে রাখা হয় আমাকে আর হাসিবকে, অন্য রুমে রাখা হয় সুজনকে, তার ওপর চলতে থাকে নির্মম নির্যাতন। নির্যাতনের এক সময় বুঝতে পারি আমাদের বন্ধুরূপী মীরজাফর 'মেহেদী হাসান পলাশ' পুলিশের কাছে প্রায় ১৪-১৫ জনের নাম দিয়ে দেয়।

এরপর নিয়ে আসা হয় মাজাহার নামে একজনকে, তার পায়ের একটি নখ তুলে নেয়া হয়। আমাদের নির্যাতন করা হয়, মেয়েদের ঠিকানা খুঁজতে বলা হয়; কিন্তু যখন কিছুই পাওয়া যায় না, তখন আমাদের ফোন এবং মানিব্যাগ চেক করতে শুরু করে। তারা বুঝতে পারে আমি সংবাদপত্রে কাজ করি, তখন নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায়। পাশের রুমে ইমরানকে নিয়ে আসা হয় এবং তার ওপরও চলে নির্যাতন। আমরা অনুভব করছিলাম, আমাদের মুখের হাসি একেবারে শেষ হয়ে গেছে। এরপর হাসিবকে আর আমাকে কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়; ইমরানকে আর সুজনকে মিডফোর্ট মেডিক্যালে এবং সুত্রাপুর থানায় পাঠানো হয়।

কোতোয়ালি থানায় আমরা ছিলাম ২৭ জন, সেখানে ওয়াশরুমের পানি গড়িয়ে মেঝে ভেসে গিয়েছিল। প্রচণ্ড ক্ষুধা আর রুমের দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসছিল। অন্যদিকে, উমরের মরদেহ তার বাড়িতে জানাজার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছিল, কিন্তু পুলিশ এবং আওয়ামী লীগের লোকজন তা নিতে বাধা দেয়, এবং অবশেষে তাকে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যেতে হয়।

২১ জুলাই গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে ২২ জুলাই দুপুর ১২টা পর্যন্ত আমাদের কিছুই খেতে দেওয়া হয়নি, এবং অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগও করতে দেওয়া হয়নি। ২২ জুলাই আমাদেরকে কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রিজনার ভ্যানের ভেতর থেকে আমি এক উকিলের কাছে আব্বুর নাম্বার দিয়ে বাড়িতে খবর দিতে সক্ষম হই। বিকাল সাড়ে তিনটা বা চারটার দিকে আমাদের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মেঘনা বিল্ডিংয়ের আমদানিতে ১৫০ জন বন্দী ছিল; কিন্তু আমি, হাসিব এবং সুজনকে আলাদা রাখা হয়। সেদিন রাতে প্রায় ৩০ ঘণ্টা পর খিচুড়ি খেতে দেওয়া হয়। পরের দিন, ২৩ জুলাই ভোর ৪.০০ টায় কেস টেবিলে নিয়ে যাওয়ার পর দেখা হয় ইমরান ও অন্যান্য বন্দীদের সাথে, যাদের মধ্যে ১২-১৪ বছরের বাচ্চা থেকে শুরু করে এক পরিবারের তিন সদস্য ছিলেন। আমরা মেঘনার ৩/৫ নং সেলে ছিলাম, যেখানে মোট ৩০ জন ছিলাম, আর হাসিব ৩/৩ নং সেলে ছিল। জেলখানায় আমাদের সাথে ছিল সবচেয়ে বড় অপরাধী যারা দিনের পর দিন তিনটি গেইট পার হয়ে বের হতো। খাবার ছিল অনিশ্চিত, কখনও পাওয়া যেত না, আর কখনো বা ভাগ্য ভেদে ২০ লিটার পানিও আমাদের মধ্যে ভাগ হয়ে যেত।

এই অবস্থায় আমরা ১৭ দিন কাটালাম। আমাদের জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়, যেখানে একবারও পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। ৭ আগস্ট অবশেষে মুক্তি পেলেও, মুক্তি পাওয়ার পরও এক নতুন দুঃখ অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য। যখন শুনলাম, আমাদের বন্ধু 'জয়কে' কিছু লোক কুপিয়েছে এবং আমাদের মেসে হামলা করেছে, তখন সেই মুক্তি আরো কষ্টের মনে হলো। দিনশেষে সবকিছু ফিরে পেলেও, হারিয়ে ফেলেছিলাম আমার প্রিয় বন্ধু 'উমর ফারুককে'—এই যন্ত্রণা আমায় সারাজীবন কুড়ে কুড়ে খাবে।

এভাবেই শেষ হলো আমাদের এক 'মহাযুদ্ধের' অংশ। কিন্তু জানি, এই গল্প এখানেই শেষ নয়। আমরা যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে ছড়িয়ে থাকবে সেই অদৃশ্য সংগ্রাম—'স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে রক্ষা করা যে আরো কঠিন।' এখনো আমরা সক্রিয়, এখনো আমাদের স্বপ্ন পূরণের পথ বাকি—এক স্বনির্ভর ও স্বাবলম্বী বাংলাদেশ গড়ার। ইনশাআল্লাহ, সেই পথেই চলব।'

শহীদের বর্ণনায় ২৪ এর গণঅভ্যুত্থান

'চির উন্নত মম শির' -বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

শহীদ উমর ফারুক এর ফেসবুক টাইমলাইন ঘেঁটে কীভাবে আন্দোলনে জড়ান, তার বিস্তারিত তথ্য পাই। পহেলা জুলাই শহীদ উমর ফারুক আন্দোলনে আনুষ্ঠানিকভাবে ফেইসবুক পোস্টের মাধ্যমে একাত্মতা পোষণ করেন। কখনো মাথা নত না করা উমর ফারুক বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতার চরণ বেচে নেন। পোস্টে লেখেন—'চির উন্নত মম শীর!'
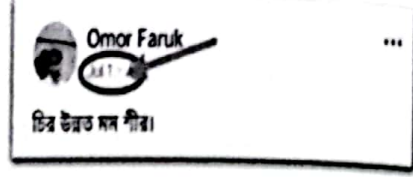
কোটা আন্দোলন যখন তুঙ্গে, 'শহীদ উমর ফারুক' তখন বরাবরের মতো আন্দোলনকারীদের পক্ষ নিয়ে, '১১ জুলাই ২০২৪' ফেসবুক পোস্টে বলেন,—'আমার সোনার বাংলায়, বৈষম্যের ঠাই নাই। ব্লকেড, ব্লকেড, সারা বাংলা ব্লকেড।'

১৫ জুলাই সন্ত্রাসী 'ওবায়দুল কাদের'-এর ঘোষণা অনুযায়ী, সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগ যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়-সহ দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর নির্বিচারে নির্মমভাবে নির্যাতনের স্টিমরোলার চালাচ্ছে। শহীদ উমর ফারুক তার প্রতিবাদে নিজের প্রোফাইল পিকচার পরিবর্তন করেন। ক্যাপশনে লেখেন—'We want Justice'

১৬ জুলাই 'সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগ ও পুলিশের গুলিতে' সারা দেশে শাহাদাত বরণ করেন ৬ জন। শহীদ আবু সাঈদ, শহীদ ওয়াসিম আকরাম,শহীদ ফয়সাল আহমেদ শান্ত-সহ আরো তিনজন। সেদিনের সেই দুঃসহ অভিজ্ঞতা উমর ফারুক সহ্য করতে পারেননি। অভিমান করে ফেইসবুক পোস্টে বলেছিলেন—সত্যকে সত্য, মিথ্যাকে মিথ্যা বলার মতো খারাপ গুণ নিয়ে জন্মেছিলাম। দুটোর সাথেই কোনোদিন মিথ্যে আপস করতে পারি নাই, কথা বলতে পারাটাই ছিল আজন্ম পাপ।

উমর ফারুক ১৬ জুলাই শহীদ আবু সাঈদের মৃত্যুর সংবাদে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। ১৬ জুলাই ফেইসবুক পোস্টে শহীদ আবু সাঈদের আইকনিক পিকচার এবং রক্তাক্ত হাতের ছবি দিয়ে লেখেন—'আমার সোজা কথা ভাই, ছাত্রদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের দাবিতে যদি সঙ্গ না দিতে পারেন তাহলে বাধা দিবেন না। এরা আপনার আমার ভাই। আমার ভাইদেরকে যখন নির্বিচারভাবে হত্যা করা হয়, তখন আপনাদের মতো আমরা চুড়ি পড়ে বসে থাকতে পারি না। রক্তের চেয়ে

স্বার্থকে বড় করে দেখে কারো পা চাটতে পারি না। আমার ভাইয়ের বুকে গুলি করা মানে আমার বুকে গুলি করা। পুরো ছাত্রসমাজের বুকে গুলি করা। এই আন্দোলন অধিকার রক্ষার আন্দোলন। পরবর্তী প্রজন্মকে আলোর পথ দেখানোর আন্দোলন, ছাত্রদের আন্দোলন কোনোদিন বৃথা যায়নি, ৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ৬৬-এর ছয় দফা, ৬৯-এর গণ অভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তাই বলে।

উমর ফারুক তার প্রতিষ্ঠিত দুর্গাপুর ব্লাড ডোনার সোসাইটি-কে শুধু রক্ত সরবরাহ, ত্রাণ বিতরণ-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। নিজে যখন ঢাকায় প্রতিনিয়ত মৃত্যুর মিছিলে সামিল হচ্ছেন, তাতেও তিনি তৃপ্ত হতে পারছিলেন না। 'লেডি ফেরাউন' রাক্ষসী হাসিনা উন্মাদ জালিমের হাত থেকে মুক্তির জন্য এলাকায় দুর্বার প্রতিবাদ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন, তার প্রতিষ্ঠিত 'দুর্গাপুর ব্লাড ডোনার সোসাইটি'-এর মাধ্যমে। উমর ফারুক শহীদ হওয়ার ঠিক দুদিন আগে ১৭ জুলাই ফেইসবুক পোস্টে বলেন—'আজ সকাল ১১ টায়,

স্থান : উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির সামনে, ছাত্রদের পক্ষ থেকে 'বাংলা ব্লকেড' কর্মসূচির সাথে আমরা 'দুর্গাপুর ব্লাড ডোনার সোসাইটি' পরিবার একাগ্রতা ঘোষণা করলাম। আপনারা যারা দূর্গাপুরে আছেন, আশা করি এই আন্দোলনকে জোরদার করবেন।

দেশের ক্রান্তিলগ্নে যেকোনো পরিস্থিতিতে আমাদের সংগঠন এবং স্বেচ্ছাসেবকরা পাশে ছিল। দেশের এই সংকটময় সময়ে আমাদের উচিত আমাদের ভাইদের পাশে দাঁড়ানো। চুড়ি পরে ঘরে বসে থাকার সময় নাই! আজকের অধিকার আদায় করতে না পারলে আজীবন আমরা নিজেরা সাফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভবিষ্যৎকেও হুমকির মুখে ঠেলে দিবো।

আমার সোনার বাংলায়, বৈষম্যের ঠাঁই নাই।

সভাপতি : উমর ফারুক
সাধারণ সম্পাদক : আহমেদ রাজু
দুর্গাপুর ব্লাড ডোনার সোসাইটি'

১৮ জুলাই, মৃত্যুর একদিন আগে বাংলাদেশের নোংরা পলিটিক্স সম্পর্কে মন্তব্য করে, ফেসবুক পোস্টে লেখেন—'বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে ছোটবেলা থেকেই কোন ইন্টারেস্ট ছিল না। বর্তমানেও নেই, ভবিষ্যতেও থাকবে না। আমি আজ পর্যন্ত যতগুলো মানুষের পাশে থেকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছি, তা সম্পূর্ণ অরাজনৈতিকভাবে। আমার স্বেচ্ছাসেবক ভাইদের সাথে নিয়ে দেশের খারাপ পরিস্থিতিতেও সাধ্যমতো চেষ্টা করে গেছি। আজ পর্যন্ত কারো পা চাটিনি। এইজন্য বুক ফুলিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে ভয় পাই না। দেশের এই বাজে পরিস্থিতিতে যারা নাটক শুরু করছেন, নাটক বন্ধ করেন। মানুষের অভিশাপ খুবই ভয়ংকর, আল্লাহ ছাড় দেয়, যখন ধরে তখন পার পাবেন না।'

উমর ফারুক অন্তরের গভীর থেকে বিশ্বাস করতেন যে, জালিমের মসনদ চিরস্থায়ী নয়। আল্লাহ্ ছাড় দেন, কিন্তু ধরলে কেউ রেহাই পায় না। স্বৈরাচারী হাসিনা ও তার দলবলও সেই ছাড় পায়নি; কিন্তু এর মাঝেই আমরা হারিয়েছি উমর ফারুকসহ আরও দুই হাজার তাজা প্রাণ। বিশ হাজারের অধিক মানুষ আহত হয়েছে এই স্বাধীনতার সংগ্রামে। তবে প্রশ্ন থেকে যায়—এরপরও কি আমরা সত্যিকার অর্থে স্বাধীন হতে পেরেছি?

১৮ জুলাই ময়মনসিংহ শহরে ছাত্র-জনতা সবাই ফ্যাসিস্ট হাসিনার বিরুদ্ধে রাজপথে স্রোতের ন্যায় নেমে আসেন। শহীদ উমর ফারুক, ফেসবুক পোস্টে ময়মনসিংহবাসীদের উদ্দেশ্য বলেন, 'ধন্যবাদ প্রিয় ময়মনসিংহবাসী। আপনারা ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকবেন। শুভদিন আসিতেছে, ইনশাআল্লাহ।'

শুভদিন এসেছে ভাই, কিন্তু ২৪-এর একজন বীর হিসেবে নিজেকে ইতিহাসের পাতায় চির অম্লান করে রেখে গিয়েছো ভাই! কমেন্টে স্নেহের একমাত্র অনুজ 'আবদুল্লাহ অনিক' মন্তব্য করেন—'ইস ভাই রে, তুই ও তো ইতিহাস হয়ে থাকবি ভাই!' অনিক চায়নি তার ভাই ইতিহাসের অংশ হোক। অনিকের আর্তনাদ কি আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করবে?

১৮ জুলাই, 'রাক্ষুসী হাসিনা' যখন লাশের নেশায় উন্মাদ, তখন শহীদ উমর ফারুক রহিমাহুল্লাহ জীবনের শেষ ফেইসবুক পোস্টে প্রতিবাদস্বরূপ বলেন—'১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনে শহীদ হয়েছিল ৩৯ জন। ১৮ জুলাই ২০২৪ সালে একদিনেই মারা গেছে ৪১ জন। ছাত্রদের বুকে গুলি করে আজ পর্যন্ত কেউ পার পায়নি। আমার ভাইদের, ছোট ছোট বাচ্চাগুলোর তাজা রক্তের হিসাব দিতে হবে। আমরা মাঠে আছি, ঘরে বসে না থেকে ইতিহাসের সাক্ষী হোন।'

উমর ফারুক কীভাবে আন্দোলন জড়ান? কোন সেই আদর্শ তাকে জীবনের সর্বোচ্চ ত্যাগ করতে উৎসাহিত করে? এ প্রশ্নগুলো আমাদের হৃদয়ে আলোড়ন তোলে। শৈশব-কৈশোর পেরিয়ে রাজপথে লড়াকু এই বীরের আত্মত্যাগ আমাদের পরবর্তী প্রতিটি ইনসাফ কায়েম আন্দোলনের অংশ হয়ে থাকবে।

শহীদ উমর ফারুক: ভারতীয় তাবেদারদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর

শহীদ উমর ফারুক রহিমাহুল্লাহ ছিলেন একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক। আনুষ্ঠানিকভাবে পহেলা জুলাই আন্দোলনের ঘোষণার আগে অবৈধ হাসিনা সরকারের ভারতকে দেওয়া ট্রানজিট সুবিধার বিরোধিতা করেন। এ প্রসঙ্গে ২৭ জুন ২০২৪-এ ফেইসবুক পোস্টে লেখেন—'ভারত বাংলাদেশের রেল ট্রানজিট নিয়ে কিছু কথা বলি। ব্রিটিশরা যখন প্রথম ভারতবর্ষে ব্যবসা করতে আসে, আওরঙ্গজেব তখন এদেরকে ভারতছাড়া করছিল। কিছুদিন পর আবার ভারতে এসে সুবাদারদের ওয়াইন খায়িয়ে, ঘুস দিয়ে সুসম্পর্ক করল এবং ইংরেজরা দুটো জাহাজ ভেড়ানোর অনুমতি পাইল। কিছুদিন পর জাহাজ রাখার ঘাট চাইল, ঘাট পাহারা এবং নিরাপত্তার জন্য সৈন্য আসল, অফিসার আসল। রমরমা ব্যবসা শুরু হলো, দুর্গ হলো, নিজেদের শক্ত অবস্থান হওয়ার পর ইংরেজরা পল্টি মারল। তারপর ইংরেজদের হাতেই মুঘলদের পরাজয় হয় এবং ভারতবর্ষ ২০০ বছর ইংরেজদের গোলামী করে শুধুমাত্র দুইটা জাহাজ ভেড়ানোর ঘাট দিয়ে।

যদি এমনটা হয়, ভারত রেল ট্রানজিট নিলো। ব্যবসার সুবাদে নিরাপত্তার জন্য সৈন্য আনল। বাংলাদেশের ভেতর ঘাঁটি স্থাপন করল। নিজেদের অবস্থান শক্ত হওয়ার পর নিজেদের বাপ-দাদার সম্পত্তি বলে বাংলাদেশকে চালিয়ে দিল!' উমর ফারুক ইতিহাসের শিক্ষার্থী হিসেবে বেশ ভালোভাবে উপলব্ধি করেছিল ট্রানজিটের ভয়াবহতা। আর ভারত বিরোধিতা করা মানে অঘোষিত মৃত্যুর সাথে লড়াই করা। মৃত্যুর ভয় কখনো তাকে পর্যদুস্ত করতে পারেনি।

রক্তাক্ত লাল ওড়নায় জড়ানো নিথর দেহ

শহীদ উমর ফারুকের স্মৃতিচারণ করে আম্মা 'কুলসুমা আক্তার' আর্তনাদ করে অশ্রুসিক্ত নয়নে বলেন—'আমার উমর মানুষের উপকারই করত। এই জন্যই মৃত্যু হয়েছে। মানে সে অন্যায় জিনিসটা সহ্য করতে পারত না। অনেক ছাত্র মারা গেছে,

আমার উমর এটা সহ্য করতে পারেনি। বন্ধুরা বলেছে, উমর আজকে বের হইস না। সে বলতো তোরা চুড়ি পরে বসে থাক। তোরা কাপুরুষ।

শুক্রবার সকাল থেকে বের হওয়ার জন্য ছটফট করছিল। তার সব বন্ধুদের বের হওয়ার জন্য ফোন দিচ্ছিল। বন্ধুরা বলে, 'আমরা আজকে বের হবো না।' জুম্মার সালাত আদায় করে বাসায় এসে ভাত খায়। তারপর রুমের বন্ধুদের বের হওয়ার জন্য বলে, অনেকেই বের হয়, অনেকেই বের হয়নি। এই যে রোজা গেল। রোজার মাঝে পনেরো দিন সেহেরি রান্না করে খাওয়ায়। আমি খাটের ওপরে বসে আছি বাবা। আমি মা জননী মিথ্যা কথা বলছি না। ভাত পাক করে আমারে ডাক দিয়েছে। 'আম্মা,আম্মা,আম্মা, উঠো। রাত তো শেষ হয়ে যাচ্ছে।' তড়িঘড়ি করে উঠে গিয়ে আমি গ্যাসের চুলার কাছে দেখি ভাত বুদবুদ করতেছে। ভাত গরম হাফ উঠতেছে। হোস্টেলে মাঝে মধ্যে বুয়া আসত না। পাক করে খেয়েছে, এভাবেই রান্না করা শিখে ফেলে। একদিন আমাদের রাত শেষ হয়ে গিয়েছে। ওইদিন সে না খেয়ে রোজা রাখছে। আমার ছেলে কোনোদিনও রোজা মিস দিতো না। রোজা ত্রিশটাই রাখতো। উমর মা-বাবার সাথে কোনদিন বেয়াদবি করেনি। বাসায় আসলেই নুডলস, খিচুড়ি পাক করে খাওয়াত। আমার উমরের ব্যবহার এতো অমায়িক ছিল, কোনো মানুষের সাথে পাঁচ মিনিট কথা বললে সবাই তার প্রতি মুগ্ধ হয়ে যেত। আমার পাঁচ ওয়াক্ত নামাজি ছেলেটাকে মাইরা ফেলল!

মেট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার পর আমার উমর তাবলীগে এক চিল্লায় যায়। চিল্লা থেকে আসার পর থেকে উমর নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করত। চিল্লা দিয়ে এসে উমর তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করা শুরু করে।

ছোট ভাইয়ের সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল। আমার উমরকে যে নাস্তা খাওয়ার খরচ দিতাম, সেটা থেকে বাঁচিয়ে ছোট ভাইয়ের জন্য কাপড় কিনে নিয়ে আসত। 'ভাইয়া তুই আসার সময় আমার জন্য কাপড় প্যান্ট শার্ট নিয়ে আসবি'—আমি কোথা থেকে আনব? আমি কি টাকা ইনকাম করি? এগুলো বলে আবার আসার সময় কাপড় নিয়ে আসছে। আমার উমর বলত, 'আম্মা তুমি টাকা টাকা কোরো না। তুমি ২ থেকে ৩ বছর অপেক্ষা করো, আমি টাকা দিয়ে তোমার বিছানা ভরে দিব।'

পড়াশোনা আর মানুষের সেবা করাই ছিল আমার উমরের নেশা। বিসিএস-এর পড়া পড়ত। বিকালে অবসর টাইমে পাহাড় ও নদীর তীরে ঘুরতে যেত। বাবা, আমার উমর ইংলিশে কথা বলতে পারত।

আমার তো মূল্যবান সম্পদটাই শেষ করে দিয়েছে। আমার জীবনটাই শেষ করে দিয়েছে। এখন আমার পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে। উমর মারা যাওয়ার পরে পরিবারে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা লেগেই থাকে। আমি আমার পুতের চিন্তায় মগ্ন। উমরের বাবা উমরের কথা চিন্তা করলে প্রেশার বেড়ে যায়। আর অনিক তো পাগলের মতো হয়ে যায়। এই বিভীষিকা কি ভুলে থাকা যায়? আমার উমরের স্বপ্ন, উমরের চেহারা। উমরের যে ভালোবাসা আমাদের প্রতি ছিল, এগুলো কি ভুলে যাওয়ার বিষয়?

আজকে ১৯ ডিসেম্বর, উমরের মৃত্যুর পাঁচ মাস পূর্ণ হলো। বাবা, এই স্মৃতি কীভাবে ভুলব?! বাকি জীবন কীভাবে পার করবো? প্রতিটা দিন যেন আজাবের মতো লাগে। শূন্য শূন্য লাগে। আমি যে শুধু বেঁচে আছি। এতটুকুই। কীভাবে আমি বেঁচে আছি? উমরের কথা মনে হলে আমার শরীর নিস্তেজ হয়ে যায়। আমার উমরের এতো সুন্দর চেহারা এতো নষ্ট করছে। একটা গুলি করেছে হয়নি। একটা গুলি লাগার পর আমার উমর দৌড় দিয়েছে। দৌড় দিয়ে পড়ে গিয়েছে; এরপর আমার উমরকে আরো দুটো গুলি করেছে। তিনতলা থেকে দুইজন মহিলা নেমে এসে লাল একটা ওড়না দিয়ে প্যাঁচ দেয়।

ছবি: তিনতলা ভবনের দুইজন নারীর লাল ওড়না জড়ানো মৃত উমর ফারুক।

পুলিশের অতর্কিত গুলিতে বন্ধুরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। পরিস্থিতি শীতল হলে আমার উমরকে না পেয়ে তার বন্ধুরা আসে। প্রথমে লক্ষ্মীবাজারের কাছের হাসপাতাল নিয়ে যায়। তারপর ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। আমার উমরকে পুলিশ পরপর তিনটা গুলি করে। দুই বন্ধু একসাথে আন্দোলনে ছিল। উমর পানি খেয়ে এসে আন্দোলনে আবার যোগ দেয়। অতঃপর গুলিবিদ্ধ হয়। উমরকে যখন মৃত ঘোষণা করে, বন্ধুরা হাসপাতাল থেকে নিয়ে আসতে পারেনি! এদিকে সারাদেশে কারফিউ। কারফিউয়ের মধ্য আমরা দুর্গাপুর থেকে রওনা করি।

বাবা, ৪৫ হাজার টাকা ফ্রিজিং গাড়ি ভাড়া নিয়েছে, আমরা তিনজন ঢাকা গিয়েছিলাম। দুইদিন শুধু আমরা এক থানা থেকে অন্য থানার বারান্দায় ঘুরাঘুরি করেছি। উমর কোথায় আছে, থানাওয়ালা বের করে দেয় না! তিন দিন পর ২১ জুলাই আমার উমরের মৃতদেহ বের করে দেয়। পোস্টমর্ডাম করেছে। গোসল করিয়েছে, তোমার মতো উমরের বন্ধু হাফেজ, দাড়ি আছে। কবি নজরুল কলেজে পড়ে। আমার উমরকে যে গোসল করিয়েছে তাকে-সহ বাকী তিনজন বন্ধুকে আমাদেরকে বিদায় দেয়ার পর পর পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। উমরের হাফেজ বন্ধুর দাড়ি থাকার কারণে পুলিশ 'শিবির' মনে করে অমানসিক নির্যাতন করে।

মায়ের সাথে অন্তিম কথোপকথন

আন্টি আপনার সাথে উমর ফারুক-এর শেষ কথোপকথন কী ছিল? এ প্রশ্ন করলে আন্টি নির্বাক হয়ে যান! আন্টি দয়া করে বলুন! সবাইকে জানাতে হবে। আপনার উমরের গল্প ইতিহাসে অম্লান হয়ে থাকবে। আন্টি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হলেন। উমরের সাথে শেষ কথোপকথন বলতে শুরু করলেন—জুম্মার নামাজের পর উমরকে ফোন দিই। উমর আমাকে বলে, 'আম্মা আমি নামাজ করে বাসায় যাচ্ছি।' নামাজ-এর প্রায় এক ঘণ্টা পরে কল দিলে বলে, 'আম্মা আমি বাসা থেকে বের হচ্ছি।' উমরের আম্মা প্রশ্ন করেন, 'তুমি গণ্ডগোলের মধ্যে বের হচ্ছো কেন?' উমর বলে, 'আম্মা তুমি শুধু শুধু আমার জন্য টেনশন করো না। কোনো সমস্যা হবে না। আব্বু (প্রবাসী) ২৪ জুলাই দেশে আসলে আমরা একসাথে বাড়িতে চলে আসব! আম্মা এখন বাড়িতে আসা যাবে না।' কেন আসা যাবে না? প্রতিউত্তরে উমর বলে, 'আমার ভাইদের মারতেছে গুলি করে। আমি বাড়িতে বসে থাকব। আমি কি স্বার্থপর। এমনটা করলে স্বার্থপরের মতো আচরণ হবে আম্মা।'

যারা আত্মগোপনে ছিল, শুক্রবারের আন্দোলনে যায়নি, তারা তো বেচে গেছে বাবা। কিন্তু আমার উমর তো বাঁচেনি। এটা বলে আমার উমর বাসা থেকে বের হয়। বের হওয়ার প্রায় এক ঘণ্টা পরেই আমার উমর শহীদ হইয়া যায় বাবা!

যখন নেট অন ছিল, তখন শুধু ইউটিউবে মারামারি কাটাকাটি দেখতাম। পুলিশের ধাওয়া-পাল্টা-ধাওয়া দেখতাম। আমি এগুলো দেখে কান্নাকাটি করতাম। বেশিরভাগ সময় তখন উমরকে ফোনে পাওয়া যেত না। আমি এজন্য আমার উমররে না করেছিলাম আন্দোলন যেন না যায়, বাবা। লাশ নিয়ে আসার সময় উমরের বন্ধুরা জায়নামাজ, তজবি, মেসওয়াক, টুপি এগুলো দিয়ে দেয়।'

বুকফাটা আর্তনাদ

আমার বাবা তো দুনিয়াতে সম্মানে রেখে গেছে আমাদের লাইগা। যেখানেই যাই আমাদের তো সম্মানের কোনো শেষ নাই। যেকোনো অফিস আদালতে গেলে অফিসাররা চেয়ার টেনে এনে দেয়,বলে উমর ফারুক এর আম্মা, উমর ফারুক-এর আব্বা। আমার পুত অনেক সম্মান রাইখা গেছে আমাদের লাইগা। আমাদের তো বাবা মাথা ঠিক নেই। আমাদের এখন মাথা ঠিক মতো কাজ করে না। সবকিছু ভুলে যাই! আমার মূল্যাবান সম্পদ শেষ হয়ে গেছে বাবা। কথাগুলো বলতে বলতে আন্টির কণ্ঠ নিস্তেজ হয়ে আসে। চোখের জলের মধ্য দিয়ে বুকফাটা আর্তনাদ স্পর্শ করা যায়।

প্রবাসী বাবার আর্তনাদ

উমরের মৃত্যু সম্পর্কে উমরের বাবার কাছে জানতে চাইলে বলেন,—'উমরের মৃত্যু সংবাদ যখন শুনতে পাই, আমি তখন দুবাই। ২৪ জুলাই দেশে আসার জন্য হাফডাউন টিকিট কেটে রাখি। কথা ছিল, ২৪ জুলাই, উমর আমাকে এয়ারপোর্টে রিসিভ করবে!

১৯ জুলাই আমি তখন ডিউটিতে, কাজ শেষ হওয়ার এক ঘণ্টা সময় বাকী আছে! এরকম মুহূর্তে আমাকে ফোন করে বলল,উমর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছে, মারা গেছে এরকম কেউ বলেনি। আমি আশাহত হয়ে যাব, এজন্য প্রথমে কেউ মৃত্যু সংবাদ বলেনি। এসময় ইন্টারনেট বাংলাদেশে বন্ধ থাকায় কথা অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। একটু পর আরেকজন ফোন দিয়ে বললো—'এখন যেহেতু তুমি শুনতে পাচ্ছো আমি সরাসরি বলছি! আগামীকালের মধ্যে যেকোনো উপায়ে দেশে চলে আসো। উমর আর নেই! উমর ফারুক গুলিবিদ্ধ হয়েছে এবং মারা গেছে।'

তারপর রাতের মধ্যে অনেক কষ্ট করে ডাবল পয়সা দিয়ে বাংলাদেশ বিমানে টিকেট করি। ইমার্জেন্সি তো ডাবল পয়সা নিবেই। তারপর আর প্রশ্ন করি না, যত চাই ততোই টাকা দিয়ে দিই। টিকিট নিয়ে হেড অফিস আবুধাবিতে গেলাম। পাসপোর্টও দিতে চাচ্ছিল না, বহুত কষ্ট করে পাসপোর্ট নিলাম। পাসপোর্ট নিয়ে রাতের মধ্যে বাংলাদেশে ফ্লাইটে উঠি। ২০ জুলাই, সকাল ১০ টায় বাংলাদেশ এয়ারপোর্টে এসে আরেক বিড়ম্বনার সম্মুখীন হই। বাংলাদেশ এয়ারপোর্টে এসে কোনো গাড়ি পাচ্ছিলাম না। গাড়ি না পাওয়ার কারণে আমি আমার উমরের কাছে যেতে পারিনি! বাবা, গাড়ি না থাকায় আমার উমরের লাশের কাছে চলে যেতে পারিনি। এতো টাকা খরচ করে

এসেও আমার উমরকে দেখতে ঢাকা মেডিকেল মর্গে যেতে পারিনি! এর মধ্যে এয়ারপোর্ট পাঁচজন যাত্রীসহ একটা কোস্টার দেখতে পাই। আমাকে জিজ্ঞেস করল? ময়মনসিংহ যাবেন? পাঁচ হাজার টাকা লাগবে। কী আর করা, তিনশো টাকার ভাড়া আমি পাঁচ হাজার টাকাতেই রাজি হই।

এর মধ্যে আসার পথে ঢাকায় এক ব্যারিকেডের মধ্যে পরি। সাতজন লোককে পুলিশ নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে! আর্মি আমাদের বলল, 'সাত জন লোক মারা গেছে! সামনে গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে,আপনারা ওইদিকে যাইয়েন না, বিপদে সম্মুখীন হতে পারেন। আপনারা ব্যাক করে পিছে ফিরে যান।' আমরা পিছে গিয়ে বিকল্প রাস্তায় বহুত কষ্ট করে ময়মনসিংহ আসি।

ময়মনসিংহ এসে পড়ি আরেক বিড়ম্বনায়। ড্রাইভার আমাদের বাইপাস রোডে নামিয়ে দিয়ে বলল, 'ভাই আমি ভেতরে যামু না। আমারে মাইরা ফেলব। আমার গাড়ি পুড়াইয়া দিব। আমি গরিব মানুষ ভাই।' তারপর দুর্গাপুর চলে আসি।'

কল্পনা করুন একবার, কী দুঃসহ স্মৃতি বয়ে বেড়াচ্ছেন শহীদ উমর ফারুক-এর বাবা। সদূর প্রবাস থেকে রাতের মধ্যে দেশের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। দেশে এসেও ছেলের মরদেহ দেখার জন্য ঢাকা মেডিকেল যেতে পারলেন না! অথচ এরকম হওয়ার কথা কি ছিল? দীর্ঘদিন প্রবাস জীবন শেষে ২৪ জুলাই দেশে আসবেন। কথা ছিল ঢাকায় পড়ুয়া বড় ছেলে উমর ফারুক বাবাকে এয়ারপোর্ট থেকে রিসিভ করবে। কতো স্বপ্ন কতো আশা নিয়ে দেশে আসার আয়োজন সম্পন্ন করেছিলেন। কিন্তু একটা কালবৈশাখী ঝড় সবকিছু তছনছ করে দিল। দেশে ঠিকই আসলেন ছেলের মৃতদেহ দেখতে; কিন্তু নিয়তির কী নির্মম পরিহাস, মেডিক্যাল যেতে পারলেন না। মৃত্যুর তিনদিন পর ২১ জুলাই ঠিকই দেখেন; কিন্তু এই সাক্ষাৎ কি প্রত্যাশিত ছিল বাবার?

ছেলের প্রতিষ্ঠিত ব্লাড ডোনার সোসাইটি সম্পর্কে বলেন,—'আমি দেশে আসার পর শত শত পরিবার আমার পায়ে ধরে মাফ চেয়েছে! সবার একই কথা, আমরা উমর ফারুক-এর কাছে ঋণী,আপনার ছেলের কাছে ঋণী। উমর ফারুক তো নেই। তার বাবা হিসেবে আমাদের মাফ করে দেবেন।

আমাদের দূর্গাপুরের হাসপাতালে রাত তিনটার সময় এক ছেলের জরুরি ব্লাড লাগে। আমার উমর তখন ঢাকায় অবস্থান করছিল। দুর্গাপুর হাসপাতাল থেকে ডাক্তার আমার উমরকে ফোন দিয়ে বলে, '৩০ মিনিট এর মধ্যে ব্লাড মেনেজ করতে না পারলে মারা যাবে।' উমর সাথে সাথে বালিকান্দির একটা ছেলেকে ফোন

দিয়ে দ্রুত হাসপাতালে পাঠায়। তড়িৎ ব্লাড ম্যানেজ হওয়ায় মৃত্যুপথযাত্রী ছেলেটি বেঁচে যায়। উমরের জানাজার সময়, এই ছেলের বাবা এসে অনেক কান্নাকাটি করে। (আপনার ছেলে) আমার ছেলের জীবন বাঁচিয়েছে। আজকে আপনার ছেলে মারা গিয়েছে। আমি আপনার কাছে মাফ চাই।'

উমরের বাবা অস্ফুট আর্তনাদ করে বলেন—'বাবা আমরা কেউ ভালো নেই। আমার এতো সুন্দর সাজানো গোছানো পরিবারটা ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রতিনিয়ত আমার প্রেশার হাই হয়ে যায়। আমি প্রতিদিন এখন তিনটা করে হাই প্রেশার-এর ট্যাবলেট খেয়ে বেঁচে আছি!'

শহীদ উমর ফারুক ব্লাড ডোনার সোসাইটি

ছোটবেলা থেকেই উমর ফারুক নিঃস্বার্থভাবে মানুষের জন্য কাজ করেছেন। যার দরুণ এলাকার সবার প্রিয়মুখ উমর ফারুক। মৃত্যুর সময় শেষবারের মতো উমর ফারুককে দেখার জন্য জনতার স্রোত তার প্রমাণ বহন করে। ধর্মীয় সুমহান বাণী উমর ফারুককে অনুপ্রাণিত করেছিল মানুষের জন্য কিছু করার। সে অনুপ্রেরণা থেকে উমর ফারুক ব্যক্তিগতভাবে ক্ষুদ্র পরিসরে দুস্থ অসহায় মানুষের জন্য সেবামূলক কাজ করতেন। কিন্তু এতে উমর ফারুক পরিতৃপ্ত হতে পারছিলেন না। আরো বড় পরিসরে জনকল্যাণমূলক কাজ করার জন্য ২০২১ ঈসায়ী পহেলা মার্চ প্রতিষ্ঠা করেন 'দুর্গাপুর ব্লাড ডোনার' সোসাইটি। রক্তের সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য উমর ফারুক ব্লাড ডোনার সোসাইটি দুর্গাপুর, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ কিংবা ঢাকা যেখান থেকেই ফোন আসতো, তার টিম দিন-রাত একাকার করে কাজ করত। প্রশ্নের বিষয় হলো, 'ব্লাড ডোনার সোসাইটি' কীভাবে সর্বস্তরের জনকল্যাণমুখী কাজে অংশগ্রহণ করত; এর উত্তর শহীদ উমর ফারুক রহিমাহুল্লাহ টাইমলাইনে ফেইসবুক পোস্টে দেওয়া আছে। ১৯ জুলাই মৃত্যুর প্রায় সাড়ে তিন মাস আগে 'দুর্গাপুর ব্লাড ডোনার সোসাইটি'-এর তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে পহেলা মার্চ ২০২৪ ফেইসবুক পোস্টে বলেন—'আজ পহেলা মার্চ, ২০২৪।

২০২১ সালের আজকের এইদিনে আমার, আপনার আমাদের সবার প্রাণের সংগঠন দুর্গাপুর ব্লাড ডোনার সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিগত তিন বছরে আমাদের সংগঠন থেকে প্রায় ৫৫০ ব্যাগ রক্ত দিতে সক্ষম হয়েছি। রক্তদানসহ গরীব, অসহায় মানুষদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী, করোনাকালে মাস্ক বিতরণসহ বন্যার্তদের পাশে নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী সবাইকে সাথে নিয়ে তাদের

পাশে থেকে তাদের দুঃখ ভাগাভাগি করে নিতে পেরেছি। দেশের ক্রান্তিকালে মানুষদেরকে সচেতন রাখার জন্য বিভিন্ন সামাজিক কাজের মাধ্যমে চেষ্টা করেছে গ্রুপের প্রত্যেকটা সদস্য।

আপনাদের সবার দোয়া, ভালোবাসা এবং সমর্থন কামনা করছি। অন্তত রক্তের অভাবে আপনার চোখের সামনে যাতে কেউ মারা না যায়। এই দিকটা চিন্তা করে সবাই রক্তদানের মতো মহৎ কাজের দিকে নিজে উৎসাহিত হই, অন্যজনকে উৎসাহিত করি। রক্ত দিন, জীবন বাঁচান! রক্ত দিলে হয় না ক্ষতি! জাগ্রত হয় মানবিক অনুভূতি! রক্তদান জীবন দান, রক্তের কোনো জাত বা ধর্ম হয় না! পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহৎ কাজ হচ্ছে মানবসেবা এবং শ্রেষ্ট দান হচ্ছে রক্তদান! আপনাদের দোয়া এবং ভালোবাসায় হাজার হাজার মানুষের জীবন বাঁচাতে এগিয়ে যাবে দুর্গাপুর ব্লাড ডোনার সোসাইটি।'

উমর ফারুক শহীদ হওয়ার ১২ দিন আগে ৭ জুলাই 'দূর্গাপর ব্লাড ডোনার সোসাইটি' সর্বশেষ আপডেট জানিয়ে পোস্ট করেন। পোস্টে উমর ফারুক বলেন—

'আসসালামু আলাইকুম।

২০২১ সাল থেকে এখন পর্যন্ত আমাদের সংগঠন থেকে ৬০০+ ব্যাগ ব্লাড দেওয়া হয়েছে। আমাদের মেসেঞ্জার গ্রুপে সীমিত সংখ্যক মেম্বারের বাহিরে এড করার সুযোগ নেই। আমরা যদি ৩০ সেকেন্ড সময় দিয়ে ২০ জন করেও মেম্বার এড দিই, ইনশাআল্লাহ এখান থেকে অনেক ডোনার পাওয়া যাবে। যারা মানুষের বিপদে নিজের মূল্যবান রক্ত দিয়ে পাশে থেকে একটা প্রাণ বাঁচাতে ভূমিকা রাখতে পারে।'

আহ! রক্তদানের মাধ্যমে মানুষের প্রাণ বাঁচানোর জন্য কী নিদারুণ আকুল আবেদন। অথচ নিজের জীবনটাই রক্তের সাগরে নিমজ্জিত হওয়ার মধ্য দিয়ে বিলীন করে দিলেন। আহ! পুলিশের লাগাতার ছোঁড়া তিনটা বুলেট ক্ষতবিক্ষত করে উমর ফারুকের সুঠাম দেহের সুদর্শন চেহারা।

উমর ফারুক তার প্রতিষ্ঠিত দুর্গাপুর ব্লাড ডোনার সোসাইটিকে শুধু রক্ত সরবরাহ, ত্রাণ বিতরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। ফেরাউন রাক্ষসী হাসিনা উন্মাদ জালিমের হাত থেকে মুক্তির জন্য এলাকায় দুর্বার প্রতিবাদ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন, তার প্রতিষ্ঠিত 'দুর্গাপুর ব্লাড ডোনার সোসাইটি'-এর মাধ্যমে; যার বর্ণনা শুরুতে পড়েছেন।

উমর ফারুকের টাইমলাইন ঘাঁটলে পাবেন ব্লাড ডোনেশন নিয়ে অজস্র পোস্ট। ১৪ জুলাই মৃত্যুর ৫ দিন আগেও একজন ক্যান্সার-আক্রান্ত রোগীর রক্তের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মৃত্যুর পর শহীদ উমর ফারুক-এর প্রতিষ্ঠিত 'দুর্গাপুর ব্লাড ডোনার সোসাইটি'-এর নাম পরিবর্তন করে 'শহীদ উমর ফারুক ব্লাড ডোনার সোসাইটি' রাখা হয়।

শহীদ উমর ফারুক ব্লাড ডোনার সোসাইটি
Omar Faruk · Mar 1

আজ ১লা মার্চ,

২০২১ সালের আজকের এইদিনে আমার, আপনার আমাদের সবার প্রাণের সংগঠন দুর্গাপুর ব্লাড ডোনার সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো,

বিগত তিন বছরে আমাদের সংগঠন থেকে প্রায় ৫৫০ ব্যাগ রক্ত দিতে সক্ষম হয়েছি আমরা।

রক্তদান সহ গরীব, অসহায় মানুষদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী, করোনাকালে মাস্ক বিতরণ সহ বন্যার্তদের পাশে নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী সবাইকে সাথে নিয়ে তাদের পাশে থেকে তাদের দুঃখ ভাগাভাগি করে নিতে পেরেছি।
দেশের ক্রান্তিকালে মানুষদেরকে সচেতন রাখার জন্য বিভিন্ন সামাজিক কাজের মাধ্যমে চেষ্টা করেছে প্রত্যেকটা সদস্য।

আপনাদের সবার দোয়া, ভালোবাসা এবং সমর্থন কামনা করছি, অন্তত রক্তের অভাবে আপনার চোখের সামনে যাতে কেউ মারা না যায় এইদিকটা চিন্তা করে সবাই রক্তদানের মতো মহৎ কাজের দিকে নিজে উৎসাহিত হই, অন্যকেও উৎসাহিত করি।
রক্ত দিন জীবন বাঁচান! রক্ত দিলে হয় না ক্ষতি!
জাগ্রত হয় মানবিক অনুভূতি! ♥
রক্তদান জীবন দান, রক্তের কোনো জাত বা ধর্ম হয় না!
পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহৎ কাজ হচ্ছে মানব সেবা
এবং শ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে রক্তদান!

ব্যক্তিগত জীবন

উত্তর মেঘালয় ভারতের সীমান্ত লগ্নে গারো পাহাড়, কালের সাক্ষী বহনকারী হালকা নীলাভ জলের স্বচ্ছ পানির সোমেশ্বরী নদীর তীরে গড়ে উঠা দুর্গাপুর উপজেলার একটি ঐতিহ্যবাহী অঞ্চল হলো দুর্গাপুর ইউনিয়ন। উমর ফারুক গারো পাহাড়ের বুক চিড়ে প্রবাহিত সোমেশ্বরী নদীর তীরবর্তী নেত্রকোনা জেলার, দুর্গাপুর থানা পুলিশ মোড় সংলগ্ন এলাকায় ১৩ জানুয়ারি ২০০০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে আব্দুল খালেক ও কুলসুমা আক্তার দম্পতির বড় ছেলে উমর ফারুক জন্মগ্রহণ করেন। দু'ভাই এর মধ্যে উমর ফারুক বড়। উমর ফারুক জন্ম ও বেড়ে উঠা নির্মল গারো পাহাড় ও সোমেশ্বরী নদীর স্বচ্ছ পানির গারো পাহাড়ের প্রাকৃতিক পরিবেশে। নির্মল প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য উমর ফারুক-এর জীবন সকল পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত রেখেছিল।

দুর্গাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উমর ফারুক-এর প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার সূচনা। কৃতিত্বের সাথে জিপিএ ৫ পেয়ে প্রাথমিক-এর পাঠ চুকিয়ে মাধ্যমিক ভর্তি হন

'এম.কে সি.এম দুর্গাপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে। মাধ্যমিক এর পাঠ চুকিয়ে ২০১৮ ঈসায়ী উচ্চ মাধ্যমিক ভর্তি হন 'সুসং দুর্গাপুর সরকারি' কলেজে। সংক্ষিপ্ত অথচ মহাকাব্যিক জীবনের প্রথম ২০ বছর নিবিড়ভাবে কাটে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সুসং দূর্গাপুরে। উচ্চ শিক্ষার জন্য পাড়ি জমান ঢাকায়। সরকারি কবি নজরুল কলেজে স্নাতক ভর্তি হন। অতঃপর তৃতীয় বর্ষে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে অধ্যয়নরত অবস্থায় উমর ফারুক রহিমাহুল্লাহ ঢাকার লক্ষ্মীবাজার সংলগ্ন এলাকায় জীবনের ইতি হয় জালিম হাসিনার পুলিশের পরপর তিনটা বুলেট-এর মাধ্যমে।

ব্যারিকেড, উত্তাল এলাকাবাসী, শেষ বিদায়

মৃতদেহ বাড়িতে আনা ও জানাজার বর্ণনা দিয়ে শহীদ উমর ফারুকের আপন ছোট ভাই আব্দুল্লাহ অনিক বলেন— 'যেদিন লাশটা দুর্গাপুর নিয়ে আসা হয়। ওইদিন ৭-৮ হাজার মানুষ শুধু লাশের জন্য অপেক্ষা করেছে। শুধু লাশটা দোখার জন্য। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এসেছে। মারা যাওয়ার তিন দিন পর লাশ নিয়ে আসা হয়। রেফ্রিজারেটরের পর্যাপ্ত ঠান্ডায় না রাখার কারণে লাশের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। আমরা লাশ দুর্গাপুর আনতে পারিনি। এলাকাবাসী উত্তেজিত হয়ে যাবে; যার ফলে অনাকাঙ্ক্ষিত অনেক কিছু ঘটতে পারত। প্রচণ্ড ভীড়-এর কারণে আব্বু অনেকবার চেষ্টা করেও লাশ দেখতে পারেননি।

দুর্গাপুর ব্লাড ডোনার সোসাইটি
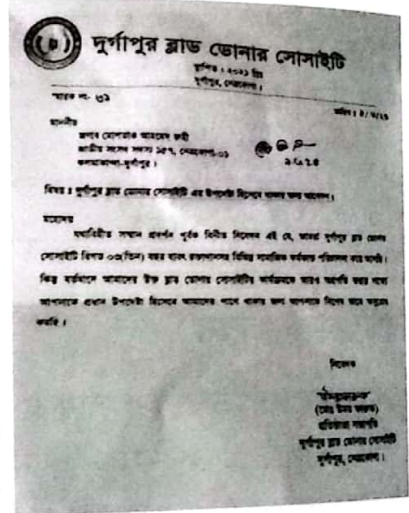
২১ জুলাই রাত ১০ টার সময় মৃত্যুর তিনদিন পর গ্রামের বাড়ি বাকলজোড়া ইউনিয়ন সিংধায় লাশ নিয়ে আসা হয়। আমার আপন চাচাতো ভাইদের অধিকাংশ হাফেজ, মাওলানা। রনি ভাই জানাযা পড়ান।

রাত ১০:৩০ মিনিটে ভাইয়ার জানাযা পড়ানো হয়। পুলিশের যে সদস্য আমার ভাইরে হত্যা করেছে, সরকারের কাছে তার বিচার চাই। আমাদের সরকারের কাছে দাবী একটাই, সরকার তদন্ত করে বের করুক আমার ভাইয়ের খুনীদের। আমরা এখনো কোনো বিচার পাইনি।'

বন্ধু সহপাঠী, এলাকবাসী কিংবা ঢাকায় সবার কাছে উমর ছিল প্রিয়পাত্র। জানাযায় শরিক হতে আশেপাশের অঞ্চলের সবাই সমবেত হয়। উপচে পড়া ভিড়ের কারণে কাউকে লাশ দেখানো সম্ভব হয়নি।

উমরের জানাযার সময় পুলিশ যাতায়াতের সম্ভাব্য সব জায়গায় ব্যারিকেড দিয়ে রাখে, যেন জানাযার সময় কোনো প্রকার বিশৃঙ্খলা না হয়। কর্তব্যরত পুলিশ সদস্যরা উমরের জনাযার সময়ে এলাকাবাসীর উমরের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা দেখে হতবাক হয়ে যায়। কী এমন গুণ ছিল উমরের?

উমর অতিমানব ধরনের কেউ ছিল না, তবে উমর মানুষের জন্য কাজ করত। দুর্গাপুর ও আশেপাশের অঞ্চলের যাদের সাহায্য প্রয়োজন হতো, উমর যথাসাধ্য চেষ্টা করত বিপদগ্রস্তদের পাশে থাকার। এ গুণটিই উমরকে সবার প্রিয়পাত্র করে তোলে।

শহীদ উমর ফারুকের 'আম্মা' নিয়ত করেছেন উমরা হজ করার। উমরার জন্য পাসপোর্ট করেছেন। ২০২৫ সালের জানুয়ারির প্রথম সাপ্তাহে কাবার মালিকের কাছে আন্টি বিচার দিয়ে আসবেন।

শহীদ উমর ফারুক রহিমাহুল্লাহ বাবা আব্দুল খালেক বড় সন্তানের মৃত্যুর সংবাদ শুনে আহাজারি করে বলেছিলেন—'আমি এখানে বক্তব্য দিতে আসি নাই! আমার হৃদয় ছারখার হইয়া যাইতাছে! আপনাদের সকলের কাছে দোয়া চাই। আমার উমর যেন উমর হইয়া থাকে।' আঙ্কেল সারা দেশবাসী আপনার উমর জন্য দোয়া করছে। ইনশাআল্লাহ আমাদের ভাই উমর জান্নাতে উমর হয়ে থাকবে..

তথ্যসূত্র:

১. শহীদ উমর ফারুক-এর বাব-মা ও ছোট ভাইয়ের যৌথ সাক্ষাৎকার

২. আলাউদ্দিন বেলাল, শহীদ উমর ফারুক-এর রুমমেট, বন্ধু,সহপাঠী ও আন্দোলনে সহযোদ্ধা সাক্ষাৎকার

তথ্য সংগ্রহে:

অন্তর সফিউল্লাহ;

স্টোরি মেকিং: অন্তর সফিউল্লাহ এবং ড. মোহাম্মাদ সরোয়ার হোসেন

বাবার হাতে সন্তানের মগজ

শহীদ সিফাতের বাবা নিজেই সন্তানের মৃত্যুর প্রত্যক্ষদর্শী। বাবার জবানীতেই সিফাতের শাহাদাতের মর্মান্তিক ঘটনাটি পাঠক সমীপে হুবহু উপস্থাপন করা হলো—

শহীদের নাম : মোঃ সিফাত হোসেন।
বয়স : ২৬ বছর ২ মাস (জন্ম- ২০ মে ১৯৯৮)
মৃত্যুর তারিখ :২০ জুলাই ২০২৪
পিতা : মো: কামাল হাওলাদার
মাতা : মোছা. পারভিন বেগম।
ঠিকানা : মিরপুর-১০, ঢাকা।
শিক্ষা : অনার্স (তৃতীয় বর্ষ), সরকারি গৌড়নদী কলেজ, বরিশাল।

এক. আমার বাসা মিরপুর ১০ নাম্বারে। আমার ছোট ছেলের নাম মো. রিফাত হোসেন, বয়স ১৮ বছর। সে ২০২৪ সালে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করছে। ছোট ছেলে শুরু থেকেই আন্দোলনে যাইতেছিল। বড় ছেলের নাম মো. সিফাত হোসেন, বয়স ছিল সাড়ে তেইশ। সে ফাঁকে ফাঁকে আন্দোলনে যাইত। বড় ছেলে দেশের বাইরে যাবে, এই কারণে আমি আবার চিল্লাচিল্লি করতাম, 'তোর গণ্ডগোলের মধ্যে যাওয়ার দরকার নাই।' ছোট ছেলেরে রাখতে পারতাম না। তার সাথের যে বন্ধু-বান্ধব, ওরা আইসা কল দিলেই বাসা থেকে বের হইয়া যাইত। বাসা মেইন রোডের সাথে তো, বাসার নিচে মানুষ দেখলেই বের হইয়া যাইত।

মিরপুর এরিয়ার মধ্যে দশ নম্বরেই সবচেয়ে বেশি গণ্ডগোল হইছে। আর আমার বাসা মিরপুর ১০ গোলচত্বর থেকে তিনটা বিল্ডিং পরেই। সে ক্ষেত্রে আমরা মোটামুটি প্রত্যক্ষদর্শী। আমাদের নিজ চোখে অনেক লাশ দেখছি। এমনকি কয়েকটা লাশ পুলিশের ট্যাঙ্কের ভেতরেও ঢুকাইছে—এই রকম ঘটনাও আমরা দেখছি। গুম কইরা ফেলল আরকি।

আমি আবার কিছুক্ষণ পরপর আমার ছোট ছেলেরে খুঁজতে যাইতাম। দেখতে যাইতাম, আন্দোলনে আছে ঠিক আছে, কিন্তু সেইফ আছে কি না। বেশির ভাগ সময় ফোন দিলে ফোন ধরত না। যদি চইলা আসতে বলি, এই কারণে ফোন ধরত না। এই কারণেই আমি বেশি প্রেশার নিতাম। আমিও একবার ওরে খুঁজতে যাইয়া গুলাগুলির মাঝখানে পড়ছি। পরে ফুটপাতের পাশে কারেন্টের খাম্বার আড়ালে দাঁড়াইছি।

বড় ছেলে ফাঁকে ফাঁকে আন্দোলনে যাইত। বেশিরভাগ সময় বাসা থেইকা আন্দোলনকারীদের খাবার বা পানি দিয়া আইত। দুই ছেলেই বাসা থেকে যাওয়ার সময় আন্দোলনকারীদের জন্য পানি, হালকা নাস্তা নিয়া যাইত। আর আমিও বেশ কিছু দিন নাস্তা-পানি দিছি। দেখি, আমার ছেলের বন্ধু-বান্ধব—সকাল-বিকাল ও তাদের সাথে আড্ডা মারে। তারা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত একই স্কুলে লেখাপড়া করছে। আমার বাসার সামনে আন্দোলন করে। এই জন্য মায়া কইরা, আমার বাসার সামনে না খাইয়া থাকবে? যেইটুকু পারছি, আমার সামর্থ্যের মধ্যে সেটুকুই দিছি। আমি বেশ কিছু দিন খিচুড়ি রান্না কইরা ওদের খাওয়াইছিলাম।

দুই. ২০ জুলাই, ২০২৪। শনিবার। সকাল সাড়ে দশটার দিকে বড় ছেলে বাসা থেকে বের হইতেছে। আমি ওরে জিগাইলাম, 'তুই যাস কই?' কয়, 'রিফাতরে ডাকতে যাইতেছি।' আমি কইলাম, 'রিফাতরে ডাকতে যাওয়া লাগবে না, তুই আয়।' কারণ, একে তো বড় সন্তান, আবার বিদেশে যাবে। তো আমি করলাম কি, কইলাম যে, 'তুই ওইদিকে গেলে তোর একটা কিছু হইয়া গেলে? আর পাঁচ দিন বাকি আছে তোর ফ্লাইটের। তুই আর যাইস না।' তো আমি ওরে ওই সময় যাইতে দিলাম না। মার সাথে যা পারে, বাবার সাথে তো তা করতে পারে না।

আমি স্যানিটারির কাজ করি। আমরা যে বাসায় থাকি, সেই বাসার পাশের বিল্ডিংয়ে ওই দিন কাজ ছিল। কাজে যাওয়ার আগে আমার স্ত্রীকে বললাম যে, 'তুমি ওদের দিকে খেয়াল রাইখ। কেউ যেন বাহিরে না যায়।' ছোট ছেলে কিন্তু এর আগেই বের হইয়া গেছে। নাস্তা পানি খাওয়ার আগেই সে বাসা থেকে উধাও। আজকে বাসা থেকে বের হওয়ার সময়, আমি যে স্যানিটারির কাজ করি, জি-আই পাইপ আছে, ওইগুলো নিয়া বাইর হইছে।

তিন. জোহরের নামাজের পর, যেই বিল্ডিংয়ে কাজ করি, ওইখান থেকে দেখি মেইন রোডের ওপারে ছোট ছেলে আর তার বন্ধু-বান্ধব। ওদের দেখে আমি ছোট ছেলেরে ডাকতেছি। নিচে নেমে দেখি বড় ছেলেও ওখানে, তবে রাস্তার এপারে ২৫২

নাম্বার পিলারের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। রাস্তার অপর পাশে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতেছে। হাতে কিছু পানির বোতল দেখলাম, বাসা থেকে পানি নিয়া আইছে।

এখন আমি বড় ছেলেরে হাত ধরে টান দিছি, 'বাবা চল, রিফাত রাস্তার ওপারে আছে। রিফাত যেখানে আছে, ওইখানে সোজাসোজি গুলি লাগাইতে পারবে না। তুই এইদিকে আয়। বাসায় চল।' এই কথা কইয়া হাতটা ছাড়ছি, সে আমার দিকে কেবল ঘুরছে, আর পইড়া গেল। আমার কলিজার টুকরা সিফাত 'আব্বু' কইয়া একটা ডাক দিছে। আর কিছুই বলতে পারে নাই। পইড়া গেল। সাইট থেকে গুলিটা আসল। গুলিটা চিপের বাম সাইট দিয়ে ঢুকে ডান সাইট দিয়ে বের হইয়া গেছে।

'আব্বু' কইয়া যখন সে রাস্তায় পড়তাছে, তখন আমি তারে জরাইয়া ধরছি। তার মগজ আমার হাতের মধ্যে আইসা পড়ছে। তারে যখন আমি বুকের মধ্য টাইনা ধরছি, দেখি মগজগুলো আমার হাতে আইসা পড়তাছে। ছোট ছেলেটা এইটা দেইখা দৌড়াইয়া আসতাছে। আমি কইলাম, 'ওর কিছু হয় নাই, তুই ওইদিকে যা।' এই কথা কইছি, পরে সে আর রাস্তার এপাশে আসে নাই। জায়গাটা আবার আমার বাসা থেকে দেখা যায়। আমার স্ত্রী বাসা থেকে দেখছে, তার ছেলে গুলি খাইছে। সে কল দিতেছে, 'বাসায় আস।' সে বাসা থেকে বের হইতে চাইতেছে, আমি কইছি, 'ওর কিছু হয় নাই। ওরে আমি হাসপাতালে নিয়া যাইতেছি।'

এখন আমি আমার স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে পারি না। সে বলে, 'আমার ছেলে যদি রাস্তার ওপারে চইলা যাইত, তাহলেই সে মারা যাইত না। তুমি আমার ছেলেরে খুন করছ। তুমি এই দিকে আনছ কেন? আমার ছেলে তো রাস্তার ওপারে চইলা যাইত। তুমি আনতে গেলা কেন?' আমার স্ত্রী বাক-প্রতিবন্ধী হইয়া গেছে। সে বাচ্চা মানুষের মতো হইয়া গেছে।

চার. এরপর, আমি কোনো রিক্সা পাই না। তখনও কিন্তু চারদিক থেইকা গুলি করতাছে। পুলিশ শাহআলী মার্কেটের ওইখান থেকে আর ছাত্রলীগের পোলাপান আশেপাশের বিল্ডিং থেকে গুলি করতাছে। আবার মেট্রোরেলের ওপর থেকে, হেলিকপ্টার থেকেও গুলি করতাছে। এতো এলোপাতারি গুলি করতাছে! ৬৫-৭০ কেজি ওজন ছিলো আমার ছেলে । আমি তাকে কোলে নিতে পারতেছি না। শেষে আমি আমার ছেলেরে হেঁচড়াইতে হেঁচড়াইতে গলির ভেতর নিছি। ছেলেরে টাইনা গলির ভেতর নিয়া এক জজ সাহেবরে ফোন দিছি। জজ সাহেব, রানিং জজ। উনাকে বললাম যে, 'আমার ছেলে গুলি খাইছে। ছেলে জীবিত আছে কি নাই, আমি জানি না। আমি তাকে হেঁচড়াইয়া গলির ভেতর আনছি।'

পরে উনি সাথে সাথে আসল। আমার ছেলেরে তার গাড়িতে কইরা হাসপাতালে নিয়ে যাই। তখন তার ড্রাইভার ছিল না। তার ওয়াইফ ড্রাইভ করতে পারে, উনি চালাইয়া আল হেলাল মেডিকেলে নিয়ে গেছে। আল-হেলাল মেডিকেলে তারা বলছে, 'এইখানে হবে না, আপনারা সোহরাওয়ার্দীতে নিয়ে যান।' কিন্তু আমি কনফার্ম ছিলাম, আমার ছেলে মারা গেছে। কারণ মাথার এক সাইড দিয়ে গুলি ঢুইকা আরেক সাইড দিয়ে বের হইয়া গেছে। সাথে মস্তক বের হইয়া গেছে।

পরে সোহরাওয়ার্দী মেডিকেলে নিয়ে গেছি। অনেক কষ্টের বিনিময়ে নিছি। নিতে দেয় না পুলিশে, সেনাবাহিনী। বারে বারে আটকাইছে গাড়ি। শেষে সোহরাওয়ার্দী যাইতে হইছে আমাদের ফার্মগেইট হইয়া। পরে ওইখানে নেওয়ার পরে ডাক্তাররা সাথে সাথে মৃত ঘোষণা করল। আমার মনে আর মানে না। আমি পরে আকুতি মিনতি কইরা আবার ইবনে সিনায় নিয়া গেছি। ইবনে সিনায় নেওয়ার পরে আমি কইলাম যে, 'ওরে একটা চেক দেন। দেহেন তো ওর পিত্তের মধ্যে পরাণ আছে কি না? যত টাকা লাগে, আমি দিমু।' পরে ঠিকই তারা কইতাছে, 'আপনার কী হয়? মারা গেছে। আরও আধাঘণ্টা/পয়তাল্লিশ মিনিট আগেই মারা গেছে।'

পাঁচ. এখন লাশ নিমু গ্রামের বাড়িতে, পথে কোন সমস্যা হইতে পারে। হাসপাতাল থেকে ডেট সার্টিফিকেট নিতে অইব। পরে আবার সোহরাওয়ার্দী মেডিকেলে নিয়ে আসলাম। নেওয়ার পরে ডাক্তাররা পোস্টমর্টেম এর জন্য খুব চাপ দিতেছে। নার্সেরা টানা হেঁচড়া করতাছে। আমিও টানা হেঁচড়া করছি। আমি কইছি, 'না। কেন পোস্টমর্টেম করবে? আমার ছেলে তো গুলিতে মারা গেছে। তার পোস্টমর্টেম অইব কেন?' পরে একপর্যায়ে অনেক চাপাচাপি করার পরে, এক ডাক্তার নার্সরে বলল, 'এইটা গান শট লেইখা দেন।' এই কথা বলে ডাক্তার চইলা গেল।

ছয়. গানশট লেইখা দেওয়ার পর, এখন আমার ছেলেরে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যামু। হাসপাতাল থেকে প্রথমে মিরপুর-১০ এ বাসায় নিয়া যাব। ওইখানে অল্প সময় রাখার পর, গ্রামের বাড়ি মাদারিপুর নিয়া যামু। এখন হাসপাতাল থেকে মাদারিপুর পর্যন্ত অ্যাম্বুলেন্স ৪০ হাজার টাকা চায়। পরে সিদ্ধান্ত নিলাম, মিরপুর

পর্যন্ত সিএনজিতে নিয়ে যাব। সিএনজিতে সুন্দর কইরা শুয়াইয়া নেওয়া যাইব। এরমধ্যে একজন লোক কাকুতি-মিনতি করতেছে, সে সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল থেকে কাজীপাড়া আসব, কিন্তু গাড়ি পাইতেছে না। আমি তার লগে একটা চুক্তিতে গেলাম যে, 'তোমারে আমার সিএনজি এর মধ্যে নিতে পারি। তুমি আমার এই ছেলের পা ধইরা রাখবা। আমি মাথা ধইরা রাখব। আমার সাথে মিরপুর-১০ পর্যন্ত যাইতে অইব। পরে আমি তোমারে কাজীপাড়া পৌঁছাইয়া দিমু।'

আমার স্ত্রী, ছোট ছেলে কেউ কিন্তু তখনো জানে না, সিফাত আর দুনিয়াতে নাই। হাসপাতাল পর্যন্ত আমি একাই। আমার স্ত্রী তো গুলি লাগার পর বাসা থেকে নিচে নামতে চাইছিল, আমি ফোনে না করছি, 'ওর বেশি কিছু অয় নাই, আমি ওরে হাসপাতালে নিয়া যাইতেছি।' আর ছোট ছেলে তো আন্দোলনে। ছোট ছেলে আমারে বার বার ফোন করতেছে, 'আব্বু, ভাইয়ার কী অবস্থা?' আমি কইছি, 'ওর কোনো সমস্যা অয় নাই। ওরে আমি নিয়া আইতেছি।' পরে আমি কইলাম, 'আব্বু, আমি তো এটিএম বুথ থেকে টাকা উঠাইতে পারি নাই। তুমি একটু বাসায় আস। তোমার ভাইয়ার লাইগা টাকা লাগবে। আমার কাছে তো টাকা নাই।' আমি তখন সিএনজিতে রোডে। ওই কয় 'আব্বু, তুমি কার্ড লইয়া অমুক স্থানে আহ। আমি উঠাই দিমুনে।' আমি কইলাম, 'তুই বেডা এইদিকে আয়।' ওরেও বলি নাই যে, সিফাত মারা গেছে।

ওর আম্মায় ফোন দিতেছে, 'কী অবস্থা?' আমি কইলাম, 'ও সুস্থ আছে, একটু ব্যান্ডিজ কইরা দিছে। ওরে নিয়া আইতেছি। তুমি আল্লাহর নাম নিয়া বসো।' কয়, 'ওর লগে একটু দেও, কথা কই।' আমি কইলাম, 'না কথা কওয়া যাইবে না। ওর কথা কওয়া নিষেধ।' এর মধ্যে বাসার নিচে যারা থাকে, বিল্ডিংয়ে যারা থাকে তাদের কাছে ফোন দিয়ে বললাম। ওদের সব জানালাম, যেহেতু খাটকির দরকার আছে।

সাত.আমার ছেলেরে শেষ বারের মতো মিরপুর-১০ এ নিয়ে আসলাম। যেই এলাকায় ওর জন্ম, বেড়ে উঠা, শৈশব-কৈশোর। ওই সময় আসরের নামাজে লোকজন যাইতেছে। তখন সেখানে জজ সাহেব ও একজন মেজর সাহেব ছিল। আমি জজ সাহেব ও মেজর সাহেবের বাসায় কাজ করতাম। জজ সাহেব কারে জানি ফোন দিয়ে একটা অ্যাম্বুলেন্স আনল। ১৫ হাজার টাকায় আমার বাড়ি পর্যন্ত পৌছাইয়া দিব।

প্রায় সবাই মানা করছে, এখানে গোসল না করাইতে। 'এখানে গোসল করাইবেন, টাইম লাগবে। আবার জানাজায় একজন বলবে এক কথা, আরেকজন বলবে আর এক কথা।' তখন তো আওয়ামী লীগ এর প্রভাব। আমাদের সামনে দিয়েই তো অনেক লাশ গায়েব হইয়া গেলো। এই জন্য লোকেরা বলছে, 'গোসল করানোর

ধরকার নাই। আপনারা পনেরো-বিশ মিনিটের মাজে এইখান থেকে রওনা দিয়ে দেন।' আমার ছেলের লাশ ওইখানে দশ-পনেরো মিনিটের মতো রাখছি।

ওই সময় আসরের নামাজের জন্য লোকজন যাইতেছে, আমাদের অ্যাম্বুলেন্স বাসার সামনে আসছে। নামাজের টাইমডা একটু লেইট কইরা দিছে, লাশ দেখার জন্য। মানুষ সিরিয়াল ধরে লাশ দেখছে, এত পরিমাণ লোক হইছিল। এত পরিমাণ, মনে হয় পাঁচ-ছয় হাজার লোক হইছিল, এই গেঞ্জামের মধ্যে। আমি ওই এলাকায় খুব সুনামের সহিত বসবাস করি। আমি কেউ এর সাথে কোনো দিন কাইজ্জা-জগড়া করি নাই এবং আমার ছেলে-পেলেও কেউ এর সাথে কোনো গাঞ্জাম করে নাই। আমরা একই বাড়িতে ১৯ বছর। পাঁচ-ছয় হাজার লোকে লাশ দেখতে আইছে। মানুষ ছিরিয়াল ধইরা লাশ দেখছে। আমার গ্রামের বাড়িতেও তিন-সাড়ে তিন হাজার লোকে জানাজায় অংশগ্রহণ করছে।

আট.আমার ছেলেরে অ্যাম্বুলেন্সে কইরা দেশের বাড়িতে নিয়া গেলাম। মাদারিপুরে যাইতে যাইতে রাত সাড়ে আটটা কি পোনে নয়টা বাজছে। সাথে আমার আমার ছোট ছেলে, আমার ওয়াইফ, আমার ভাতিজা গেছে। ভাতিজা পুরান ঢাকায় থাকে। রাত দশটায় জানাজা হইয়া গেছে। ছেলের মাথার মগজ পানি হয়ে বের হইয়া যাইতেছিল। সবাই একটু রাখার জন্য বলছে। আমি বলছি, 'রাখলে তো আর আমারে 'আব্বু' কইয়া ডাক দিতে পারবে না। আর রাখার ধরকার নাই। ওর যায়গায় ওরে রাইখা আসি।' জানাজা পড়াইছে, এলাকার আমার এক ভাতিজা, কামার হোসেন কুতুবি, সে জানাজার নামাজ পড়াইছে।

নয়. আমার হিসাব হইল, আমি বাঁচি-মরি এইটা হইল পরের চিন্তা। আমি আগে দেখি, পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে গড়ায়। সরকারের শেষ পরিণতি দেখতে চাই। আমার ফ্যামিলির সবাইকে গ্রামের বাড়িতে রাইখা আমি ছয় দিনের দিন ঢাকায় চইলা আইসি। ৪ আগস্ট সমন্বয়করা ঘোষণা দিল ৫ আগস্ট ঢাকায় অ্যাটাক করার জন্য। ৪ আগস্ট রাতে রিফাত ওর বন্ধু-বান্ধব, আমার বড় ছেলের বন্ধু-বান্ধব, এলাকাবাসীকে নিয়ে প্রায় দুইশ এর ওপরে লোক রওনা দিছে ঢাকা অ্যাটাক করার জন্য। ওরা সবাই একসাথে আস্তে আস্তে ঢাকা আইসে।

৫ আগস্ট আনন্দ করছে, উদযাপন করছে। আনন্দ, উদযাপন করার পর রাত দুইটার সময় রিফাত সহ, সমস্ত পোলাপান আমার সাথে দেখা করছে। পরের দিন, ৬ আগস্ট আমারে নিয়া আবার দেশে ফিরছে। 'এখন বাড়ি চলেন। এখন যাইয়া আমাদের ভাই-বোনদের জন্য দোয়া মাহফিল করমু। হের পর আপনি আবার ঢাকায়

আসবেন।' সিফাতের বন্ধুরা, রিফাতের বন্ধুরা, এলাকাবাসী সবাই মিলে আমাদের ইউনিয়নের সবগুলো মসজিদে শহীদদের জন্য দোয়া মাহফিলের ব্যবস্থা করছে।

দশ. সিফাতের সবচাইতে প্রিয় ছিল ওর বোন জান্নাতুল। ওর বোন ওর সবচাইতে আদরের, সবচাইতে কাছের ছিল। গ্রামের বাড়ি যাওয়ার জন্য ভাড়ার টাকা দিতাম, হাত খরচ দিতাম। নিজে না খাইয়া, ভাড়া বেশি না দিয়া , হাত খরচ থেকে টাকা বাঁচাইয়া বোনের লাইগা কিছু-না-কিছু কিইনা আনত। নিজে হালকা-পাতলা টিউশনি করাইত। আবার আমার কাজ দেখতে দেখেতে হালকা স্যানিটারি কাজ শিখে ফেলছিল। কোথাও হয়তো একটা কল লাগাই দিছে অথবা হালকা একটা কাজ কইরা দিছে, কিছু টাকা পাইছে, ওই টাকা দিয়ে বোনরে জামা কিনে দিত।

সিফাত, রিফাত দুই ভাই খুব মিল দিয়া চলার চেষ্টা করত। রিফাতরে নিয়া অনেক মজা করত। রিফাত এখন অনেকটা চুপ হইয়া গেছে। ইন্টারমিডিয়েটের রেজাল্টের পর তাবলীগ-জামাতে চিল্লায় চইলা গেছে। সিফাতও কয়েকবার তাবলীগ-জামাতে চিল্লায় গেছে। সাত দিন, তিন দিন করে অনেকবার তাবলীগ-জামাতে গেছে। ২০২৩ সালে আল্লাহ সিফাতকে উমরা হজ্জ করার তাওফিক দান করছে।

এগারো. সিফাত আমার প্রথম সন্তান। আমার কামাই রোজগার দিয়ে তিলে তিলে দুইটা ছেলে একটা মেয়েকে বড় করছি। আমি অনেক টাকা কামাই করছি, কিন্তু এই ছেলেপেলের পেছনেই সব ব্যয় করছি। আমার বয়স ৫১-৫২ বছর চলে, আমি এখনো নিজে কাজ করি। প্রতিদিন কাজে যাইতেছি। আমি কোনো রাজনীতির শেল্টারেও নাই, রাজনীতিও করি না। আমি খুব পরিশ্রমী। আমি সিফাতরে দুই টাকার দুধ কিইনাও খাওয়াইছি। তখন ষাট-সত্তর টাকা হাজিরা। আমি হেই পরিশ্রমের লোক। আমি তো নিজে কিছু করতে পারি নাই। যা করছি, এই তিনটা সন্তান আল্লায় দিছিল, এই সন্তানের জন্যই। তবে সন্তানগুলোর লেখাপড়া করাইতে চাইছিলাম মনের মতোন কইরা। আমি জীবনে কোনোদিন রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলাম না। আমি ৮৯ সাল থেকে ঢাকায় কাজ করি। যেই ক্ষমতায় আসুক আমি সেনেটারি কাম করি, সেনেটারি কাম কইরাই আমার সংসার চালাই।

শোকাকুল মায়ের কান্না

'সিফাত আমার প্রথম সন্তান ছিল। খুব আদরের ছিল। অনেক কষ্ট করে আমি আমার সন্তানকে বড় করেছিলাম। আমার সন্তানও আমাকে এতো ভালোবাসত! আমি অসুস্থ হলে খুব অস্থির হয়ে যেত। আমার কখনো মন খারাপ থাকলে বা রাগ

করলে সে বুঝে যেত। যত রাগ থাকুক, যখন সে হাসি দিয়ে 'আম্মু' বলে ডাকত, তখন সব রাগ কোথায় যে চলে যেতো!

কোথাও যাওয়ার সময়, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারলে আসমান জোরা খুশি হতো। তার প্রিয় খাবার ছিল মিষ্টি জাতীয় খাবার। একটু বৃষ্টি নামলেই বলত, 'আম্মু একটু পিঠা বানিয়ে দাও না।' কোনো একটা কাজ শুরু করলে আমাকে ডেকে দেখাত। এখন বৃষ্টি নামলে কেউ তো আর পিঠা বানিয়ে দিতে বলে না! যে জায়গাগুলোতে সিফাতের সঙ্গে যেতাম, এখন সেসব জায়গায় গেলে মনে হয়, কোথায় গেল আমার সিফাত?

তথ্যসূত্র :

সিফাতের বাবা এবং মায়ের সাক্ষাৎকার

তথ্য সংগ্রহে:

মোঃ কামরুজ্জামান এবং মোঃ নাহিদ হাসান সজীব; স্টোরি মেকিং- মোঃ কামরুজ্জামান এবং ড. মোহাম্মাদ সরোয়ার হোসেন ।

ছাত্রদের হাতে উঠলে বাঁশ, বদলে যাবে ইতিহাস

কোটা সংস্কার আন্দোলনে ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশ নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ শুরু করলে সতেরো জুলাই শেখ শাহরিয়ার বিন মতিন (ডাকনাম সুহার্তো) আন্দোলনের সমর্থনে একটি বক্তব্য দেন। সেই বক্তব্য এবং পরবর্তীতে তার আত্মত্যাগ তাকে ইতিহাসের অনিবার্য অংশ করে তোলে।

শহীদের নাম: শেখ শাহরিয়ার বিন মতিন

বয়স: ১৮ বছর ৯ মাস (জন্ম- ১ নভেম্বর ২০০৫)

মৃত্যুর তারিখ: ২০ জুলাই ২০২৪

পিতা: মোহাম্মদ আব্দুল মতিন

মাতা: মমতাজ বেগম

ঠিকানা: ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ

শিক্ষা: এইচএসসি, ঈশ্বরগঞ্জ আইডিয়াল কলেজ, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ

শেখ শাহরিয়ার বিন মতিন
July 17, 2024 ·

**মনে রাখবেন।
ছাত্রদের হাতে উঠলে বাঁশ,
বদলে যাবে ইতিহাস।**

Md Jalal Uddin and 63 others

ছত্রদের হাতে বাঁশ উঠেছে, নতুন ইতিহাসও তৈরি হয়েছে, সুহার্তোর মত হাজারো শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা জালিমের বন্দিশালা থেকে মুক্তি পেয়েছি, বাংলাদেশ স্বৈরাচার মুক্ত হয়েছে।

শেখ শাহরিয়ার বিন মতিন ঈশ্বরগঞ্জ আইডিয়াল কলেজ, ময়মনসিংহের একজন শিক্ষার্থী ছিলেন। কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় তিনি এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিলেন। তার বাবা-মা কর্মসূত্রে ঢাকার কুড়িলে অবস্থান করতেন। পরীক্ষার মাঝে দীর্ঘ বিরতি থাকার কারণে পরিবারের সাথে সময় কাটানোর জন্য ১০ জুলাই তিনি গ্রামের বাড়ি থেকে ঢাকায় আসেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা এবং আবু সাঈদকে হত্যার পর, এইচএসসি পরীক্ষার্থী হওয়া সত্ত্বেও ঘরে বসে থাকতে পারেননি সুহার্তো। বাবা-মায়ের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই সুহার্তো, তার খালাতো ভাই বাদল এবং অপূর্ব একসাথে বড় হয়েছেন। আনন্দের মুহূর্তগুলো একসাথে উপভোগ করেছেন আর কষ্টগুলো ভাগাভাগি করে নিয়েছেন। আন্দোলনের দিনগুলোতেও সুহার্তো এবং বাদল একসাথে ছিলেন। সুহার্তোর আন্দোলনে অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের সাথে বাদল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ওই সময়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বাদল (World University, CSE Batch ৬৫/A) বলেন—'১৫ জুলাই রাতে সুহার্তো তাদের বাসা (কুড়িল) থেকে আমাদের বাসায় (মিরপুর-২) বেড়াতে আসে। আবু সাঈদের মৃত্যু এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর বিশেষত ছাত্রীদের ওপর হামলার ঘটনায় সে গভীরভাবে মর্মাহত হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় সে দেশের পরিস্থিতি নিয়ে একাধিক পোস্ট করে।

তার পরিবার একাধিকবার ফোন ও মেসেজ দিয়ে তাকে আন্দোলনে যেতে নিষেধ করে। কিন্তু সে কারও কথা শুনতে প্রস্তুত ছিল না। আমার মাও আমাদের বের হতে নিষেধ করেন। ১৮ জুলাই সকাল দশটার দিকে, নিচে একটু ঘুরে আসার কথা বলে, আমি এবং সুহার্তো মহান আল্লাহর নাম নিয়ে সুরা পড়ে মিরপুর-১০ পর্যন্ত যাই। সেখানে গিয়ে দেখি, একপাশে হাজার হাজার ছাত্র-জনতা এবং অন্যপাশে পুলিশ বাহিনী ও সিভিল পোশাকের অনেক লোক। এগারোটার পরে, কিছু বুঝে ওঠার আগেই পুলিশ ছাত্রদের লক্ষ্য করে টিয়ার শেল, সাউন্ড গ্রেনেড, রাবার বুলেট এবং ছররা গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। একই সময় পেছন দিক থেকে ছাত্রলীগ ও যুবলীগ কর্মীরা লাঠি এবং দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ছাত্রদের ওপর হামলা চালায়। এতে আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাই। তখন সুহার্তো আর আমি আলাদা হয়ে যাই। আমার সাথে থাকা বন্ধু প্রান্তকে আহত অবস্থায় খুঁজে পাই। তার পেটে রাবার বুলেট এবং হাতে ও কপালে পুলিশের ছোড়া ছররা গুলি লেগেছিল। আমরা মিরপুর-১০ মেট্রো স্টেশনের নিচে একটি ব্যাংকে আশ্রয় নিই। সেখানে আরও অনেক ছাত্র-জনতা আহত অবস্থায় আশ্রয় নিয়েছিল। তখন আমি সুহার্তোকে ফোন দিলে সে বলে, 'আমি ঠিক আছি বাবুদাদা, চিন্তা কইরো না। তোমাদের কী অবস্থা?' আমার পায়ে পুলিশের ছররা গুলি লাগে; তখনো টের পাইনি। আমি তাকে বলি, 'আমরাও ঠিক আছি। তুই বাসায় চলে যা।' পরে সে কোনোভাবে আমাদের বাসায় পৌঁছে যায়।

আমরা সেই ব্যাংকে প্রায় এক ঘণ্টার মতো আটকে থাকি। বাইরে প্রচুর গোলাগুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। জ্যামারের কারণে নেটওয়ার্ক বিঘ্নিত হওয়ায় সুহার্তোর সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হচ্ছিল না। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে আমরা সেখান থেকে বের হয়ে সুহার্তোর সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং জানতে পারি যে, সে বাসায় পৌঁছেছে। আমি তাকে বললাম, যেন বাসায়ই থাকে।

আমার মা পরবর্তীতে জানান, উত্তেজিত অবস্থায় বাসায় ফিরে সুহার্তো প্রথমে গোসল করে। এরপর মা তাকে ভাত বেড়ে দেন। ভাত খাওয়ার সময় সে তার খালাতো ভাই অপূর্বর সাথে ভিডিও কলে কথা বলে এবং বাহিরে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো জানায়। ভাত খাওয়া শেষ করে সে রুমে যায়। কিছুক্ষণ পর মা যখন রুমে যান, তখন দেখেন যে সুহার্তো সেখানে নেই।

শেখ শাহরিয়ার বিন মতিন
July 17, 2024 ·

জোর যার মুল্লুক তার! আগে ক মুল্লুক কার?
লাঠির জোরে কলম ভাঙ্গে, শান্তির নামে তুললো খার
কাইল মারলি, পরশু মারলি, মারতে আইলি আইজ আবার!
রাজায় জহন প্রজার জান লয় জিগা তাইলে রাজা কার?
- কথা ক

#SaveTheBangladeshStudents

183

এক ঘণ্টা পর ব্যাংক থেকে বের হয়ে মিরপুর-১০ নম্বর চত্বরে আমার বন্ধুদের সাথে দেখা হয়। প্রান্তকে নিয়ে আমার বন্ধু আবিদ মিরপুর-১০ নম্বরে অবস্থিত আলোক হেলথকেয়ারে যায়। প্রান্তের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করানোর পর তারা আবার চত্বরে ফিরে আসে। তখন পরিস্থিতি অনেকটা শান্ত ছিল, পুলিশ বা ছাত্রলীগের উপস্থিতি দেখা যায়নি। এরপর প্রান্ত লক্ষ করে, আমার পায়ে রক্তের দাগ। দুপুর দুইটার সময় প্রান্ত আমাকে নিয়ে আবার আলোক হেলথকেয়ারে যায়। তখন সুহার্তোর সঙ্গে আমার ফোনে কথা হয়। সে জানতে পারে যে, আমি এবং প্রান্ত দুজনেই আহত হয়েছি। কিছুক্ষণ পর সে আবার ফোন দিয়ে বলে, 'আমি আলোক হেলথকেয়ারের নিচে আছি।' কীভাবে আসল ও, জিজ্ঞেস করলে জানায়, বাসায় কাউকে কিছু না বলেই লুকিয়ে বের হয়ে এসেছে।

আমার পায়ের এক্স-রে করা হলে জানা যায়, ছররা গুলি পায়ের গভীরে ঢুকে গেছে। ডাক্তার জানান, সেখানে চিকিৎসা সম্ভব নয়। আমাদের ঢাকা মেডিকেলে যেতে হবে। এরপর আমি, প্রান্ত এবং আমার আরেক বন্ধু ফাহাদ—যে নিজেও আহত ছিল—আমরা তিনজন মিলে কচুক্ষেত হাইটেক হাসপাতালে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। রিকশায় জায়গা না থাকায় সুহার্তো বলে, 'আমি আবিদ ভাই আর

সাইদুল ভাইয়ের সঙ্গে আছি, তোমরা যাও।' আবিদও আশ্বস্ত করে বলে, 'আমরাও একটু পর আসব, তোরা আগে যা।'

হাইটেক হাসপাতালে গিয়ে আমার পা থেকে তিনটি ছররা গুলি বের করা হয়। তবে বাকি গুলিগুলো অনেক গভীরে থাকায় ডাক্তার জানান, সেগুলো বের করতে বড় অপারেশন লাগবে। অপারেশন থিয়েটার থেকে বের হওয়ার পর প্রান্ত আমাকে জানায়, সুহার্তো মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়েছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করি, 'এর মানে কী?' কারণ আমরা দেখে এসেছি, তখন মিরপুর-১০ নম্বরে পুলিশ বা ছাত্রলীগ কেউই ছিল না, শুধু হাজার হাজার ছাত্র ও আমজনতা। আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ফাহাদ তখন প্রান্তকে বলে, 'আমি তোকে মানা করেছিলাম, এখনই ওকে কিছু না বলতে!' এরপর আমি আমার বড় ভাই বাঁধনকে ফোন করে সব জানাই। বাঁধন ভাই আমাকে বকাঝকা করে জিজ্ঞেস করেন, 'সুহার্তো কোথায়? আমি যাচ্ছি।' পরে জানতে পারি, বাঁধন ভাই ড. আজমল খান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পৌঁছানোর অল্প সময় পূর্বেই সুহার্তোর অ্যাম্বুলেন্স ঢাকা মেডিকেলের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

বাঁধন ভাই বাইক নিয়ে দ্রুত ঢাকা মেডিকেলের দিকে রওনা হন। আমি আর প্রান্ত অনেকক্ষণ যানবাহনের খোঁজ করি। একটি রিকশা যেতে রাজি হয়, কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর চালক বলে, আর যাবে না। তখন রাস্তায় জায়গায় জায়গায় আগুন জ্বলছিল এবং হাজার হাজার জনতার ভিড় ছিল। অবশেষে, কোনো উপায় না দেখে আমি আর প্রান্ত দুটি রাইড শেয়ারিং বাইক নিয়ে অনেক কষ্টে ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে পৌঁছাই।'

আবিদ, সুহার্তোর পরিচিত বড় ভাই, আন্দোলনের সহযোদ্ধা এবং গুলিবিদ্ধ হওয়ার প্রত্যক্ষদর্শী। গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর তিনি সুহার্তোকে প্রথমে ড. আজমল খান মেডিকেল কলেজে এবং পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজে নিয়ে যান। সুহার্তোর গুলিবিদ্ধ হওয়া এবং হাসপাতালে নেওয়ার সময়ের হৃদয়বিদারক ঘটনাগুলো বর্ণনা করতে গিয়ে আবিদ (Southeast University, Department of Law, ৬২ Batch) বলেন—'১৮ জুলাই সকাল এগারোটায় সুহার্তো'র সাথে মিরপুর-১০ এ দেখা হওয়ার পর আমরা অবস্থান নেই। শুরুতে পুলিশ ও ছাত্রলীগ অবর্ণনীয় তাণ্ডব চালালেও, বেলা বারোটার দিকে ছাত্র-জনতা মিরপুর-১০ এর নিয়ন্ত্রণ নেয়। এরপর বিকেল চারটা পর্যন্ত মিরপুর-১০, ১১, এবং ১২-এর এলাকা স্লোগানে মুখরিত ছিল। আশপাশ থেকে হাজার হাজার ছাত্র সেখানে সমবেত হতে থাকে।

দুপুর তিনটার দিকে আমাদের গুলিবিদ্ধ তিন বন্ধু—বাদল (সুহার্তোর খালাতো ভাই), ফাহাদ এবং প্রান্ত কচুক্ষেতে অবস্থিত হাইটেক হাসপাতালে যায়। সুহার্তো আমার সঙ্গে মিরপুর-১০ এ থেকে যায়। বিকেল চারটার পর মিরপুর মডেল থানার দিক থেকে প্রচুর গুলির আওয়াজ শুনতে পাই। থানার দিক থেকে বিপুল সংখ্যক পুলিশ ও ছাত্রলীগ একসঙ্গে এগিয়ে আসছিল। আমরা হাজার হাজার ছাত্র-জনতা তাদের প্রতিহত করতে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করি। উত্তেজিত জনতা ট্রাফিক পুলিশ বক্সে আগুন ধরিয়ে দেয়।

আমি, সুহার্তো এবং আমার বন্ধু সাইদুল একসঙ্গে ছিলাম। আমরা সামনে এগোচ্ছিলাম, কিন্তু স্নাইপাররা আশপাশের বহুতল ভবন থেকে ছাত্র-জনতার ওপর গুলি চালাচ্ছিল। প্রতিবার এগোতে গেলে কেউ না কেউ গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিল। আমরা সামান্য এগোচ্ছি, আবার পিছু হটছি। এভাবে প্রায় ঘন্টাখানিক চলল। এরপর পুলিশ টিয়ারশেল এবং গুলি শুরু করে। টিয়ারশেলের ধোঁয়া এবং গুলির মুখে জনতা দিগ্বিদিক ছুটতে থাকে। সুহার্তোকে কোথায় হারিয়ে ফেলেছি, জানি না। হঠাৎ এক ভাই চিৎকার করে বলল, 'ভাই, কেউ একজন রাস্তায় লুটিয়ে পড়েছে, ওরে একটু কেউ তোলেন।' কেন জানি না, কথাটা শুনে প্রথমেই সুহার্তোর চেহারা মনে পড়ল। পিছনে ফিরে দেখি, কয়েকজন রাস্তায় পড়ে আছে। তখন পুলিশের সঙ্গে আমাদের দূরত্ব পঞ্চাশ মিটারেরও কম ছিল। চোখ-মুখ জ্বলছিল টিয়ারশেলের গ্যাসে। হঠাৎ সাইদুল বলল, 'আবিদ, সুহার্তোর কপালে গুলি লেগেছে!' প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি, কিন্তু দেখলাম, গুলি তার কপাল ভেদ করে ঢুকে গেছে, আর কপাল থেকে রক্ত ঝরছে।

সুহার্তোকে দ্রুত ড. আজমল হাসপাতালে নিয়ে যাই। সেখানে চিকিৎসকরা শত শত আঘাতপ্রাপ্ত ছাত্র-জনতার চিকিৎসা দিচ্ছিলেন। তবে ওর অবস্থা গুরুতর ছিল। তারা বললেন, 'তাড়াতাড়ি ওকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যান।' কীভাবে যেন আমি একটি অ্যাম্বুলেন্স ঠিক করলাম। সুহার্তোকে নিয়ে রওনা দিলাম। অক্সিজেন মাস্ক পরা সুহার্তোর শরীর রক্তে ভিজে গিয়েছিল। চোখ থেকে রক্ত ঝরছিল। আগারগাঁও পার হওয়ার সময় সে ঝাঁকি দিয়ে আমার দিকে তাকাল। আমি বললাম, 'তুই ভয় পাস না, তুই ঠিক হয়ে যাবি।' কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে সে চোখ বন্ধ করল।

ছবিঃ মুমূর্ষু অবস্থায় সুহার্তো

আমরা ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে পৌঁছাই। সেখানে শত শত গুলিবিদ্ধ ভাই-বোনকে কাতরাতে দেখলাম। অনেক লাশ পড়ে থাকতে দেখলাম। সুহার্তোকে স্ট্রেচারে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময়ও ভাবিনি, সে আমার সঙ্গে শেষবারের মতো কথা বলেছে। কেন জানি না, ভেবেছিলাম সে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু.. সুহার্তো আর কখনো ফিরে আসেনি।'

বাদল হাসপাতালে যাওয়ার পর সুহার্তোকে এমন অবস্থায় দেখে, যা সে কখনো কল্পনাও করেনি। তার ছোট ভাই মৃত্যুশয্যায়। যে ভাইটি তাকে ভালোবেসে 'বাবু দাদা' বলে ডাকত, সে এখন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। ভগ্ন হৃদয়ে এরপরের ঘটনা বর্ণনা করে বাদল বলেন—'ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে পৌঁছে সেখানে আবিদ, সাইদুল আর বাঁধন ভাইকে পাই। সবার মুখে তখন গভীর চিন্তার ছাপ। আবিদ আমাকে বলল, ভেতরে গিয়ে দেখে আসতে। আমি ভেতরে গিয়ে দেখি, আমার ভাই সুহার্তোর মুখ হা করে আছে। তার মাথা ও শরীর রক্তাক্ত। বাম চোখ আর কপালে ব্যান্ডেজ, মুখে একটি মোটা পাইপ। খেয়াল করলাম, তার মুখ একটু একটু কাঁপছে। এই অবস্থা দেখে আমি কান্নায় ভেঙে পড়ি। তখন আমি তার কানে আজান দিই। আমার বন্ধুরা আমাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল। তারা বলল, 'কিছু হবে না। সুহার্তো আবার আমাদের মাঝে ফিরে আসবে।' যদিও তাদের চোখেও তখন পানি ঝরছিল। আমি নিজেও মনে মনে ভাবছিলাম, সুহার্তো আবার আমাকে 'বাবু দাদা' বলে ডাকবে। তবে এই চিন্তাও আসছিল—যদি ওর কিছু হয়ে যায়, তাহলে আমার কী হবে? আমার খালামণি, অর্থাৎ সুহার্তোর মা, তিনি এটা কীভাবে সহ্য করবেন? মাথায় তখন হাজারো চিন্তা ঘুরছিল।

এদিকে আমার বন্ধুদের বাসা থেকেও কল আসছিল, তাদের বাসায় ফেরার তাগিদ দেওয়া হচ্ছিল। তারপরও তারা আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'আমরা কি তোর সাথে থাকব?' আমি বললাম, 'আচ্ছা, তোরা যা। আমি আর বাঁধন ভাই আছি।' তারা বিদায় নিয়ে চলে যায়। বাঁধন ভাই সুহার্তোর বাবা-মাকে সব জানিয়ে দেয়। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুহার্তোর বাবা আব্দুল মতিন ও তার ফুফাতো ভাই রিয়াদ ময়মনসিংহ থেকে ঢাকা মেডিকেলের উদ্দেশ্যে রওনা হন। আমি আর বাঁধন ভাই অপেক্ষা করতে থাকি। আত্মীয়স্বজনরা একের পর এক ফোন দিচ্ছিলেন।

এ সময় ওয়ার্ড থেকে জানানো হলো, সুহার্তোর রক্তের প্রয়োজন। তার শরীর থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হচ্ছিল, এমনকি ফুসফুসেও রক্ত ছড়িয়ে পড়ে, যা পাইপ দিয়ে বের করা হচ্ছিল। বাঁধন ভাই আমাকে বলল, 'তুই থাক, আমি রক্ত আর যা যা লাগে, তা ব্যবস্থা করি।'

আমি একা ওয়ার্ডের বাইরে বসে দোয়া পড়তে থাকি। কিছুক্ষণ পর ওয়ার্ড থেকে জানানো হলো, সুহার্তোকে আইসিইউতে স্থানান্তর করতে হবে। আমি বাঁধন ভাইকে কল দিয়ে খবরটি জানালাম। সে বলল, 'আমার আসতে একটু দেরি হবে।'

আমি একজন ওয়ার্ড বয়ের সহায়তায় সুহার্তোকে আইসিইউতে নিয়ে যাই। বাঁধন ভাই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে পৌঁছায়। আমরা দু'জন বাইরে অপেক্ষা করতে থাকি। মাঝে মাঝে আইসিইউ থেকে কিছু জিনিস আনতে বলা হতো, আর বাঁধন ভাই দৌড়ে এনে দিত।

এদিকে আত্মীয়স্বজনরা হাসপাতালে আসতে চাইলেও দেশের পরিস্থিতি এত খারাপ ছিল যে কেউই আসতে পারছিল না। এমনকি সুহার্তোর মা, সুহার্তোর ছোট বোনকে নিয়ে এই অবস্থায় বের হতে পারছিলেন না। সবাই তাকে আশ্বস্ত করছিলেন যে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। এমন পরিস্থিতিতে আমার ছোট খালু সজীব আর সেজো খালু জুন কোনোভাবে ঢাকা মেডিকেলে পৌঁছান। আমি সকাল থেকে কিছু খাই নাই শুনে, ফুপাতো বোনের জামাই খাবার নিয়ে আসে।

রাত তখন দুইটা। সুহার্তোর বাবা আব্দুল মতিন এবং সুহার্তোর ফুফাতো ভাই রিয়াদ অনেক বাধা পেরিয়ে হাসপাতালে পৌঁছান। সুহার্তোকে আইসিইউ বেডে দেখে তারা ভেঙে পড়েন। রিয়াদ ভাই কান্নাজড়িত কণ্ঠে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'ভাই, এটা কী হলো?' এরপর সে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'আমাদের ভাই আবার ফিরে আসবে, টেনশন কইরো না' বলেই কান্নায় ভেঙে পড়ল। আব্দুল মতিন খালু নামাজ পড়তে মসজিদে চলে গেলেন। সজীব খালু, জুন খালু আর দুলাভাই একে একে বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

পরে জানানো হলো, সুহার্তোর সিটি স্ক্যান করাতে হবে। আব্দুল মতিন খালু নামাজ শেষ করে ফিরে এলেন। আমি, বাঁধন ভাই, রিয়াদ ভাই, এবং ওয়ার্ড বয় মিলে সুহার্তোকে সিটি স্ক্যানের জন্য নিয়ে গেলাম। তখন অক্সিজেন সিলিন্ডার শেষ হয়ে যাওয়ায় আমরা সবাই উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। দ্রুত নতুন সিলিন্ডার এনে সিটি স্ক্যান করানো হলো। সিটি স্ক্যান শেষে আইসিইউতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় সুহার্তোর হৃদস্পন্দন ঠিক রাখার জন্য হাত দিয়ে চাপার যে বেলুনটি ফেটে যায়। তখন আমি সুহার্তোর দিকে তাকিয়ে খেয়াল করি, ওর কোন শ্বাস চলছিল না, একদম নিস্তেজ শরীর। প্রায় দুই মিনিট পর ওয়ার্ড বয় নতুন আরেকটি বেলুন লাগায় এবং সুহার্তোকে আইসিইউতে নিয়ে যাই।

কিছুক্ষণপর সুহার্তোর পাশের বেডের রোগী মারা যান। শুনে আমরা আরও বেশি চিন্তিত হয়ে পড়ি। রিয়াদ ভাই একটু পর পর সুহার্তোর পাশে গিয়ে সুরা ও দোয়া পড়তে থাকে, সাথে কান্না করতে থাকে। রিয়াদ ভাই আমাকে বলে, 'সুহার্তো, তোমার আর অপূর্বর কথা অনেক বলতো। ও বলেছিলো আমাকে একদিন তোমার সাথে দেখা করাবে, তোমার বাসায় নিয়ে যাবে এবং আমরা একসাথে ঘুরবো। কিন্তু তোমার সাথে এটা কোন পরিস্থিতিতে দেখা হলো?' এসব বলতে বলতে ফজরের আজান দিয়ে দেয়।

যেহেতু আমার মা বাসায় একা ছিলেন, রিয়াদ ভাই বললেন, 'ভাই, তুমি বাসায় গিয়ে একটু রেস্ট নাও। আমরা এখানে আছি।' আমি আর বাঁধন ভাই বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। অনেক ঝামেলা পেরিয়ে বাসায় পৌঁছাই। মা আমাদের দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং বলছিলেন, 'আমার হাতের খাবার খেয়ে গেলো।' সারারাত তিনি কুরআন তিলাওয়াত করেন এবং কান্না করেন। ১৯ জুলাইয়ের পর মিরপুরের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হওয়ায় আমাদের আর ঢাকা মেডিকেলে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

১৯ জুলাই থেকে রিয়াদ ভাইয়ের সাথে আমার নিয়মিত ফোনে কথা হতে থাকে। কখনও সুহার্তো সম্পর্কে ভালো খবর পাই, আবার কখনও খারাপ খবর। ১৯ জুলাই রাতে খবর আসে, সুহার্তোর জন্য প্লাটিলেট দরকার। রিয়াদ ভাই বারবার ফোনে আমাদের দোয়া করার কথা বলেন। ওই দিন আমার মেজো খালু আনোয়ার সুহার্তোকে দেখতে ঢাকা মেডিকেলে যান। তিনি হাসপাতাল সেক্টরের সাথে যুক্ত থাকার কারণে বুঝতে পারেন, সুহার্তোর অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন। তিনি আমাদের শুধু দোয়া করতে বলেন, কারণ তখন দোয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

১৯ জুলাই, কারফিউ চলাকালীন অবস্থায় গাজীপুর থেকে সুহার্তোর ফুপু কামরুন নাহার অনেক কষ্ট করে ঢাকা মেডিকেলে আসেন। সারা রাত তিনি সুহার্তোর শিয়রে দাঁড়িয়ে ছিলেন, অপেক্ষা করছিলেন কখন তাঁর প্রাণপ্রিয় ভাতিজার জ্ঞান ফিরবে।

২০ জুলাই দুপুরে, সুহার্তোর আম্মু যখন ঢাকা মেডিকেলে যাওয়ার পথে সিএনজিতে ছিলেন, তখন হাসপাতাল থেকে খবর পান যে সুহার্তো আর বেঁচে নেই। ফোনে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। কিন্তু, হাসপাতাল পৌঁছানোর পর আবার জানানো হয় যে সুহার্তো এখনও জীবিত এবং চিকিৎসা চলছে। তখন আমরা পরিবারের সবাই মিলে নামাজ-কালাম পড়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে থাকি।

২০ জুলাই খবর আসে, আমাদের সবার প্রিয় শেখ শাহরিয়ার বিন মতিন (সুহার্তো) আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। বেলা ২টা ৬ মিনিটে দায়িত্বপ্রাপ্ত তাকে মৃত ঘোষণা করেন। সারাদেশে কারফিউ জারি থাকায় আমরা কেউই হাসপাতালে যেতে পারছিলাম না। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, উত্তরা সেক্টর ১০-এ আমার খালামণি শামীমার বাড়িতে সুহার্তোর মরদেহ নিয়ে আসা হবে এবং সেখান থেকে লাশবাহী গাড়িতে করে তাকে তার গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহ নেওয়া হবে। সেখানেই জানাজা এবং দাফন সম্পন্ন হবে।

২১ জুলাই সকাল থেকে আমরা যার যার বাসা থেকে উত্তরা যাওয়ার চেষ্টা করি। জায়গায় জায়গায় আর্মি ও পুলিশ আমাদের গাড়ি, সিএনজি আটকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। কেউ বলে, 'আমার ভাই মারা গেছে, যেতে দিন' কেউ বলে, 'আমার ভাগ্নে মারা গেছে, দয়া করে যেতে দিন।' সুহার্তোর মা এবং ফুপি তখন খালামণির বাসায় অবস্থান করছিলেন। আমরা সেখানে পৌঁছানোর পর সুহার্তোর আম্মু আমাদের দেখে আরও বেশি কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং অচেতন হয়ে পড়েন। তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো ভাষা আমাদের ছিল না। সুহার্তোর ছোট বোন স্মাইল, যার বয়স মাত্র ৮ বছর, কান্নায় ভেঙে পড়ে বারবার জিজ্ঞেস করতে থাকে, 'আমার ভাইয়া কোথায় আম্মু? আমার ভাইয়ার কী হয়েছে?' আমরা ওকে বোঝানোর চেষ্টা করি যে, 'তোমার ভাইয়া আসবে।' তখন সে একটু চুপ করে থাকলেও কিছুক্ষণ পর আবার একই প্রশ্ন করতে থাকে এবং কান্না করতে থাকে।

হাসপাতাল থেকে মতিন খালু জানান, তিনি ছাড়পত্রের জন্য ছোটাছুটি করছেন, কারণ থানার ছাড়পত্র ব্যতীত সুহার্তোর লাশ দেয়া হবে না। মিরপুর-২ মডেল থানায় গেলে তারা বলে, 'আমাদের এখানে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি।' পরে মতিন খালু শাহবাগ থানায় গিয়ে কোনোভাবে ছাড়পত্র পান এবং ঢাকা মেডিকেলে ফিরে আসেন। সেখানে মরদেহ গোসল করাতে নিয়ে গিয়ে দেখেন, গোসলের জন্য দীর্ঘ সিরিয়াল। তিন-চার ঘণ্টা অপেক্ষার পর সুহার্তোর মরদেহ গোসল সম্পন্ন হয়। আমরা সবাই সুহার্তোর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এমনভাবে ওর জন্য অপেক্ষা করতে হবে তা আমরা কেউ কখনো ভাবিনি। রাত নয়টার দিকে সুহার্তোর মরদেহ নিয়ে গাড়ি উত্তরা পৌঁছায়। কারফিউয়ের কারণে আমাদের কাছে মাত্র পাঁচ-দশ মিনিট সময় ছিল সুহার্তোর মুখ শেষবারের মতো দেখার জন্য। সবাই এক নজর দেখার সুযোগ পেলেও নানা মন্তব্য ও পরিস্থিতির কারণে বেশি সময় দেখতে পারিনি। সুহার্তোর উজ্জ্বল মুখখানি দেখে সবার একটাই কথা—একজন বীরের মুখ।

সবার দেখা শেষ হলে, আমাদের কান্নার মধ্যে দিয়ে সুহার্তোর লাশবাহী গাড়ি তার বাবা-মা, বোন, ফুপি এবং ফুপাতো ভাইকে নিয়ে ছেড়ে দেয় ময়মনসিংহের উদ্দেশে। আমরা কিছু দূর গাড়ির পেছন পেছন যাই, এরপর গাড়িটি চলে যায়। দেশের দুরবস্থা এবং যানবাহনের সংকটের কারণে দুর্ভাগ্যবশত আমাদের আর যাওয়া সম্ভব হয়নি। আমার শহীদ ভাইয়ের জানাজা পড়ার সুযোগ আমি পেলাম না, এই আফসোস আমার আজীবন থেকে যাবে।

সুহার্তোর লাশবাহী গাড়ি অনেক বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে গ্রামে পৌঁছায় এবং আমরা এমনও খবর পাই যে, সুহার্তোর জানাজা এবং কবর দেওয়ার সময় এক দল লোক বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু আল্লাহর অশেষ রহমতে আমার ভাইয়ের জানাজা ২২ জুলাই সকাল দশটায় সম্পন্ন হয়। তার শিক্ষকবৃন্দ, সহপাঠী এবং গ্রামবাসীসহ আরও অসংখ্য মানুষ তার জানাজায় অংশগ্রহণ করে। এরপর সুহার্তোর দাফন সম্পন্ন করা হয়।

সুহার্তোর যখন তিন-চার বছর বয়স, তখন সে আমাকে 'বাবুদাদা' নামে ডাকা শুরু করে। সে সর্বপ্রথম আমাকে এই নামে ডাকে, পরবর্তীতে আমাকে আমার সব ভাই-বোন 'বাবুদাদা' বলে ডাকা শুরু করে। কিন্তু যে আমাকে এই নামটি দিয়েছিল, সে আর এই দুনিয়াতে নেই। তার মুখে আর শোনা হবে না সেই ডাক—'বাবুদাদা।'

সুহার্তো এখন আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। সে এখন শহীদ। এই জালিম দুনিয়া থেকে সুহার্তো চিরদিনের জন্য মুক্তি পেয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালা সর্বোত্তম পরিকল্পনাকারী—এটি বলেই নিজেকে সান্ত্বনা দেই। এখন সুহার্তো শুধু আমাদের স্বপ্নে আসে, বাস্তবে নয়।'

তথ্যসূত্র

১. শাহরিয়ারের বাবার সাক্ষাৎকার

২. খালাতো ভাই এবং আন্দোলনের সহযোদ্ধা বাদল-এর সাক্ষাৎকার

৩. প্রত্যক্ষদর্শী: আন্দোলনের সহযোদ্ধা এবং খালাতো ভাই বাদল-এর বন্ধু আবিদ-এর সাক্ষাৎকার

তথ্য সংগ্রহে:

মোঃ কামরুজ্জামান এবং মোঃ নাহিদ হাসান সজীব;

স্টোরি মেকিং: মোঃ কামরুজ্জামান এবং ড. মোহাম্মাদ সরোয়ার হোসেন

হাশরের ময়দানে সেদিন কী জবাব দেব?

যুবকটি প্রতিদিন আন্দোলনে যাওয়ার আগে মায়ের লাল ওড়না মাথায় বেঁধে, মায়ের কাছ থেকে দোয়া নিয়ে বিদায় নিত। মা নিষেধ করলে বলত—'আমি আল্লাহর কাছে হাশরের ময়দানে সেদিন কী জবাব দেব? তুমি কি বিশ্বাস করো না, পরকালে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে? আর তোমাদের মতো মায়েরা যদি ১৯৭১ সালে থাকতেন, তবে দেশ কখনোই স্বাধীন হতো না। এভাবে কেন কথা বলো? হাদিস জানো, কোরআন জানো। এটা বললেই তো হবে না। আমি যাব।' বাধা দিলে আরও বলত—'আম্মু, তুমি আমাকে বাধা দেবে কেন? আমি যদি ঘরে মারা যাই, তাহলে কি তুমি কিছু করতে পারবে? আন্দোলন গিয়ে মারা গেলে তো শহীদ হবো।'
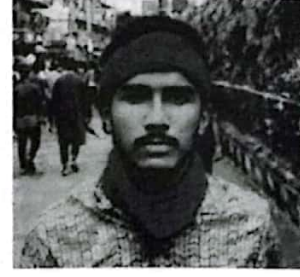
শহীদের নাম: ইশতিয়াক আহমেদ শ্রাবণ
বয়স: ২০ বছর (জন্ম ১৬ই ডিসেম্বর ২০০৪)
মৃত্যুর তারিখ: ৪ আগস্ট ২০০২৪
পিতার নাম: নেছার আহাম্মদ
মাতার নাম: ফাতেমা আক্তার
ঠিকানা: দক্ষিণ আনন্দপুর, ফুলগাজী, ফেনী
শিক্ষা: এইচএসসি

ইশতিয়াক আহমেদ শ্রাবণ ৪ আগস্টেও মায়ের লাল ওড়না মাথায় বেঁধে স্বৈরাচারী সরকারবিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। গুলি লাগার কিছুক্ষণ আগে আন্দোলনের স্থানে শ্রাবণ জোহরের সালাত আদায় করেন। নামাজ শেষে আরেক দল শিক্ষার্থী সালাত আদায় করছিল, আর প্রথম জামাতে নামাজ আদায় করা আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা তাদের পাহারা দিচ্ছিল—যেন আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা নামাজরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করতে না পারে। আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা এক দিক থেকে গুলি করতে করতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। শুরু হয় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীদের বন্দুক থেকে ছোড়া ছয়টি

গুলি এসে লাগে শ্রাবণের গায়ে, বুলেটের আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় শরীর, সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে নুয়ে পড়েন। গুলি লাগার পর আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা পাশের বস্তির এক বাসায় নিয়ে গেলে ২০ মিনিটের মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে পরপারে পাড়ি জমান শহীদ ইশতিয়াক আহমেদ শ্রাবণ।

৪ আগস্ট ছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে অসহযোগের প্রথম দিন। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ফেনীর মহিপালে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান নিয়ে আন্দোলন করছিল ছাত্র-জনতা। শহীদ ইশতিয়াক আহমেদ শ্রাবণ অন্যান্য দিনের মতো সেদিন সকালে বন্ধুদের সাথে নিয়ে যোগ দেন আন্দোলনে।

শহীদ ইশতিয়াক আহমেদ শ্রাবণ ১৭ জুলাই থেকে আন্দোলনে সক্রিয় ছিল। স্থানীয় খুনি হাসিনার সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের দলীয় কর্মীরা তাকে বিভিন্ন সময় হত্যার হুমকি দিয়ে আসছিল। শ্রাবণ সন্ত্রাসীদের হুমকি উপেক্ষা করে আন্দোলনের প্রথম সারিতে থাকতেন। একসময় পরিবার সিদ্ধান্ত নেয়, আন্দোলন থেকে তাকে সরিয়ে রাখার জন্য চট্টগ্রামে খালার বাসায় পাঠিয়ে দেবে। শ্রাবণকে পরিবার থেকে সেই প্রস্তাব দিলে প্রত্যাখান করে সে বলে—'আমাকে চট্টগ্রামে পাঠিয়ে দিয়ে কী হবে? আমি ওখানে গিয়ে ওখানেও আন্দোলনে যোগ দেব।'

শ্রাবণের মা শেষ সময়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন—'৩ আগস্ট জোহরের নামাজ বাসায় পড়ে। এরপর আমার একটা লাল ওড়না নিয়ে মাথায় বেঁধে আমার পায়ে সালাম করে। সালাম করার পর বলেছে, আম্মু, তুমি টেনশন করো না। আমি চলে আসব। এরপর ৩ আগস্ট রাতে সে কিছুটা অস্থিরতায় ভুগছিল। রাত তিনটায় আমার কক্ষে এসে ডেকে বলে, তার ভাত খেতে ইচ্ছা করতেছে, কিন্তু সে খায়নি। তাহাজ্জুদ এবং পরবর্তীতে ফজরের নামাজ পড়ে ঘুমাতে যায়। সেটিই আমার সাথে তার শেষ কথা ছিল।'

শ্রাবণ ৪ আগস্ট সকাল ১১টার দিকে বাসা থেকে বের হয়ে যায় এবং আন্দোলনে যোগ দেয়। ফেনীর সেই সময়ের মহিপালের আন্দোলনে পরিস্থিতি এবং শ্রাবণের শহীদ হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রাবণের সহযোদ্ধা আব্দুল্লাহ আল-মাহফুজ বলেন—'আমাদের একটি অংশ যোহরের সালাত শেষ করে ফেনী পাসপোর্ট অফিসের সামনে হাইওয়ের ফ্লাইওভারের নিচে দাঁড়িয়ে ছিল। আর কিছু ভাই সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ায়। ফ্লাইওভারের নিচে শ্রাবণকে স্পষ্ট দেখতে পাই। হঠাৎ আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা এসএসকে রোডের দিক থেকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আমাদের দিকে এগিয়ে আসে।

আমাদের একাংশ পাসপোর্ট অফিসের সামনে গেলে সেখানে তাদের সঙ্গে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। তারা আমাদের দিকে অমানুষিকভাবে গুলি চালায়, আর আমরা ইট-পাটকেল ছুঁড়ে প্রতিরোধ করি। বেশ কিছুক্ষণ ধরে রাস্তায় উত্তপ্ত পরিস্থিতি চলতে থাকে। একপর্যায়ে আওয়ামী সন্ত্রাসীদের ছোঁড়া গুলি শ্রাবণের শরীরে বিদ্ধ হয়। সে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে। আমি এবং আরও কয়েকজন দ্রুত তাকে পাশে থাকা বস্তির একটি ঘরে নিয়ে যাই। সেখানে দেখতে পাই, শ্রাবণের শরীরে ছয়টি গুলি লেগেছে। শ্বাস নিতে তার চরম কষ্ট হচ্ছিল।

আমি সঙ্গে সঙ্গে তাওহীদ ভাইকে ফোন করে ঘটনা জানাই। আমরা সবাই মিলে শ্রাবণকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম। ঘরের ভেতরে তখন আমরা ছয়জন ছিলাম। বাইরে থেকে গুলির শব্দ অব্যাহত ছিল, তবুও আমরা অ্যাম্বুলেন্স ডাকার চেষ্টা করি। কিন্তু যাদের ফোন করি, তারাই গোলাগুলির কারণে আসতে অস্বীকৃতি জানায়। একপর্যায়ে দেখি শ্রাবণের অবস্থা দ্রুত খারাপের দিকে যাচ্ছে। আমি সবার দিকে তাকিয়ে বলি, 'সবাই কালিমা পড়ো।' আমরা সবাই জোরে জোরে কালিমা পড়তে থাকি। গুলি লাগার প্রায় বিশ মিনিট পর শ্রাবণ জোরে একটা শ্বাস নিল আর সাথেসাথেই চিরনিদ্রায় চলে গেল।

ছবি- ইশতিয়াক আহমেদ শ্রাবণের মৃতদেহ

কিছুক্ষণ পর গোলাগুলির শব্দ থেমে যায়। হঠাৎ এক অচেনা ব্যক্তি এসে বললেন, 'বাইরে একটা সিএনজি আছে, তোমরা ওটা নিয়ে চলে যাও।' আমি শ্রাবণের পা ধরলাম, অন্যরা কেউ হাতে, কেউ কোমরে, কেউ মাথায় ধরে তাকে সিএনজিতে তুললাম। সেই সিএনজিটা আসলে অন্য এক আহতকে মেডিকেলে নেওয়ার জন্য আনা হয়েছিল। আমরা পাসপোর্ট অফিসের সামনে থেকে সিএনজিতে উঠে সার্কিট হাউস মসজিদের সামনে যেতেই একটি অ্যাম্বুলেন্স দেখতে পাই। দ্রুত অ্যাম্বুলেন্স থামিয়ে শ্রাবণকে তাতে তুলি। সেখানে আরও তিনজন গুলিবিদ্ধ আন্দোলনকারী ভাই ছিল।

পরে আমরা শ্রাবণকে বাসায় নেওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হই। মাঝপথে তাওহীদ ভাই গাড়ি নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। অ্যাম্বুলেন্সটি আমাদের নামিয়ে আহত অন্য ভাইদের মেডিকেলে নিয়ে যায়। এরপর আমরা রিকশায় করে শহীদ শ্রাবণকে বাসায় নিয়ে যাই।'

অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে শ্রাবনের মামা বলেন—'দুপুর আড়াইটার দিকে ঘটনাস্থল থেকে শহীদ ইশতিয়াক আহমেদ শ্রাবণের নিথর দেহ তার বন্ধুরা বাসায় নিয়ে আসে। এরপর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য তাকে ফেনী জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক শ্রাবণকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে তার লাশ বাসায় ফিরিয়ে আনা হয়। কিন্তু বাসায় আনার পর স্থানীয় আওয়ামী সন্ত্রাসীরা তাড়াহুড়ো করে শ্রাবণকে দাফন করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। তারা জোরপূর্বক লাশ গোসল করানোর চেষ্টা করে। একপর্যায়ে তারা জোর করে লাশ তুলে গোসলের জন্য নিয়ে যাচ্ছিল। তখন শহীদ শ্রাবণের হাত দুটো নিস্তেজভাবে নিচের দিকে ঝুলে ছিল।

গোসল করানোর পর পরিবারের অনুমতি ছাড়াই তারা জানাজায় অংশ নেয়। এমনকি মসজিদের মাইকে মাইকিং করতেও বাধা দেয়। আমরা এলাকাবাসীকে জানাজার সময় জানাতে মাইকিং করতে চাইলে তারা জানায়, কেন্দ্র থেকে নিষেধাজ্ঞা আছে, মাইকিং করা যাবে না।

শ্রাবণের জানাজায় যারা অংশ নিতে আসছিলেন, আওয়ামী সন্ত্রাসীরা তাদের তালিকা তৈরি করছিল। কেউ ছবি তুলতে চাইলে তাদের বাধা দেওয়া হয়, এমনকি অনেকের ফোন কেড়ে নেওয়া হয় ছবি তোলার চেষ্টা করলে।' শ্রাবণের মা বলেন, 'আমি আমার শ্রাবণকে একটু আদর করতে চেয়েছি, তার মুখটা আরও কিছু সময় দেখতে চেয়েছি। কিন্তু আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা সেই সুযোগটাও আমাকে দেয়নি।'

শ্রাবণের প্রথম জানাজা ৪ আগস্ট বিকেল সাড়ে পাঁচটায় (বাদ আসর) তার বাসার সামনের রাস্তায় অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে গ্রামের বাড়ি দক্ষিণ আনন্দপুরে বাদ মাগরিব দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

শ্রাবণকে হারিয়ে আজ তার মা নিঃসঙ্গ ও অসহায়, বাবার চোখে অশ্রু, বোনের শূন্য দৃষ্টি—এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য কীভাবে ভাষায় প্রকাশ করা যায়? শ্রাবণের চলে যাওয়ায় নিঃস্তব্ধ হয়ে গেছে একটি পরিবার, শূন্য হয়ে গেছে তার মায়ের বুক, যেখানে একসময় ভালোবাসা আর স্নেহের সুর কল্লোলিত ছিল।

একটি পরিবারের অমূল্য রত্ন হারিয়ে গেছে, স্বৈরাচার হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের দলীয় সন্ত্রাসীদের হাতে নির্মমভাবে খুন হয়েছে। শ্রাবণ ছিল সম্ভাবনার দীপ্ত শিখা, যাকে নৃশংসতার অন্ধকারে নিভিয়ে দেওয়া হলো। তার না-ফেরার যাত্রায় যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে, তা কখনোই পূরণ হবে না। মা-বাবার বুক আজ খালি, আর এই শূন্যতা চিরকাল গভীর শোকের প্রতীক হয়ে থাকবে।

শ্রাবণের ফেসবুক টাইমলাইনে গেলে দেখা যায়, ১৫ জুলাই থেকে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে অনলাইনে সোচ্চার ছিলেন। ১৪ জুলাই তৎকালীন স্বৈরাচার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রদেরকে রাজকার বলে সম্বোধন করলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে দেশের প্রত্যেকটা সরকারি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় 'তুমি কে আমি কে রাজাকার রাজাকার, কে বলেছে কে বলেছে, স্বৈরাচার স্বৈরাচার।' এই স্লোগানে উত্তাল হয়ে উঠে। এদেশের ছাত্রসমাজ নিজেদেরকে রাজাকার বলে পরিচয় দিয়ে ফেসবুকে পোস্ট করে স্বৈরাচার শেখ হাসিনার কথার প্রতিবাদ জানানো শুরু করে। শ্রাবণ ১৫ জুলাই ফেসবুকে একটি পোস্ট শেয়ার করেন— ১৬ জুলাই পুলিশ আবু সাঈদকে গুলি করে হত্যা করলে শ্রাবণ আবু সাঈদের ছবি সুপারম্যানের সাথে তুলনা করা পোস্ট শেয়ার করে Real hero of our nation বলে আখ্যায়িত করেন।

শ্রাবণের মা বলেন—ইশতিয়াক আহমেদ শ্রাবণ সব সময় বলত, দ্বীন এবং দেশের জন্য যদি কিছু করতে হয় সবার আগে আমি যাব। শহীদ ইশতিয়াক আহমেদ শ্রাবণ ছিলেন ধর্মপ্রাণ একজন তরুণ, যার জীবন আলোকিত ছিল ইসলামের আদর্শে। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আদায় করতেন এবং দ্বীনের হুকুম যথাযথ পালন করার চেষ্টা করতেন।

পরিবার জানায়, শ্রাবণ ছিলেন একজন সংগঠক এবং ক্রিকেটার। তার পছন্দের খেলা ছিল ক্রিকেট। সে ন্যাশনাল চিলড্রেন'স টাস্ক ফোর্স (এনসিটিএফ) ফেনী জেলার ২০২১-২২ সালের কমিটির সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে ২০২২ সালের দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্বপালন করেছেন। এনসিটিএফ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে অবসর গ্রহণ করার পর ইয়েস বাংলাদেশ ফেনী জেলার সক্রিয় সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

শহীদ ইশতিয়াক আহমেদ শ্রাবণ ২০০৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ২০২৩ সালে তিনি ফেনী সরকারি কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এইচএসসি পাস করেন। উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির অপেক্ষায় ছিলেন, তার স্বপ্নে জ্বলছিল জ্ঞান ও সম্ভাবনার দীপশিখা।

শহীদ শ্রাবণ বাবা-মায়ের সঙ্গে ফেনী শহরের বারাহীপুরে বসবাস করতেন, যদিও তাদের পৈতৃক নিবাস ফুলগাজী উপজেলার আনন্দপুর ইউনিয়নে অবস্থিত। তিন ভাইবোনের মধ্যে শ্রাবণ ছিলেন জ্যেষ্ঠতম এবং পরিবারের একমাত্র পুত্র। তার অস্তিত্বে যেন পরিবার খুঁজে পেয়েছিল এক নতুন প্রজন্মের পথপ্রদর্শক। স্নেহ, দায়িত্ববোধ ও সাহসিকতায় তিনি ছিলেন পরিবারের ভরসার স্থল। তার জীবন ছিল যেমন সাহসিকতায় উজ্জ্বল, তেমনই পরিবারের জন্য আশীর্বাদের প্রতীক।

তথ্যসূত্র:

মা, বাবা, মামা এবং প্রত্যক্ষদর্শী আব্দুল্লাহ আল মাহফুজ

তথ্য সংগ্রহে:

মোঃ নাহিদ হাসান সজীব, মোঃ কামরুজ্জামান;

স্টোরি মেকিং: মোঃ নাহিদ হাসান সজীব এবং ড. মোহাম্মাদ সরোয়ার হোসেন

ছেলের সাথে মা আন্দোলনে যেতে চেয়েছিলেন

শহীদের নাম: সাদ আল আফনান
বয়স: ১৭ বছর ৮ মাস (জন্ম- ১০ নভেম্বর, ২০০৬)
মৃত্যুর তারিখ: ৪ আগস্ট ২০২৪
পিতা: মৃত সালেহ আহমেদ
মাতা: নাসিমা আক্তার
ঠিকানা: লক্ষীপুর সদর, লক্ষীপুর
শিক্ষা: এইচএসসি, লক্ষ্মীপুর ভিক্টোরি কলেজ, লক্ষ্মীপুর

তিন মাস হলো নাসিমা আক্তার স্বামীহারা হয়েছেন। সংসারে স্বামীর অনুপস্থিতিতে ছেলে সাদ আল আফনান হয়ে উঠেছিল বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা। তিন মাস আগের সেই দিনটি—প্রবাসে মৃত্যুবরণ করা বাবার নিথর দেহ ফিরিয়ে আনার জন্য এয়ারপোর্টে গিয়েছিল আফনান, সাথে ছিলেন পরিবারের নিকটতম আত্মীয়রা। কিন্তু কে জানত, মাত্র তিন মাস পরই আফনানও এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে, রেখে যাবে এক গভীর শূন্যতা।

৪ আগস্টের সকাল। আন্দোলনে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে আফনান যখন বাসা থেকে বের হচ্ছিল, মা অনুরোধ করলেন—তাকেও যেন সাথে নেওয়া হয়। অসুস্থ মাকে তখন আফনান বলেছিল, 'আম্মু, আপনি তো অসুস্থ। আপনি দৌঁড়াইতে পারবেন না। আপনি বাসায় থাকেন, আন্দোলনে যাইয়েন না।' বাসা থেকে বের হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর, আওয়ামী সন্ত্রাসীদের গুলিতে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয় আফনান। গুলি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ার পর তাকে পাশের বাগানে নিয়ে যায় সন্ত্রাসীরা। সেখানেই মুমূর্ষু অবস্থায় আফনানকে নির্মমভাবে পেটানো হয়। যে ছেলেকে ঘিরে নাসিমা আক্তার স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই ছেলেকে চিরতরে হারিয়ে ফেললেন। আফনান কি জানত, সেদিনই হবে তার মায়ের সঙ্গে জীবনের শেষ কথোপকথন?

শুরু থেকেই লক্ষ্মীপুরের আন্দোলনের ফ্রন্টলাইনে ছিলেন আফনান। এইচএসসি পরীক্ষার্থী হয়েও, প্রতিদিন সাধারণ ছাত্র-জনতার সঙ্গে আন্দোলনে অংশ নিতেন। ২ আগস্ট শুক্রবার জুমার নামাজের পর তৎকালীন সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি এ. কে. এম. সালাহ উদ্দিন ওরফে টিপুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার ওপর হামলা চালায়। এ ঘটনার পর ছাত্র-জনতার সঙ্গে আওয়ামী লীগের কর্মীদের তীব্র সংঘর্ষ শুরু হয়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ছাত্রদের ধরে নিয়ে নির্মমভাবে পেটানো হয়। সেদিন অনেক দেরি করে ক্লান্ত শরীরে বাসায় ফিরলে আফনানের মা জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আজকে তুমি এত দেরি করে আসছ কেন, বাবা?' 'আম্মা, আজকে অনেক দৌঁড়াইছি। অনেক ঘুরে ঘুরে আসছি। ভেতরের রাস্তা দিয়ে ঘুরে ঘুরে আসছি।'

আফনান ছিলেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—এই আন্দোলনকে বিজয়ে রূপান্তরিত করার জন্য। তার প্রতিবেশী ও সহযোদ্ধা সাজ্জাদ হোসেন স্মৃতিচারণ করে বলেন— 'শুরু থেকেই আফনান ভাইয়ের সঙ্গে আন্দোলন নিয়ে কথাবার্তা হতো। ভাই বলত, 'এই আন্দোলনে আমাদের বিজয় হতেই হবে। নাহলে আমরা ঘরে ফিরব না।' একদিন আন্দোলনের সময় রাতে আমরা কয়েকজন আফনান ভাইয়ের বাড়ির পাশের বাগানে লাঠি কাটতে গেলে এক মহিলার বাধার মুখে পড়ি। তখন আফনান ভাই বলেছিলেন, 'এই মহিলা বোঝে না। না বুঝে বাধা দিচ্ছে। আমরা বিজয় নিয়ে আসব ইনশাআল্লাহ।''

৪ আগস্টের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন আফনানের মা। তিনি বলেন—'আফনান প্রতি রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ত। আমি জিজ্ঞাসা করতাম, 'তুমি ঘুমাও না?' 'অল্প সময় ঘুমাই।' প্রতিদিন মোবাইলে এলার্ম দিয়ে ঘুমাত। এলার্ম বাজলে নামাজের জন্য উঠে যেত। আমি একদিন বলছি, 'তুমি উঠো, আমাকে জাগাও না কেন? তুমি তো তাড়াতাড়ি উঠছ।' ফজরের নামাজ মসজিদে পড়ত। আমাকে বলত, 'আম্মু, আমি যদি টের না পাই, আমাকে জাগিয়ে দিয়েন।' নামাজে যাওয়ার আগে গেইট খুলে বলত, 'আম্মু, আমি মসজিদে যাচ্ছি।' ওই দিনও ফজরের নামাজ মসজিদে পড়ছে। এরপর কিছুক্ষণ ঘুমাইছে। সকাল ৮টার আগে ঘুম থেকে উঠে আবার ওজু করে এসে নামাজ পড়েছে। প্রতিদিন নফল নামাজ পড়ে আন্দোলনে যেত।

প্রতিদিন আন্দোলনে যাওয়ার আগে আমি আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দেই, দোয়া-কালাম পড়ে দেই, শরীরে ফুঁ দিয়ে দেই। আমি বলছি, 'আয়াতুল কুরসি পড়ে নাও।' সেটাও পড়ছে। 'মাস্ক নাও', মাস্ক নিছে, ব্যাগ নিছে। আমি বলছি, 'পিঠে

একটা বোর্ড নিয়ে নাও। ওই যে তোমার প্র্যাকটিক্যাল খাতাগুলো আছে, সেগুলা ভারী আছে, একটা খাতা নিয়ে নাও।' বলছে, 'না আম্মু।' আমি আবার বলি, 'আব্বু, প্রতিদিন যে যাও মাথায় যদি একটা হেলমেট দিতা।' বলে, 'না আম্মু, হেলমেট তো আওয়ামী লীগের পোলাপান দেয়। আমি কেন হেলমেট দিব?' আমি বলছি, 'তুমি মিছিলের মাঝখানে থাকিও।' 'আম্মু, আমি মিছিলের সামনে থাকি?' আমি বলছি, 'না, সামনে না।' 'তাহলে পিছনে থাকি?' 'তুমি মাঝখানে থাকিও। সামনেও যেও না, পিছনেও যেও না। মাঝখানে থাকিও মিছিলের মাঝে।' 'ঠিক আছে, আম্মু।'

কিন্তু আমার বাবা দৌড়াতে দৌড়াতে একেবারে সামনে চলে গেছে। টাচ ফোন রেখে গেছে। বাটন ফোন নিয়ে গেছে। আমি টাকা বেশি দিছি, টাকা বেশি নেয় নাই। 'আম্মু, দিও না। আমি তো হারাই ফেলি টাকা। এত টাকা দিও না।' যে টাকা দিছিলাম ওই টাকা পকেটেই ছিল। 'আম্মু, আমার দেরি হই যায়। ১১টায় সবাই সেখানে থাকবে।' আমিও ওই দিন ওর সাথে আন্দোলনে যেতে চাইছিলাম। আমাকে নেয় নাই। 'আম্মু, আপনি তো অসুস্থ। আপনি দৌঁড়াইতে পারবেন না। আপনি বাসায় থাকেন, আন্দোলনে যাইয়েন না।' আমি বলছি, 'ফোন দিও, বাবা।' আর তো ফোন দেয় নাই। আমি দিছি ফোন। একবার ডুকে নাই, আবার দিছি। ফোন রিসিভ করে না। দশটা চুয়ান্ন মিনিটে বের হইয়া গেল। ঠিক ১২টার সময় আমাকে ফোন দিয়ে একজন বলতেছে, 'আপনার ছেলে অসুস্থ, হাসপাতালে আসেন। মাথায় আঘাত লাগছে।' কী হয়েছে তা বলে না, সদরে যেতে বলছে।'

ছবি- গুলিবিদ্ধ আফনান

মা বারবার মিছিলের মাঝখানে থাকার কথা বললেও সংঘর্ষের সময় আফনান সামনে চলে যায়। সে ভেবেছিল মাকে নিয়ে গেলে মা আহত হতে পারেন। কিন্তু ঘাতকের বুলেটের আঘাতে সে-ই চলে গেল। মাকে ছেড়ে।

আফনানের আন্দোলনের সহযোদ্ধা রাজিব হোসেন (লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ, রাষ্টবিজ্ঞান, ডিগ্রি-২য় বর্ষ) জানান—'আমি উত্তরণ ব্লাড ডোনেট ব্যাংক সোসাইটির চেয়ারম্যান। আফনান একজন নিয়মিত রক্তযোদ্ধা (ডোনার) ছিলেন। সে হিসেবে আফনানের সাথে আমার ভালই পরিচয় ছিল।

৪ আগস্ট সকাল এগারোটায় ঝুমুর চত্বরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের গণজমায়েত ছিল। একই সময় আওয়ামী লীগ স্টেশন এলাকায় কর্মসূচি দেয়। আমাদের পরিকল্পনা ছিল স্টেশন এলাকার উপকূল কাউন্টার থেকে মিছিল করে ঝুমুর চত্বরে গিয়ে গণজমায়েত শুরু করা।

কর্মসূচি শুরু হতে একটু দেরি হয়। উপকূল কাউন্টার থেকে মিছিল নিয়ে বাগবাড়ি দিয়ে মাদাম ব্রিজ পার হয়ে ঝুমুর চত্বরে যাই। যারা মিছিলের একটু আগেই বাগবাড়িতে চলে গিয়েছিল, তাদের ওপর আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা আক্রমণ করে। পরে, মিছিল থেকে আমরা সন্ত্রাসীদের ধাওয়া দিলে তারা পালায়।

ঝুমুর চত্বরে পৌঁছে কর্মসূচি শুরু করি। কিছুক্ষণ পর দেখি, একটি মিছিল ব্রিজ পার হয়ে আমাদের দিকে আসছে। প্রথমে মনে হলো, আমাদের লোক। কিন্তু মিছিলটি আমাদের কাছাকাছি এলে দেখি, তারা আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী। সামনে পতাকা নিয়ে এসেছিল, যাতে তাদের চিনতে না পারি। ওরা ডিসি অফিসের সামনে চলে আসে। আমরা তাদের ধাওয়া দিলে তারা মাদাম ব্রিজ পার হয়ে আরও ১৫০ গজ পশ্চিমে অবস্থান নেয়। অল্প কিছুক্ষণ পরেই ওরা প্রস্তুতি নিয়ে পুনরায় বন্দুকসহ ব্রিজের অপর পাশের কাছাকাছি চলে আসে, তখন আমরা ব্রিজের ওপর অবস্থা করছি। আফনানসহ আমরা সবাই তাদেরকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকি।

হঠাৎ, সন্ত্রাসীরা (তৎকালীন সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি এ কে এম সালাহ উদ্দিন ওরফে টিপুর নেতৃত্বে) ব্রিজের অপর পাশ থেকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আমাদের দিকে এগিয়ে আসে। প্রথম গুলিটাই আফনানের মাথায় লাগে, এবং সে ব্রিজের ওপর পড়ে যায়। গুলিটি তার মাথার ডান পাশের চিপে লাগে। এসময় আরও অনেকে গুলিবিদ্ধ হয়।

আমরা পিছু হটলে সন্ত্রাসীরা ব্রিজের ওপর পড়ে থাকা গুলিবিদ্ধ আফনানকে টেনে হেঁচড়ে ব্রিজের অপর পাশে নিয়ে যায়। এরপর শিশু পার্কের রোডে নিয়ে তাকে লাঠি দিয়ে নির্মমভাবে পেটায়। লাঠির আঘাতে আফনানের কান ছিঁড়ে যায়, মাথার একপাশ থেতলে যায় এবং বেশিরভাগ আঘাতই তার মাথায় করা হয়। পুলিশ তখন সার্কিট হাউজের ভেতর থেকে দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

ভিডিও: সন্ত্রাসীদের গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ে আফনান ভিডিও

দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে আফনানের মা হাসপাতালে গিয়ে তাকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পান। লক্ষ্মীপুর হাসপাতাল থেকে ঢাকায় নেওয়ার পথে, নোয়াখালীর মাইজদিতে দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে আফনান মৃত্যুবরণ করে। বাদ আসর লক্ষ্মীপুর বাস টার্মিনাল এলাকায় জানাজা শেষে নানা বাড়িতে তাকে দাফন করা হয়।

আফনানের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন মা নাসিমা আক্তার। তিনি বলেন—'শহীদ হওয়ার আগের দিন রাতে এশার নামাজ শেষ করে আমি জায়নামাজে বসে ছিলাম। আফনান বড় লাইটটা বন্ধ করে দিছে। ও তো কখনো গান শোনে না। কিন্তু তখন একটা গান শুনায়—*'আম্মা জান, আম্মা জান, আপনি বড় মেহেরবান।'* আর মোবাইলের আলো দিয়ে আমার মুখ দেখতেছে। যখন দেখছে, আমি মুখ ঢেকে হাসতেছি, তখন রুম থেকে চলে গেছে।

আমার আফনান পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথেই পড়ত। ছেলেদের নামাজের জন্য বলত। চার রাকাত নামাজ পড়তে বিশ মিনিট সময় নিত। সময় নিয়ে ধীরে ধীরে নামাজ পড়ত। ভালো ভালো কাজ করত। কেউ কোনো কাজ করতে বললে করে দিত। আমি জিজ্ঞেস করতাম, 'তুমি এতক্ষণ কী করছ?'বলত, 'আম্মু, অমুকের এই কাজ করে দিছি।' জুন মাসের চার তারিখ, একজন বাচ্চার মাকে এক ব্যাগ রক্ত দিয়ে আসছে। আমাকে অনেক আদর করত। আমার কাজগুলো করে দিত। আমি কোথাও গেলে রান্না করে রাখত। ছাদ থেকে আমার জামাকাপড় এনে দিত।

শখ করে কবুতর পালত। কবুতরের দরজা খুলত, বন্ধ করত, খাবার দিত। বলত, 'আমি এগুলো অনেক জোড়া করব, তারপর বিক্রি করে টাকা ইনকাম

করব।' গাছে পানি দিত, মুরগিকে খাবার দিত। আমি বলতাম, 'প্রতিদিন তুমি সকালে ইয়াসিন সুরা পড়বে।' সে ইয়াসিন সুরা পড়ত।

আফনানের বাবা মারা যাওয়ার পর ওর বোন কান্না করত। তখন আফনান ওর বোনকে একদিন ধমক দিয়ে বলে, 'তুই এমন কান্না করছ কেন? আমার আম্মুর বাঁচা লাগবে না? আম্মুকে মেরে ফেলবি নাকি? এমন করছ কেন? তোর কি একারই বাবা? আমার বাবা না?' আমাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে কান্না করে বলত, 'আম্মু, কান্না করিয়েন না। আমি আছি না?' আমাকে অনেক বুঝাইছে, ওর বোনকেও বুঝাইত। আমাকে সালাম দিয়ে রুমে ঢুকত। কখনো আমার মুখ গম্ভীর দেখলে বলত, 'আম্মু, কী হইছে? আপনার মন খারাপ? শরীর খারাপ?'

আফনানের বোন জান্নাতুল মাওয়া বলেন—'আমার মন খারাপ থাকলে সে নানাভাবে আমাকে হাসানোর চেষ্টা করত। আমি বলতাম, 'তুই আমার সাথে এমন করছ কেন? আমি তোর জন্য একটু মন খারাপ করে থাকতে পারি না বাসায়।' আম্মু বেশি কাজ করলে বলত, 'আম্মু, একটু কম কাজ করেন। একটু ঘুমাইতে পারেন না? এত বেশি কাজ করিয়েন না, অসুস্থ হয়ে যাবেন।' 'আমার মেয়েকে ফোন দিয়ে বলত, 'আপু, তুই ঢাকা থেকে চলে আয় তাড়াতাড়ি।' আমার মেয়ে জিজ্ঞাসা করত, 'কেন রে?' 'আমার খুব খারাপ লাগে। একা এক ভাল লাগে না বাসায় থাকতে' 'তোর কি আপুর জন্য পরাণ পুড়ে?' 'হ্যাঁ, আমার ভালো লাগে না একা একা থাকতে। ঘরের ভেতর একা একা লাগে।' এখন তো আমার আফনান কবরে একা একাই থাকে।'—শহীদ সাদ আল আফনানের মা।

তথ্যসূত্র

১. আফনানের মা এবং বোন (জান্নাতুল মাওয়া)-এর সাক্ষাৎকার

২. প্রত্যক্ষদর্শী: আন্দোলনের সহযোদ্ধা রাজিব হোসেন এবং প্রতিবেশি ও আন্দোলনের সহযোদ্ধা সাজ্জাদ হোসেন সাক্ষাৎকার

৩. ভিডিও: আফনানের গুলিবিদ্ধ হওয়ার ভিডিও

তথ্য সংগ্রহে:

মোঃ কামরুজ্জামান, মোঃ নাহিদ হাসান সজীব;

স্টোরি মেকিং: মোঃ কামরুজ্জামান এবং ড. মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন

'আমার ফোন আর লাশ আম্মুর কাছে পৌঁছে দিবেন'

শহীদের নাম: মো. ফরহাদ হোসেন
বয়স: ২২ বছর,৮ মাস (জন্ম ১ জানুয়ারি, ২০০২)
মৃত্যুর তারিখ: ৪ আগস্ট ২০২৪
পিতা: মো. গোলাম মোস্তফা
মাতা: শিরিনা বেগম
ঠিকানা: মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলার নাকোল ইউনিয়নের রায়নগর গ্রাম।
শিক্ষা: বি.এ অনার্স স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

'আমার ফোন আর লাশটা আমার আম্মুর কাছে পৌঁছে দেবেন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু।'— মৃত্যুর অন্তিম মুহূর্তে সহযোদ্ধা ও বন্ধু অভির সামনে এই বাক্য দুটি উচ্চারণ করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থী মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে মাগুরায় ছাত্রলীগের গুলিতে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি শহীদ হন।

২০০২ পহেলা জানুয়ারি ফরহাদ হোসেন জন্মগ্রহণ করেন মাগুরার শ্রীপুরের নাকোল ইউনিয়নের রায়নগর গ্রামের গড়াই নদীর তীরে। গোলাম মোস্তফা ও শিরিনা বেগম দম্পতির ছোট সন্তান ফরহাদ হোসেন। বাবা গোলাম মোস্তফা গাড়ি চালক, আর মমতাময়ী মায়ের মূল পেশা ছিল সন্তান প্রতিপালন, অর্থাৎ তিনি গৃহিণী। দুই ভাই ও দুই বোনের মধ্যে ফরহাদ সবার ছোট। বড় ভাই গোলাম কিবরিয়া পড়াশোনা করছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইসলামিক স্টাডিজ' বিভাগে। পরিবারের সবার ছোট ছিল ফরহাদ। অনেক সময় মধ্যবিত্ত পরিবারের সবার ছোট মানুষটির মনে বড় হওয়ার তীব্র বাসনা ও বেদনা কাজ করে। তারই প্রমাণ যেন ফরহাদ দিয়ে গেলেন ইনসাফ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে প্রাণ উৎসর্গ করে।

শহীদ ফরহাদ হোসেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষ, ২১-২২ সেশনের শিক্ষার্থী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষে ৩.৬১ পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন। শহীদ ফরহাদ যদিও এর আগেই নিজ মেধার স্বাক্ষর রেখেছিলেন— এসএসসি পরীক্ষায় স্কলারশিপ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

হয় শাহাদাহ্ নয় মুক্তি

আর আসবো না বলে মিছিলের প্রথম পতাকা তুলে নিই হাতে। আর আসবো না বলে সংগঠিত করে তুলি মানুষের ভেতরে মানুষ।— কবি আল মাহমুদ।

আল মাহমুদের কবিতার এই মানুষটি যেন ফরহাদ নিজেই। ৪ আগস্ট— স্বৈরশাসকের অন্তিম পরিণতি হতে আর মাত্র ২৪ ঘণ্টা বাকি! ফেরাউন যেমন মুসা আলাইহিস সালামের দলবল সবাইকে হত্যা করতে চেয়েছিল, ঠিক একই কাজের পুনরাবৃত্তি করে পতিত হাসিনা সরকার। দুপুরের সূর্যের অগ্নিতাপ যত বাড়ছিল আন্দোলনকারীদের দৃঢ়তা ও প্রখরতা যেন ততই বাড়ছিল। হয় জালিমের কবল থেকে মুক্তি, নয় শাহাদাহ, এই অন্তিম প্রতিজ্ঞায় তীব্র প্রতিবাদ গড়ে তোলে। ফরহাদসহ তার বন্ধুরা একে একে মাগুরা শহরের ঢাকা রোড বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন পারনান্দুয়ালী ব্রিজের কাছে জড়ো হতে থাকে।

শহীদ হওয়ার ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে প্রত্যক্ষদর্শী ফরহাদের বন্ধু ও সহযোদ্ধা অভি বলেন—'৪ আগস্ট, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে দেশের স্বার্থে, দেশের মানুষের স্বার্থে, ফরহাদ হোসেনসহ আমরা ৫ থেকে ৭ জন বন্ধু মাগুরায় গিয়ে আন্দোলনে অংশ নেই। ওই দিন দুপুরে মাগুরা পারনান্দুয়ালী ব্রিজের কাছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মিছিলে অস্ত্র হাতে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা ধাওয়া করে। এ সময় পুলিশ রাবার বুলেট ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। ব্রিজের নিচ থেকে উঠে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের ছোঁড়া একটি গুলি ফরহাদ হোসেনের মাথায় লাগলে ঘটনাস্থলেই শহীদ হয়। মাথায় গুলিটা লাগার পর ফরহাদ ধীরে ধীরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। গুলি লাগার পরও সে বিচলিত ছিল না। শান্তস্বরে আশেপাশে ঘিরে থাকা আন্দোলনকারীদের বলল, 'আমার নাম মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন, বাসা রায়নগর (মাগুরা)। আমার ফোন আর আমার লাশটা আমার আম্মুর কাছে পৌঁছে দেবেন। মৃত্যুর পূর্বে তার শেষ বাক্য ছিল আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসুলুহু। কালেমা পড়ার পর, এরপর ওর আত্মাটা উড়ে গেল চিরন্তন মুক্তির পথে।'

ছবি: মাথায় গুলিবিদ্ধ মৃত ফরহাদকে বাঁচানোর জন্য সহযোদ্ধাদের পানি পান করানোর অন্তিম প্রচেষ্টা।

ফরহাদের বন্ধু ও আন্দোলনের সহযোদ্ধা ইমতিয়াজ সাকিব ছিলেন ফরহাদের শাহাদাতের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। তিনিই প্রথম ফরহাদকে মাগুরায় গিয়ে আন্দোলনে যোগ দিতে উৎসাহিত করেন। তিনি ফরহাদের শহীদ হওয়ার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন—'ফরহাদ আমার বাল্যবন্ধু। স্থানীয় প্রাইমারি স্কুল, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজে একসাথে লেখাপড়া করেছি। এসএসসি পাসের পর ফরহাদ মেধার ভিত্তিতে ইতিহাস বিষয়ে চান্স পেয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। ফরহাদ অত্যন্ত বিনয়ী ও দৃঢ় মানোভাবের ছিল এবং ধার্মিক ছিল। স্বেচ্ছায় কখনো নামাজ ছাড়েনি। কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সে সম্পৃক্ত ছিল না। এক সাথে বড় হয়েছি, খেলাধুলা করেছি। তার মৃত্যুতে আমরা বন্ধুহারা হয়েছি। ফরহাদের নামে এলাকার কারো কোনো অভিযোগ নেই।

৩ আগস্ট, মাগুরা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজে সরকার পতনের এক দফা বাস্তবায়ন করার ঘোষণা দেওয়া হয়। স্বৈরাচারী খুনি হাসিনার পতন নিশ্চিত করতে ৪ আগস্ট সকল ছাত্র-জনতাকে সকাল নয়টার মধ্যে 'মাগুরা পারনান্দুয়ালী ঢাকা রোড' এলাকায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। উক্ত পোস্ট দেখার পর আমি ফরহাদকে আন্দোলনে অংশগ্রহণের বিষয়টি

জানাই। জানানোর পর ফরহাদ আমাকে বলল, 'তুই যদি আন্দোলনে যাস, তাহলে আমি যাব।' তারপর ৪ তারিখ সকালবেলা ওকে আমি ফোন দেই এবং বললাম, তুই আন্দোলনে যাবি? ফরহাদ বলল, 'হ্যাঁ আমি আন্দোলনে যাব।' তারপর আমি, ফরহাদসহ আমার এলাকার মোট সাতজনকে নিয়ে একটা অটোতে করে মাগুরার পথে রওনা দেই। আমরা মাগুরা শহর থেকে পাঁচ-ছয় কিলোমিটার দূরে আমাদের গাড়ি আটকে দিয়ে বলা হয়, 'সামনে গোলাগুলি চলছে আপনারা সামনে যেতে পারবেন না।' যার ফলে আমরা মাগুরা যাওয়ার জন্য একটা বিকল্প রাস্তা অবলম্বন করি এবং আন্দোলনের স্থল থেকে ১-২ কিলোমিটার দূরে একটা জায়গায় আমরা অবস্থান করি। সেখান থেকে আমরা গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পাই। বিশেষ করে আমরা সাউন্ড গ্রেনেডের আওয়াজ বেশি শুনতে পাচ্ছিলাম এবং অনেকটা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি এবং ঠিক করি, আমরা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করব না।

ঠিক সেই মুহূর্তে ফরহাদ আমাদেরকে বলে, 'এতো ভয় পেলে কি হয়? আন্দোলন করার জন্য এসেছি, আন্দোলন করবই।' ওর সাহসী মনোভাব আমাদের আন্দোলনে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। তারপর আমরা পায়ে হেঁটে যখন আন্দোলনস্থলে পৌঁছাই, তখন সময় দশটা বেজে ৫০ মিনিট।

আমরা শুরু থেকেই আন্দোলনের একদম সামনের দিকে অবস্থান করি। আন্দোলনের শুরু থেকেই পুলিশ রাবার বুলেট, সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহার করছিল, মাঝে মাঝে ১৫-২০ মিনিট পর পর ছাত্রলীগও গুলি ছুঁড়ছিল। হঠাৎ পুলিশের ছোঁড়া একটা রাবার বুলেট আমার মাথায় এসে লাগে এবং অনেক রক্তক্ষরণ হয় যেটা দেখে আমি অনেকটা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি এবং আন্দোলন-স্থল ত্যাগ করে একটা বাড়িতে অবস্থান করি। এভাবেই দুই ঘণ্টা ধরে আমাদের আন্দোলন চলতে থাকে, ধাওয়া পাল্টা-ধাওয়া চলতে থাকে।

দুপুর পৌনে দুইটার দিকে ফরহাদ আমাকে ফোন দিয়ে বলে, তুই কোথায়? আমি তখন বললাম, 'আমি একটা বাসায় আছি।' ও আমাকে বাইরে আসতে বলল। বাইরে আসার পর ও আমাকে বলল, 'নামাজ পড়া দরকার।' ফরহাদকে আমি একটা বাসায় নিয়ে গেলাম, ও সেখানে জোহরের নামাজ আদায় করল, ফরহাদ সেদিন দুপুরের নামাজ দীর্ঘায়িত করেছিল। ধীরস্থিরভাবে মোনাজাত শেষ করল। তারপর আমরা আবার আন্দোলনস্থলে যোগ দেওয়ার জন্য তৈরী হলাম। তখন একজন সবাইকে দুপুরের খাবারের প্যাকেট দিচ্ছিল, ফরহাদ ওর খাবারের প্যাকেটটা একটা বাচ্চাকে দিয়ে দেয়, এরপর সাথে সাথে আমরা আবার আন্দোলনে যোগ দিই।

যখন ছাত্ররা পুলিশকে আবার ধাওয়া করে, তখন ফরহাদকে বলি, 'চল, আবার আন্দোলনের মধ্যে ঢুকি। আমরা সামনের দিকে এগোতে থাকি, কিন্তু কখন ফরহাদ আমার পাশ থেকে আরও এগিয়ে একেবারে সামনের দিকে চলে যায় বুঝতে পারিনি; ঠিক সেই মুহূর্তে দুই-তিনটা গুলির আওয়াজ কানে ভেসে আসে! আমি পেছনের দিকে দৌড়াতে থাকি।' কিছুক্ষণ পর আমাদের সাথে গ্রাম থেকে আসা অভি কান্না করতে করতে বলল, 'ফরহাদের মাথায় গুলি লেগেছে, ও মারা গেছে।' সময় তখন আনুমানিক দুপুর আড়াইটা বাজে।

'নসিমনে' করে ফরহাদকে মাগুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কর্তব্যরত ডাক্তাররা দেখেই বলেন, 'ও মারা গেছে'। নিশ্চিত হওয়ার জন্য ইসিজি করে প্রায় বিশ মিনিট পর পুনরায় জানাল, 'ও মারা গেছে'। আমরা ডাক্তারের কাছে ডেথ সার্টিফিকেট চাইলাম। বলল, দিতে পারবে না। ইতিমধ্যে এলাকায় জানাজানি হয়ে গেছে, ফরহাদ মারা গেছে। কোনোরকম করে একটা অ্যাম্বুলেন্স ম্যানেজ করি। লাশ আনার পথে পুলিশ আমাদের গাড়ি আটকায়। অনেক বাধা পেরিয়ে আমরা লাশটা বাসায় নিয়ে আসি।'
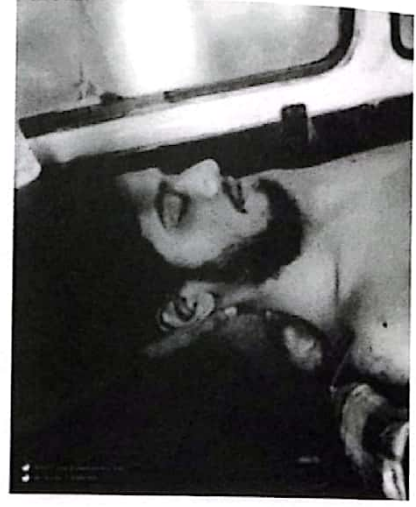
আলোকচিত্র: অ্যাম্বুলেন্সে করে শহীদ ফরহাদের লাশ এলাকায় নিয়ে আসার পথে তোলা ছবি।

আহ! কী হৃদয়বিদারক দৃশ্য! গুলিবিদ্ধ ফরহাদ! জোনাকির আলোর মতো মিটমিট করছে ফরহাদের জীবন প্রদীপ! হয়তো বেঁচে আছে! এমন আশা নিয়ে ইতিমধ্যে শহীদ হওয়া ফরহাদকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার তোরজোড়! 'নসিমন' আনা হলো ফরহাদকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট মাগুরা হাসপাতালে ফরহাদকে নিয়ে আসা হলো। প্রায় পৌনে তিনটার দিকে পরিবার জানতে পারে, ফরহাদ সফলতার সাথে দুনিয়ার পাঠ চুকিয়েছে! কিন্তু এভাবে সফলতার মাধ্যমে দুনিয়া থেকে প্রস্থান করবে, পরিবারের ছোট সদস্য, এমনটা নিশ্চয়ই দুনিয়ার কোনো বাবা-মা, ভাই-বোনের জন্য প্রত্যাশিত না। ২৪-এর আন্দোলনে আওয়ামী জাহেলিয়াত এভাবেই অজস্র মায়ের বুকের ধন কেড়ে নিয়েছে। হাসপাতাল থেকে লাশ নিয়ে বাড়িতে আসা হয় আছরের সময়। একদিকে জালিম হাসিনার পতনের

ষোলোকলা পূর্ণ হওয়ার আর কিছু সময় বাকি। অন্যদিকে শহীদ ফরহাদকে ঘিরে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলমান। মুফতি সাহেবদের পরামর্শমতে ফরহাদের গোসল করানো হয়নি। কারণ, শহীদদের গোসল করাতে হয় না।

রাত দশটার সময় জানাজার জন্য রায়নগর পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ ও মাদরাসা মাঠে লাশ নিয়ে আসা হলো। বড় ভাই গোলাম কিবরিয়া ছোট ভাইয়ের জানাজার নামাজের ইমামতি করলেন। জানাজা আদায় শেষে রায়নগর পশ্চিমপাড়া গোরস্থানে শহীদ ফরহাদকে দাফন করা হয়। রহিমাহুল্লাহ

পরিবার, সমাজ, ধর্মপালন থেকে শুরু করে নিজের পড়াশোনা—সবকিছুতেই বেশ দায়িত্বশীল ছিল ফরহাদ। নামাজ, রোজা এবং কুরআন তেলাওয়াতে গভীর মনোযোগ ছিল। ইসলামের আদর্শ মেনে জীবনযাপন করত। নফল রোজাগুলোও রাখত। বিনয়ী মানুষগুলোর মধ্যে সাহসিকতা একটা বিরল গুণ, যা ফরহাদের ছিল। ফরহাদ তার আপুদের সবসময় জিজ্ঞেস করত, 'কীরে আপা, তোমরা কি আমার জন্য দোয়া করো না? আমার কি শহীদী মৃত্যু হবে না?'

শহীদ হওয়ার আগে ফরহাদ তার আম্মুকে বলেছিল, 'মা, আমার মন বলছে, আমি আর বেশি দিন বাঁচব না। আমার মন বলছে আমার আর বেশিদিন নেই!' ফরহাদ সম্ভবত তার ইহজীবনের সমাপ্তির বিষয়টা আগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন। পরিবারের সদস্যদের সাথে তার মৃত্যু নিয়ে কথাও বলত। মৃত্যুর প্রায় ১ ঘণ্টা আগে ধীরস্থিরভাবে জোহরের নামাজ আদায় করে। দীর্ঘ মোনাজাতে আল্লাহর কাছে জালিমের পতনের ফরিয়াদ করে, মাজলুমের মুক্তির জন্য অশ্রুসজল আকুতি জানায়। এর কিছু পরেই আন্দোলনের ময়দানে শরিক হয়ে শাহাদাতের শরাব পান করে।

একসাথে জালিমের পতন ও মৃত্যুর সংবাদ

ফরহাদের মৃত্যুর সংবাদ তাঁর সহপাঠী রিয়াদ আহমেদ রুমমেটকে জানানোর জন্য মেসেঞ্জারে টেক্সট লেখে—'আসসালামু আলাইকুম ভাই। আপনার সাবেক রুমমেট মাগুরার ফরহাদ গুলি লেগে মারা গেছে। আমাদের ডিপার্টমেন্টের।

—'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন!'

—আপনি এতক্ষণ কই ছিলেন? কালকেও পাইনি?

—'আমি অনেকবার লিখতে গিয়েও কিছু লিখতে পারিনি ভাই! পাঁচ ওয়াক্ত নামাজি ছেলে...।' —জ্বি ভাই।

—'আমি প্রথম তোমার কাছ থেকে নিউজটা শুনি। দুটো নিউজ একসাথে পাই, একদিকে ফরহাদের মৃত্যু সংবাদ, অন্যদিকে খুনি, উন্মাদ, জালিম হাসিনার পতনের সংবাদ। আর একটা দিন বেঁচে থাকলে জালিমের পতন দেখত ও!'

— আহ! দোয়া করেন।'

আহ কী নিদারুণ দৃশ্য! দোয়া ছাড়া আর কী বা করার আছে। খুনের নেশা পেয়ে বসেছিল উন্মাদ হাসিনাকে! শান্ত, বিনয়ী, মেধাবী ফরহাদকেও বাঁচতে দেয়নি।

ঈমানি মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা:

শহীদ ফরহাদের রুমমেট চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ফাইনাল ইয়ারের রাজনীতি-বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ১৯-২০ সেশনের সজিব হাসান বলেন—'ফরহাদ ফরজ সালাতের পর প্রচুর কান্নাকাটি করত। আল্লাহ তায়ালার কাছে ঈমান নিয়ে মৃত্যুর জন্য দোয়া করত। তার নামাজ, রোজা ও উত্তম আখলাক সবাইকে মুগ্ধ করত। ফজরের নামাজের জন্য সবার আগে জেগে ডাকত, 'ভাইয়া আজান হয়ে গেছে, নামাজ পড়ে নিন। গত রমজানে ইফতারের আগ মুহূর্তে ফরহাদ দোয়া করেছিল 'হে আল্লাহ, আমাদের রোজা কবুল করুন, সকল ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করে দিন, ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণের তৌফিক দিন। আমিন। রোজাদারের দোয়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অবশ্যই অবশ্যই কবুল করেন। ফরহাদ ঠিকই ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করলেন। কী অপূর্ব মৃত্যু!

আন্দোলন জড়ানো শুরুর গল্প

ফরহাদ জুলাই আন্দোলনের সাথে কীভাবে সম্পৃক্ত হয়? জানতে চাইলে বড় ভাই গোলাম কিবরিয়া বলেন—চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শাটল ট্রেনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে চট্টগ্রাম শহরে এসে আন্দোলনের কর্মসূচীতে অংশ নেয়। ১২ জুলাই, শুক্রবার চট্টগ্রামে যেদিন বড় মিছিল হলো সেদিন ও আন্দোলনে ছিল, কিন্তু বাসায় জানায়নি। ফরহাদ চায়নি তাঁর আম্মু তাকে নিয়ে চিন্তা করুক। এরপর ১৭ জুলাই সারা দেশের বিভিন্ন এলাকায় ছাত্র বিক্ষোভ, সড়ক-মহাসড়ক অবরোধ, গায়েবানা জানাজা, কফিন মিছিল এবং দফায় দফায় সংঘর্ষ ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটলে হলগুলো বন্ধ হয়ে যায়, যার ফলে বাসায় চলে আসে। এলাকায় বন্ধুদের সঙ্গে মিছিলের উদ্যোগ নিলে পুলিশ এসে বাঁধা দেয়, এরপর আন্দোলন আরো ঘনীভূত হলে অন্যদের সঙ্গে মাগুরা শহরে আন্দোলনে যোগ দেয়।

পরিবারের স্মৃতিচারণ

বড় ভাই গোলাম কিবরিয়া শহীদ হওয়ার আগের রাতের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন—'তাহাজ্জুদে উঠে তোমার অশ্রুতে জানানো আকুতি আল্লাহ তায়ালা কবুল করে নিলেন। আল্লাহ তোমাকে শাহাদাতের মৃত্যুই দান করলেন। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে শহীদ হয়ে আমাদেরকে উপহার দিয়ে গেলে মুক্ত স্বদেশে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ, আর নিজের মহা পুরস্কারটা নিয়ে নিলে মহান রবের কাছ থেকে। আমরা মহান রবের ফায়সালায় সন্তুষ্ট। রব তোমার ওপরেও পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট হোন, তোমাকে পরিপূর্ণরূপে সন্তুষ্ট করুন। আল্লাহ তায়ালার এমন মাহবুবের সহোদর হওয়াই যে জীবনের শ্রেষ্ঠ নিয়ামত।'

শহীদ হওয়ার দিন মৃত্যুর মিছিলে সামিল হওয়ার উদ্দেশ্য ৪ আগস্ট খুনি হাসিনার পতনের একদিন আগে বাসা থেকে বের হওয়ার সময়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বড় ভাই গোলাম কিবরিয়া বলেন—'ঘটনার দিন সকালে বাসার সবাই আন্দোলন নিয়ে কথা বলছিলাম। ফরহাদ বলে উঠল, 'ভাই, চলেন শহীদ হয়ে আসি।'

এরপর ও আন্দোলনে চলে গেল। যোহরের নামাজ মাগুরা শহরের পারনান্দুয়ালী ব্যাপারী পাড়া জামে মসজিদে আদায় করল, নামাজের পর বসে অনেকক্ষণ দোয়া করল। এরপর আন্দোলনে নামলে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়। বুলেট লাগার পর বেশিক্ষণ সময় পায়নি। অল্প কয়েকটা কথা বলেছিল, 'আমার নাম মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন, বাসা রায়নগর। দয়া করে আমার ফোন এবং আমার লাশটা আমার আম্মুর কাছে পৌঁছে দেবেন।' নিজে নিজেই কালেমা পড়ল, এরপর আল্লাহ তায়ালার ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেল। দোয়া করি, আশা রাখি এবং পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি, আল্লাহ তায়ালা আমার ভাইকে শহীদ হিসাবে কবুল করেছেন। আল্লাহ তায়ালা যেন ওর ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং ওকেও সন্তুষ্ট করে দেন। আমরা আল্লাহ তায়ালার ফায়সালায় সন্তুষ্ট।'

পরিবারের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে বলেন—'আমার ভাই শাহাদাতের নিয়ত করেই জালেম সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে গিয়েছিল এবং মহান আল্লাহ তাঁর ইচ্ছাকে পূর্ণ করেছেন। ওকে হারিয়ে আমাদের এখন হৃদয়ে শূন্যতা অনুভব করছি, কিন্তু ওর রক্তের প্রতিটি বিন্দুতে ফুটে উঠেছে দেশের স্বাধীনতার পবিত্রতম প্রতিচ্ছবি। আমি এবং আমার বাবা-মা আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আল্লাহ তায়ালাও আমার ভাইয়ের ওপর সন্তুষ্ট। এমন মৃত্যু যা দেশের মানুষকে মুক্তি এনে দেয়, জাতির ওপর চলতে থাকা দীর্ঘদিনের জুলুমকে মিটিয়ে

দিতে সাহায্য করে, সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্যে পৌঁছাতে সেতুবন্ধন তৈরি করে; এমন মৃত্যুই তো একজন আদর্শবান মানুষের কাম্য। যে আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আমার ভাইসহ বাংলাদেশের সহস্রাধিক মানুষ জীবন দিয়েছে, আমাদের দায়িত্ব এখন সেই আদর্শকে পূর্ণতা দিয়ে টিকিয়ে রাখা।'

WE FOR US

শহীদ ফরহাদ হোসেন এলাকায় 'We for us' নামে একটি কল্যাণমূলক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। এই সংগঠনের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ, শীতে কাপড় দান, অসুস্থদের সহায়তা প্রদান, রমজানে ও ঈদে গরিব মানুষকে সহায়তা প্রদানের কাজ সংগঠনের অন্য সদস্যদের সঙ্গে দায়িত্ব নিয়ে সম্পন্ন করেছে। 'We For Us' সংগঠনের মাধ্যমে শুরু হওয়া মানুষের জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কিছু করার তাড়না নিজের জীবন মাজলুমদের জন্য উৎসর্গ করার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।

ছবি: বাসার মেঝেতে মায়ের কাঁথা জড়ানো শহীদ ফরহাদ হোসেন।

শহীদ ফরহাদ 'We for us' এর মাধ্যমে মানুষের জন্য কিছু করার তাড়না বাস্তবায়ন করত। ফরহাদ তার জীবন দেওয়ার মাধ্যমে প্রমাণ করেছে We for us-এর তাৎপর্য। শহীদ হওয়ার পূর্বমুহূর্তে বীরত্ব,ইবাদত,উত্তম দান,সহযোদ্ধাদের জালিমের বিরুদ্ধে মনোবল চাঙ্গা করা, কী করেনি ফরহাদ! *অনন্ত মহাকালে মোর যাত্রা, অসীম মহাকাশের অন্তে...*

তথ্যসূত্র:

বড় ভাই গোলাম কিবরিয়া, প্রত্যক্ষদর্শী ও বন্ধু অভি, ইমতিয়াজ সাকিব, রুমমেট সজিব হাসান ও সহপাঠী রিয়াদ আহমেদ এর সাক্ষাৎকার।

তথ্য সংগ্রহে:

অন্তর সফিউল্লাহ;

স্টোরি মেকিং: অন্তর সফিউল্লাহ এবং ড. মোহাম্মাদ সরোয়ার হোসেন

গুলিবিদ্ধ মুমূর্ষু মাসুদকে ওরা পিটিয়ে মেরে ফেলল!

'তুই রাজাকার, বেঁচে থেকে করবি কী? তোকে হাসপাতালে নেওয়ার দরকার নাই।'—এভাবেই ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছিল বুলেটের আঘাতে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে থাকা যুবকটিকে। সেই অন্তিম মুহূর্তে নৃশংসভাবে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয় সরওয়ার জাহান মাসুদকে, হাসপাতালে নেওয়ার সুযোগ পর্যন্ত দেয়নি।

শহীদের নাম : সরওয়ার জাহান মাসুদ
বয়স : ২১ বছর (জন্ম, ২৩ নভেম্বর ২০০৩)
মৃত্যুর তারিখ : ৪ আগস্ট ২০২
পিতা : শাহজাহান
মাতা : বিবি কুলসুম
ঠিকানা : দাগনভূঁইঞা, ফেনী
শিক্ষা : ডিগ্রী (প্রথম বর্ষ), ফেনী সরকারি কলেজ।

দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো, মুমূর্ষু রোগীর জন্য রক্তের ব্যবস্থা করা ছিল মাসুদের প্রাত্যহিক ব্যস্ততার অনুসঙ্গ। এমনকি নিজস্ব বাইকে করে রক্তদাতাকে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার কাজেও মাসুদ ছিল সদা প্রস্তুত। তিন ভাইয়ের মধ্যে মাসুদই ছিল সবার বড়। মেজো ভাই মাসুম আল সামির (১৯) ছিলেন কোটা আন্দোলনের একজন সক্রিয় যোদ্ধা, আর ছোট ভাই সায়েম সুলতান (১৩) কুরআনের হাফেজ।

৪ আগস্ট ২০২৪, ফেনীর ইতিহাসের এক শোকাবহ ও কলঙ্কময় দিন। এদিন আওয়ামী সন্ত্রাসীদের নির্মম হামলায় মুহূর্তেই ঝরে যায় ১২টি তাজা প্রাণ। অন্য অনেকের মতোই বাবা-মায়ের কঠোর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও মাসুদ ও সামির দুই ভাই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। দেশকে ফ্যাসিবাদমুক্ত করার ঘোরলাগা নেশা যেন দুই ভাইকে করে তুলেছিল দুর্দমনীয়।

কবি হেলাল হাফিজের অমর পঙ্‌ক্তি যেন তাদের হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল—

এখন যৌবন যার, মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়,

এখন যৌবন যার ,যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।

জালিমের বন্দিদশা থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েন রাজপথের উত্তপ্ত আন্দোলনে। তবে সেই আন্দোলনেই চিরদিনের জন্য নিভে যায় এক ভাইয়ের জীবনপ্রদীপ, অপর ভাই মায়ের কোলে ফিরে আসে অসীম শোক ও বেদনার বোঝা কাঁধে নিয়ে।

আন্দোলনের নেতৃত্বে মাসুদ, সাহসিকতা যার রক্তে-মাংসে

ফেনীতে রাজপথের আন্দোলনে বরাবরই সম্মুখ সারিতে ছিলেন মাসুদ। প্রতিদিন সকালে মোটরসাইকেলে ঘুরে ঘুরে আন্দোলনের ফ্রন্টলাইনের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতেন। ছাত্রলীগের অবস্থান, পুলিশের তৎপরতা—সবকিছু গভীরভাবে নিরীক্ষণ করে মেসেঞ্জার গ্রুপে আপডেট জানিয়ে দিতেন। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই পরিকল্পনা মাফিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ত তার সাহসী তরুণ সহযাত্রীরা।

'আন্দোলনের ডাক' মেসেঞ্জার গ্রুপের মাধ্যমে নির্ধারিত হতো কারা কোথায় অবস্থান করবে, কখন কোথায় আসতে হবে, কীভাবে পরস্পরের মাঝে কাজের সমন্বয় ঘটাবে—এক কথায়, সামগ্রিক পরিকল্পনার থাকত পূর্বনির্ধারিত সুস্পষ্ট ছক। মাসুদই ছিলেন সেই নেপথ্য নায়ক, যিনি এই সবকিছুর সমন্বয় করতেন।

মাসুদের প্রতিদিনের সকাল শুরু হতো ফজরের নামাজ আদায়ের মাধ্যমে। শাহাদাতের দিন, ৪ আগস্টের সকালও এর ব্যতিক্রম হয়নি। সেদিন সকাল থেকে আন্দোলনের প্রস্তুতি ও ঘটনাপ্রবাহ স্মরণ করে মাসুদের মা বিবি কুলসুম স্মৃতিচারণ করেন—৪ আগস্ট, মাসুদ ফজরের নামাজ মসজিদে জামাতে পড়ে এসে বাসায় একটু হাঁটাহাঁটি করে এবং সবাইকে মেসেঞ্জারে আন্দোলন সম্পর্কিত মেসেজ দেয়। এরপর অল্প সময় ঘুমায়। সকাল ৯টায় ঘুম থেকে উঠে নাশতা করে, নিজ হাতে চা গরম করে পান করে। নাশতার পর দুই ভাই একসাথে ঘরে বসে ছিল। মাসুদ আমাকে বলল, 'আম্মু, আজকে তো আন্দোলনে সবাই থাকবে, সবাই।' আমি নিষেধ করেছি, বলেছি আন্দোলনে না যেতে। নিষেধ করার পর কোনো কথা বলে নাই। সকাল সাড়ে দশটার দিকে ওদের দুই ভাইকে বললাম, 'আমি ওপরে যাচ্ছি, তোরা কোথাও যাস না, বাসায় থাক।' বাসার দোতলায় উঠলে মাসুদ এই ফাঁকে বের হয়ে গেছে।

আমি সবসময় বারণ করতাম। উল্টো আমাকে বলত, 'সবার মা-বাবা বলে আন্দোলনে যেতে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে, আর তুমি আমাকে না করো? মাসুদ ওর বন্ধুবান্ধবদের আন্দোলনে যেতে উৎসাহ দিত। বলত, 'আমিও তো যাচ্ছি। আমার আম্মুও তো নিষেধ করছে। আমি কি বসে থেকেছি?' ওর কথায় সবাই অনুপ্রাণিত হতো। ওর কথা সবাই শুনত, মানত। আমাকে বলত, 'এই আন্দোলনে আমি যদি জেলেও যাই, তারপরও এই ২৪ সালের আন্দোলনে আমার একটা নাম থেকে যাবে যে, আমি জেলে ছিলাম।' জেলে গেলে তো ভালোই হতো। তারপরও তো ছেলেকে খুঁজে পেতাম। এখন তো আমার ছেলে হারাইয়া গেল।

সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে সামিরও তার মাকে না বলে বাসা থেকে বের হয়ে যায়। প্রায় সাড়ে বারোটার দিকে ফেনী শহরের মহিপাল পয়েন্টে মাসুদের সাথে দেখা হয় সামিরের। ওই সময়ের বিবরণ দিয়ে সামির বলেন, 'প্রায় সাড়ে বারোটার দিকে মাসুদ ভাইয়ের সাথে আমার দেখা হয়। ভাইয়া আমাকে দেখে হালকা মিষ্টি হেসে বললেন, 'তুইও আসছিস!' আমি উত্তরে বলি, 'জি আসছি।'

২এবং ৩আগস্ট, ফেনী শহরের ট্রাঙ্ক রোডের দোয়েল চত্বরে ছাত্র-জনতা তাদের পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি পালন করে। এ দুই দিনের কর্মসূচিতে তেমন কোনো সমস্যা হয়নি। মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবেই কর্মসূচি শেষ হয়। ৪ আগস্টের কর্মসূচি ছিল ফেনী শহরের মহিপাল পয়েন্টে। ওই দিন সকাল থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঘোষিত 'হাসিনার পদত্যাগ'-এর এক দফা দাবিতে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম দিনের কর্মসূচি পালনের অংশ হিসাবে ফেনীর মহিপাল পয়েন্টে ঢাকা-চট্টগ্রাম রোড অবরোধ করে মুক্তিকামী ছাত্র-জনতা।

ছবি : আন্দোলনরত অবস্থায় বাম দিক থেকে মোহাম্মদ বাইজিদ, সরোয়ার জাহান মাসুদ, মোঃ ফাহাদ, হাসান আল মাহিন, আরাফাতুল ইসলাম তায়েফ ও নিলয়।

মাসুদ, সামির, তার বন্ধুরা এবং এলাকাবাসী—সবাই একসাথে সংঘবদ্ধ হয়ে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। মাসুদের বন্ধু হাসান আল মাহিন (ফেনী সরকারি কলেজ, বিবিএস ডিপার্টমেন্ট, প্রথম বর্ষ, সেশন- ২০২২-২৩) সেই দিনের পরিস্থিতি বর্ণনা করে বলেন—'সকাল থেকে জোহরের নামাজের পূর্ব পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবেই কর্মসূচি পালিত হয়। জোহরের আজানের পর সিদ্ধান্ত হয়, মহিপাল পয়েন্টে রাস্তায় জামাতের সাথে নামাজ আদায় করা হবে। ওইদিন মহিপাল পয়েন্টে রাস্তায় জোহরের দুইটি জামাত হয়। আমরা সবাই দ্বিতীয় জামাতে শরিক হই।

দুপুর একটা পঞ্চাশ মিনিটের দিকে আমাদের জামাত শেষ হওয়ার পর ট্রাংকরোড থেকে মহিপালের দিকে একটি মিছিল আসতে থাকে। আমরা কয়েকজন মিছিলটিকে আন্দোলনকারীদের মিছিল ভেবে স্বাগত জানাতে এগিয়ে যাই। তবে কিছুটা অগ্রসর হতেই বুঝতে পারি, সেটা আওয়ামী নেতা-কর্মীদের মিছিল; ককটেল নিক্ষেপ করতে করতে মহিপাল পয়েন্টের দিকে আসতেছিল। এই অবস্থায় আমরা কিছুটা পিছিয়ে এসে আরো বেশীসংখ্যক আন্দোলনকারী নিয়ে সন্ত্রাসীদের মোকাবেলা করতে অগ্রসর হই। আমরা যখন আগাতে আগাতে মহিপাল প্লাজার কাছাকাছি পৌঁছি, তখন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা আমাদের একদম কাছাকাছি চলে আসে এবং সরাসরি গুলি করা শুরু করে।'

ঝড়ের পূর্বাভাস

ওই দিন আওয়ামী সন্ত্রাসীদের গুলিতে মাসুদ, তার বন্ধু আরাফাতুল ইসলাম তায়েফ, সামিরের বন্ধু শহীদ ওয়াকিল আহমেদ শিহাব-সহ আরও অনেকে গুলিবিদ্ধ হয়। ওই দিনের মর্মান্তিক ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে তায়েফ (এইচএসসি- ২০২০, মছজিদ্দা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিরা, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম) বলেন—'যখন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা ট্রাঙ্ক রোড থেকে আমাদের একদম কাছাকাছি এসে গুলি করা শুরু করে, তখন আমরা পেছনের দিকে, অর্থাৎ মহিপালের দিকে দৌড় দেই। মহিপাল পয়েন্টে এসে আমরা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ি এবং অবস্থান করতে থাকি, যাতে ওরা এক জায়গায় সবার ওপর আক্রমণ করতে না পারে। তারা সংখ্যায় অনেক কম ছিল, তবে তাদের হাতে ছিল ভারী অস্ত্র।

আন্দোলনকারীদের বেশিরভাগই দাগনভূঁইয়া রোডে চলে যায়। অনেকে ফিশারির মোড়ের দিকে সরে পড়ে এবং কিছু মানুষ ফ্লাইওভারের ওপরে উঠে যায়। অন্যদিকে আমি, মাসুদসহ কয়েকজন চলে আসি সার্কিট হাউজ রোডের মুখে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা অবস্থান করছিল মহিপাল পয়েন্টে।

আমরা সার্কিট হাউজ রোডের মুখ থেকে ওদের দিকে ইট-পাটকেল ছুঁড়তে থাকি। সবাই সামনে দাঁড়িয়ে ইট নিক্ষেপ করতে সাহস করতে পারছিল না। কয়েকজন পেছন থেকে ইট ভেঙে দিচ্ছিল আর আমি, মাসুদসহ দশ-বারো জন সামনে দাঁড়িয়ে ইট নিক্ষেপ করছিলাম।

সবার আগে আমার (তায়েফ) শরীরে গুলি লাগে। বুকে গুলি লাগার পর মাসুদ আমাকে বলল, এগুলো 'ছিটা গুলি, তোর কিছু হবে না।' গুলি লাগার পরেও আমরা ওদের দিকে ইট-পাটকেল ছুঁড়ে যাচ্ছিলাম। প্রায় দশ-পনেরো মিনিট লাগাতার ইট নিক্ষেপের পর একসময় আমার হাত ব্যথা করতে থাকে। আমি মাসুদকে বললাম, 'মামা, আমি তো গুলি খাইছি। আবার হাতও ব্যথা করতেছে।' মাসুদ আমাকে বলল, 'তুই চলে যা।' আমি পেছনে মাত্র দুই কদম এগিয়েছি, এর মধ্যে আমার বাম হাতে বড় একটি বুলেট লাগে। গুলিতে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের রগ বের হয়ে যায়। আমাকে এক ভাই সাথে সাথে রিকশায় তুলে নেয়। রিকশায় ওঠার পর পেছনে তাকিয়ে দেখি মাসুদসহ কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে আছে। সামনে দাঁড়িয়ে যারা ইট নিক্ষেপ করছিল, তাদের বেশিরভাগই গুলিবিদ্ধ হয়। মুহূর্তের মধ্যে এইসব ঘটনা ঘটে গেল। আমরা খুব দ্রুত সার্কিট হাউজের গলির ভেতর ঢুকে পড়ি। এখন মাসুদের কাছে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। অনবরত গুলি চলছিল। আমি বললাম, 'আমার বন্ধুটাকে রিক্সায় তুলে নেন, ওরে নিয়ে যাই।' তখন বলে, 'ওখানে গেলে আমরা সবাই মারা যাব।' গুলি থামছিল না, সন্ত্রাসীরা গুলি চালিয়েই যাচ্ছিল। এরপর আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আর আমার বন্ধু মাসুদ পড়ে থাকে রাস্তায়। ওখানে ফ্লাইওভারের নিচে কাঁচাবাজার আছে, সেই জায়গাটি অন্ধকার থাকে। আওয়ামী বন্দুকধারী সন্ত্রাসীরা মহিপাল পয়েন্ট থেকে কাঁচাবাজারের পাশ দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের একদম সামনে চলে এসে গুলি শুরু করে।

ছবি : (বামে) গুলিবিদ্ধ অবস্থায় সরোয়ার জাহান মাসুদ।
(ডানে) আরাফাতুল ইসলাম তায়েফের গুলিবিদ্ধ হাত

কল্পনা করুন, কি হৃদয়বিদারক দৃশ্য! সরোয়ার জাহান মাসুদসহ আরও অনেকেই গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় পড়ে আছে, অথচ তাদের উদ্ধার করার কেউ নেই। উদ্ধার করবেই-বা কীভাবে? তখনও যে সন্ত্রাসীরা অনবরত গুলি চালিয়ে যাচ্ছিল। গোলাগুলির সময় সামির অবস্থান করছিল মহিপাল ফ্লাইওভারের উপরে। গোলাগুলি থামার কিছুক্ষণ পর সামির মাসুদকে ফোন করে। প্রথম কলটি কেউ রিসিভ না করলেও, দ্বিতীয় কলটি অচেনা এক ব্যক্তি রিসিভ করে জানায়—মাসুদ গুলিবিদ্ধ অবস্থায় সার্কিট হাউজ রোডের মুখে অচেতন হয়ে পড়ে আছেন।

মর্মান্তিক এ ঘটনাপ্রবাহের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মাসুদের ছোট ভাই সামির বলেন—গুলি খাওয়ার প্রায় দশ-পনেরো মিনিট পর মাসুদ ভাই এর কাছে পৌঁছাই। মাসুদ ভাইকে রাস্তায় শোয়ানো অবস্থায় রাখা ছিল। ওখান থেকে একটা রিক্সা নেই। আমার পরিচিত এক সিএনজি চালককে কল দেই, দ্রুত সিএনজি নিয়ে আসতে অনুরোধ করি। আমরা রিক্সায় করে সার্কিট হাউজ হয়ে পাঁচগাছিয়া পর্যন্ত যাওয়ার পর সিএনজি আসে।

আমরা প্রথমে সদর হাসপাতালে নিতে চাইছিলাম, কিন্তু সদর হাসপাতালে নিতে হলে ট্রাঙ্করোড হয়ে যেতে হবে। ট্রাঙ্করোড তো ওদের দখলে। তাই আমরা দাগনভূইঞা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যেতে থাকি। এখন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বিভিন্ন স্পটে বাধা সৃষ্টি করছিল। যে সকল পয়েন্ট দিয়ে আহতদের হাসপাতালে নেওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সেখানে তারা তাদের লোক রেখে দিয়েছিল। যেকোনো আহত মানুষ পেলেই তাকে মারধর করা হচ্ছিল। ওই সব পয়েন্ট দিয়ে যারা যাচ্ছিল তাদের ফোন চেক করা হচ্ছিল, আন্দোলনে সংশ্লিষ্টতা আছে কি না। বিশেষত ফেইসবুকের প্রোফাইল চেক করে তারা দেখছিল—লাল করেছে কিনা—প্রমাণ পেলে মারধর করা হচ্ছিল।

আমরা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যাওয়ার পথে বেকের বাজারে তৎকালীন দাগনভূঞা উপজেলা পরিষদের সাত নং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ আল মামুনের নেতৃত্বে বাধা পাই। মাসুদ ভাই মুমূর্ষ অবস্থায় ছিলেন, কিছুটা শ্বাস-প্রশ্বাস চলছিল। সার্কিট হাউজে এক পল্লি-চিকিৎসক বলেছিলেন, ভাইয়ার এখনো পালস আছে। ওই অবস্থায় বেকের বাজারে আবদুল্লাহ আল মামুন চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে মৃতপ্রায় মাসুদ ভাইকে অনেকক্ষণ মারধর করতেছিল এবং বলছিল, 'তুই রাজাকার। তুই বেঁচে থেকে করবি কী? তোকে হাসপাতালে নেওয়ার দরকার নাই।' যতক্ষণ না ভাইয়ার মৃত্যু নিশ্চিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত লাঠি দিয়ে নির্মমভাবে পিটানো হয়।

মাসুদ ভাইয়ের সাথে সিএনজিতে আমি, আমার বন্ধু আরিফ এবং ইমন ভাই ছিলাম। আমাদেরকেও চর-থাপ্পড় মারে। যখন নিশ্চিত হলো, ভাইয়া মারা গেছে, তখন আমাদের ছেড়ে দেয়। তারপরও আমরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাই। বিকাল সাড়ে তিনটার দিকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পৌঁছালে ডাক্তার মাসুদ ভাইকে মৃত ঘোষণা করেন। ততক্ষণে আমার বাবা, আত্মীয়স্বজন এবং প্রতিবেশীরা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চলে এসেছে। এরপর ডেথ সার্টিফিকেটের জন্য মাসুদ ভাইয়ের মৃতদেহ ফেনী সদর হাসপাতালে নিয়ে যাই। সদর হাসপাতালে নেওয়ার পর পুলিশ গড়িমসি শুরু করে, ময়নাতদন্তও করবে না, লাশও দিবে না। বিকাল সাড়ে চারটা থেকে রাত সাড়ে ১২টা পর্যন্ত লাশ সেখানে পড়ে ছিল। একপর্যায়ে অনেক অনুরোধ-চাপাচাপির পর, দ্রুত দাফনের শর্তে লাশ নিতে দেয়।

কি নির্মম! সামির কি কখনো কল্পনা করেছিল, তাকে এমন যন্ত্রণাময় অসহায় পরিস্থিতির মুখোমুখী হতে হবে? কি অসহায়ত্ব! চোখের সামনে নিজের মুমূর্ষু বড় ভাইকে পিটিয়ে হত্যা করছে লীগের সন্ত্রাসীরা, আর সে কিছুই করতে পারছে না কেবল চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া। এর চাইতে বড় অসহায়ত্ব আর কী হতে পারে?

বাড়িতে লাশ আনার পর, সেখানেও আওয়ামী লীগের হায়েনারা হয়রানি করতে থাকে। তাড়াতাড়ি লাশ দাফনের জন্য হুমকি দিতে থাকে। এমনকি মানুষকে জানাজায় অংশগ্রহণ করতেও বাধা দেয়। মাসুদের বন্ধু এবং আন্দোলনের সহযোদ্ধা আরমান ওই সময়ের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন—আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা রাস্তায় রাস্তায় টহল দিতেছিল, যেন জানাজায় কেউ না আসতে পারে। আমাদের বন্ধু-বান্ধব বেশির ভাগ জানাজায় অংশ নিতে পারেনি। আমরা কয়েকজন মনের মধ্যে ভয় নিয়ে বন্ধুকে শেষ বিদায় জানাতে যাই। একটু পর পর আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা এসে হুমকি দিয়ে যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি লাশ দাফনের জন্য। মসজিদের মাইকে মাইকিং করতে দেয় নাই। ওরা বলতেছিল, মাইকিং করলে লাশ নিয়ে যাবে, দাফন করতে দিবে না। কয়েকজন বলতেছিল, যারা যারা জানাজায় আসবে, তাদের নাম লিস্ট করা হবে। এই রকম এক অবস্থায়, যারা আন্দোলনে ছিল, তারা জানাজায় আসলে তাদেরকেও তুলে নিয়ে যাবে। রাত ১ টা ৪০ মিনিটের দিকে তাকিয়া মসজিদের ইমাম সাহেব, মসজিদ প্রাঙ্গণে জানাজার নামাজ পড়ান। মাসুদ সেই মসজিদের ক্যাশিয়ারের দায়িত্ব পালন করত।

ঢাকার উত্তাল আন্দোলনের দিনগুলোতেও মাসুদ সরাসরি ঢাকায় গিয়ে আন্দোলনে শরিক হতে চেয়েছিল। তবে মায়ের কঠোর আপত্তির কারণে যেতে

পারেনি। ঢাকার আন্দোলনে যোগ দিতে না পারলেও, মাসুদ ফেনীর রাজপথে আন্দোলনের সামনে থেকে নেতৃত্ব দেয়। পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকেও আন্দোলনের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে থাকে।

ছবিঃ রাজপথের পাশাপাশি ফেইসবুকেও আন্দোলনের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন মাসুদ

পরোপকারী এক তরুণ

'সবার সুখে হাসব আমি, কাঁদব সবার দুঃখে'—শৈশবে পড়ে আসা কবি জসীম উদদীনের এ বি খ্যাত পঙক্তি যেন মনে-প্রাণেই ধারণ করেছিল শহীদ সরোয়ার জাহান মাসুদ। মাসুদ সুযোগ পেলেই অন্যের উপকার করার চেষ্টা করত। এলাকার তরুণ-যুবকদেরকে মাদক থেকে বিরত রাখতে তাদের নিয়ে বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করত।

মাসুদ তার বন্ধুদেরকে এক সুতোয় গেঁথে বন্ধুত্বের বন্ধন থেকে ভালো কিছু করার প্রচেষ্টা চালাত। সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের মহৎ লক্ষ্যে মাসুদ 'জয়লস্কর সমাজ উন্নয়ন সংস্থা' এবং 'দুঃসময়ে বন্ধু ফাউন্ডেশন' নামক দুটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিল।

প্রতি রমজানে দুঃস্থ ও অসহায় পরিবারের মাঝে উপহার সামগ্রী বিতরণ করা, ঈদে অভাবী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো ছিল তার নিয়মিত কাজের অংশ।। শীতকালে এলাকার ছেলেদের ব্যাডমিন্টন খেলার ব্যবস্থা করে দিতেও কার্পণ্য করত না এ স্বপ্নবাজ তরুণ।

মুমূর্ষু রোগীদের জন্য রক্তের ব্যবস্থা করতে মাসুদ 'জরুরী রক্তের প্রয়োজনে আমরা এগিয়ে আসব, ইনশাআল্লাহ' নামক একটি সংঠন পরিচালনা করত। শাহাদাতের আগের দিন রাতেও এক রোগীর জন্য রক্তের ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

মাসুদের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তার বন্ধু আব্দুল্লাহ আল আরমান (উত্তরা টাউন কলেজ, ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, প্রথম বর্ষ, সেশনঃ ২০২২-২০২৩) বলেন— 'আমাদের ব্যাচের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক ও আস্থাভাজন ব্যক্তি ছিল সরোয়ার জাহান মাসুদ। মাসুদ কোনো কথা বললে কেউ তাতে দ্বিমত করত না। সে সবসময় ব্যাচটাকে আগলে রাখার চেষ্টা করত। প্রতি বছর ওদের বাড়িতে আমাদের ব্যাচের সবাই একসাথে মিলিত হতাম। ও আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল। যেখানে পাঁচজন আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল, সেখানে তার ডাকে বিশজন চলে যেত। তার কথায় এবং অনুপ্রেরণায় আমরা চেষ্টা করতাম, আরও কয়েকজনকে আন্দোলনে যুক্ত করতে। দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের প্রতি তার আন্তরিক ভালোবাসা ছিল। গত রমজানে সে আমাকে কয়েক ব্যাগ ত্রাণ দিয়ে বলেছিল, তোর পরিচিত অভাবী মানুষদের দিয়ে দিস।' আমরা যে আমাদের কেমন একজন বন্ধুকে হারিয়েছি, তা বলে বুঝাতে পারব না।

মাসুদের কথা বলতে গিয়ে তার বন্ধু হাসান আল মাহিন বলেন—ওর দ্বারা কারও ক্ষতি হয়নি। বরং সবসময় অপরের উপকার করেছে। ওর প্রতি আমাদের আস্থা ছিল। ও সবসময় গরিব-দুঃখী মানুষকে সাহায্যের চেষ্টা করত। রমজান হোক বা শীতকাল, সে সবসময় মানুষের পাশে থাকার জন্য প্রস্তুত থাকত। যদি কেউ ওর কাছে কিছু চাইত, সে কখনো না করত না। সাথে থাকলে দিত, না থাকলে বলত, পরে দিবে। প্রতি রমজানে ওর পরিবার থেকে কিছু মানুষকে সাহায্য করা হয়। কয়েক ব্যাগ ত্রাণ আমাকে দিয়ে বলত, 'তুই তোর পরিচিত কোনো গরিবকে দিয়ে দিস।'

কান্নাভেজা কণ্ঠে মাসুদের মা বিবি কুলসুম মাসুদের স্মৃতিচারণ করে বলেন— 'ওর যে কতো স্বপ্ন ছিল, কত কিছু যে করবে। আম্মু এইটা করব, আম্মু ওইটা করব। বিদেশ যাওয়ার জন্য IELTS করতেছিল। এর আগে ফ্রিলান্সিং শিখছিল। ফ্রিলান্সিং করার জন্য একটা ব্যাংক একাউন্ট খুলছিল। ওর আব্বু ওই একাউন্টে খুশি

হয়ে পাঁচ লক্ষ টাকা দিছিল। মাসুদ সম্পূর্ণ টাকা ওর কাজে আর বিভিন্ন সামাজিক কাজে খরচ করেছে। ওর আব্বু দেশে একাউন্ট চেক করে দেখে মাত্র সাতশ টাকা আছে। এইবার এলাকার ছেলেরা আইসা বলতাছে, 'সামির কাকা, মাসুদ কাকা থাকলে তো আমাদের খেলার জন্য টাকা দিত। আপনি তো আমাদের দিলেন না। পরে ৫০০ টাকা দিছি।' ওরা দুই ভাই মিলেমিশে থাকত। কি যে মিল ছিল ওদের। সামিরের জামা মাসুদ পড়ত, মাসুদের জামা সামির পড়ত। আমি যে কী হারাইছি, তা একমাত্র আমিই জানি।'

তথ্যসূত্র :

১. মাসুদের মা এবং ভাই (মাসুম আল সামির)-এর সাক্ষাৎকার

২. প্রত্যক্ষদর্শী: মাসুদের বন্ধু এবং আন্দোলনের সহযোদ্ধা হাসান আল মাহিন, আরাফাতুল ইসলাম তায়েফ এবং আব্দুল্লাহ আল আরমান-এর সাক্ষাৎকার

তথ্য সংগ্রহে:

মোঃ কামরুজ্জামান এবং মোঃ নাহিদ হাসান সজীব;

স্টোরি মেকিং: মোঃ কামরুজ্জামান এবং ড. মোহাম্মাদ সরোয়ার হোসেন

রিক্সার পা-দানিতে ঝুলতে থাকা সেই গুলিবিদ্ধ ছেলেটি

শহীদের নামঃ গোলাম নাফিজ
বয়সঃ ১৬ বছর (জন্ম ২২ মে ২০০৮)
মৃত্যুর তারিখঃ ৪ আগস্ট ২০২৪
পিতাঃ মো: গোলাম রহমান
মাতাঃ নাজমা আক্তার নাছিমা
ঠিকানাঃ নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ নৌবাহিনী কলেজ ঢাকা, এইচএসসি২৬

রিকশার পা-দানিতে ঝুলে থাকা, পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারানো সেই নিথর দেহের ছবি কাঁদিয়েছিল পুরো দেশকে। সেই ছবি দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়া আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গকে আরও বেগবান করে।

৪ আগস্ট ফার্মগেটে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা ওই সময়ের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন—'কাজী নজরুল এভিনিউ থেকে দৌড়ে ফার্মগেটে আসার পথে নাফিজ পুলিশের সামনে পড়ে। তখন পুলিশ তাকে ধরে প্রথমে প্রচণ্ড মারধর শুরু করে। ওর মুখে, কপালে এবং মাথায় লাথি মারে। হাতে-পায়ে মোটা মোটা রড ও লাঠি দিয়ে অজস্র আঘাত করে। এরপর, সাড়ে চারটার দিকে, পুলিশ একদম কাছ থেকে ওর বুকের ঠিক মাঝ বরাবর গুলি করে এবং ফার্মগেট পথচারী পারাপারের লোহার ব্রিজের নিচে মধুবন মিষ্টির দোকানের সামনে ফেলে রেখে যায়।

গুলিবিদ্ধ নাফিজ তখন রাস্তায় পড়ে থাকে, আর তার দেহ থেকে গলগল করে রক্ত ঝরছিল। কিছুক্ষণ পর, এক সবজি বিক্রেতা মাথায় সবজির ডালি নিয়ে পথ চলার সময় পুলিশ তাকে ডাকে, যেন নাফিজের দেহটা ডালিতে করে ম্যানহোলে ফেলে দিতে পারে। কিন্তু সবজি বিক্রেতা পুলিশের ডাকে সাড়া না দিয়ে ডালিটি রাস্তায় ফেলে রেখে দৌড়ে পালিয়ে যায়।

এরপর, পুলিশ ডালিটি নিয়ে এসে নাফিজকে ডালির মধ্যে তুলে ম্যানহোলে ফেলে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। কারণ, ম্যানহোলে মুখটা খুবই ছোট ছিল, যার ফলে তারা নাফিজকে সেখানে ফেলতে ব্যর্থ হয়। এরপর পুলিশ রিকশাওয়ালাকে ডাক দেয় নাফিজকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। শহীদ গোলাম নাফিজকে রিকশায় নিয়ে মেডিকেলের দিকে ছুটে চলা সেই রিকশা চালক নূর মোহাম্মদ সেই সময়ের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন—'মগবাজার থেকে রিকশা চালিয়ে ফার্মগেটে আনন্দ সিনেমা হলের সামনে আসার সময় হঠাৎ পুলিশ আমার রিকশা থামিয়ে দিয়ে বলল, 'এদিকে আয়।' পুলিশ আমার হাতের দাপনা ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'এদিকে আয়।' ওই সময় ফার্মগেটে প্রচুর গোলাগুলি হচ্ছিল। পুলিশসহ অনেকের অনেক কথা শুনছিলাম। কেউ বলছিল, 'আমারে মাইরা লইতে' কেউ বলছিল, 'আমারে গুলি করতে।' ওই মুহূর্তে পুলিশ আমাকে 'কুত্তার বাচ্চা, হারামজাদা' বলে গালি দিল। পরে আমাকে বলল, 'এটা তুল।' আমি বললাম, 'স্যার, কী তুলমু?' 'লাশ ফেলেছি, এটা তুল।' আমি তখন দেখলাম, ছেলেটা নামাজের সেজদার মতো পড়ে আছে ফার্মগেট পথচারী পারাপারের লোহার ব্রিজের নিচে, মধুবন মিষ্টির দোকানের সামনে। পুলিশ তখন বলল, 'তুল এটা! তাড়াতাড়ি তুল!'

আমি বাধ্য হয়ে ছেলেটার বাম হাত ও পেছন ধরে তুললাম, আর পুলিশ ওর পা ধরে ঝটকায় রিকশায় তুলে দিল। ওর শরীর থেকে রক্ত পানির মতো ঝরছিল, রিকশার পাদানি রক্তে টইটম্বুর হয়ে গিয়েছিল। আমি দেখলাম, ছেলেটা রিকশা থেকে পড়ে যাচ্ছে, বসে থাকতে পারছে না। আমি তখন বললাম, 'স্যার, শোয়ায় দেন ছেলেটারে।' পুলিশ তখন ওকে শুইয়ে দিল এবং ওর গলা থেকে স্টুডেন্ট আইডি কার্ড খুলে ভেঙে ফেলে দিল, যেন ওর পরিচয় কোনোভাবে প্রকাশ না হয়। এরপর এক সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তা এসে বলল, 'ও কি মইরা গেছে? না মইরা গেলে আরো দুইটা গুলি কইরা দে।' তখন এক জুনিয়র অফিসার বলল, 'স্যার, আর দরকার নাই। এমনি যা গুলি করছি, একটু পরেই মইরা যাইবো।' তারপর আমি ছেলেটাকে নিয়ে হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে নেওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। ওর হাতটা রিকশার চেনের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছিল, আর সে বারবার রিকশার সিটের নিচের রড ধরে রাখছিল।

পরে আল-রাজি হাসপাতালে নিয়ে গেলাম, কিন্তু ছাত্রলীগের ক্যাডার বাহিনীর বাধায় ঢুকতে পারলাম না। আমি জোর করে ঢোকানোর চেষ্টা করলে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা আমাকে বলল, 'তাড়াতাড়ি এখান থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যা, নাহলে তোরে সহ রিকশা পুরাই ফেলামু।' যে পুলিশটা ওকে ধরে রিকশায় তুলেছিল, সেই পুলিশটাই বলল, 'কুত্তার বাচ্চা, তাড়াতাড়ি মর্গে নিয়ে যা ওরে।' তারপর খামারবাড়ি চক্ষু হাসপাতালে নেওয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সেখানেও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা সবকিছু দখল করে রেখেছিল, তাই ঢুকতে পারিনি।

আল-রাজি ও খামারবাড়ি চক্ষু হাসপাতালে ঢুকতে না পারায়, সোহরাওয়ার্দী মেডিকেলে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। কিন্তু আমার রিকশা পায়ে চালিত হওয়ায় সময় বেশি লাগছিল। সংসদ মোড় পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানোর জন্য ওকে একটা অটোরিকশায় তুলে দিলাম। সেই মুহূর্তে সম্ভবত একজন সেনাসদস্য পেছন থেকে চিৎকার করে বলল, 'ওরে তাড়াতাড়ি হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে নিয়ে যা!' আমি তখন অটোরিকশাওয়ালাকে অনুরোধ করলাম, যেন সে ছেলেটাকে সোহরাওয়ার্দী মেডিকেলের ইমার্জেন্সিতে নিয়ে যায়।

ছেলেটার মাথায় বাংলাদেশের পতাকা বাঁধা ছিল। সে তো আমাদের দেশের ছেলে! সে তো দেশের জন্য লড়ছিল! সে যেই হোক না কেন, আমি চাইলেই তো তাকে ফেলে দিতে পারতাম না। কিন্তু একটাই কষ্টের বিষয়—আমি যখন তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন অনেক মানুষ দেখছিল, কিন্তু কেউ এগিয়ে আসেনি ছেলেটাকে ধরে হাসপাতালে নেওয়ার জন্য। এমনকি একজন লোকও আসেনি, যে তাকে হাসপাতালে নেয়ার জন্য সাহায্য করবে!'

উজ্জল আহমেদ যিনি রিকশাওয়ালা নুর মোহাম্মদের থেকে নাফিজের নিথর দেহ তার রিকশায় নিয়ে সোহরাওয়ার্দী মেডিকেলে নিয়ে যান। উজ্জল আহমেদ সেই মুহূর্তের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন—'আমি গুলিবিদ্ধ নাফিজকে রিকশায় করে দ্রুত সোহরাওয়ার্দী মেডিকেলের ইমার্জেন্সিতে নিয়ে যাই। নাফিজকে নিয়ে যাওয়ার পর

ছবি: বামে শহীদ গোলাম নাফিজের মরদেহ, ডানে যাদু ঘরে টাঙানো নাফিজের ছবিতে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন মা।

নাফিজের সাথে বিকাল তিনটা নাগাদ আমার শেষ কথা হয়। তারপর আর নাফিজের কোনো খোঁজ খবর পাওয়া যাচ্ছিল না। ও বাসায় ফোন রেখে গেছিল। যার কারণে যোগাযোগ করতে পারছিলাম না। বিকাল সাড়ে তিনটা নাগাদ নাফিজের বন্ধু মুহিদকে নাফিজের বড় ভাই রাসেল বারবার কল করতে থাকে। একপর্যায়ে মুহিদ কল রিসিভ করে জানায় 'কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউতে ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশ হঠাৎ এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়তে শুরু করলে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা দিকবিদিক ছোটাছুটি শুরু করে। নাফিজ তার বন্ধুদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরে। তারা নাফিজের কোনো খোঁজ না পেয়ে নাফিজকে খুঁজতে থাকে আশেপাশে। আর এই দিকে নাফিজ এবং শিমুল, দুই বন্ধু মিলে মেইনরোড হয়ে দৌড়ে ফার্মগেটের দিকে চলে যায়। আর ওই দিকে মুহিদ, মেসবাহ ও তানভীর নাফিজদের অনবরত খুঁজতে থাকে।'

নাফিজের আব্বু বিকাল চারটায় বের হয়ে ওর বড় ভাই রাছেলের দেয়া লোকেশন অনুযায়ী কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ এনটিভি ভবনের সামনে ও আশেপাশে নাফিজকে খুঁজতে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজি করে খুঁজে না পেয়ে ওর আব্বু বাসায় চলে আসে। মাগরিবের নামাজের পরে নাফিজের আব্বু-আম্মু বের হই নাফিজকে খোঁজার জন্য। আমরা রিকশা নিয়ে প্রথমে তেজগাঁও থানা এরপর শিল্পাচল থানা এরপর শাহবাগ থানা ও কলাবাগান থানাসহ আশেপাশে এলাকাসহ অনেক জায়গায় খুঁজি নাফিজকে। কোথাও খুঁজে না পেয়ে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আশেপাশে ও

অনেকক্ষণ কোনো ডাক্তার ওকে ছুঁয়ে দেখে না। বেশ কিছুক্ষণ পর একজন ডাক্তার এসে ওর পালস চেক করে জানায়—নাফিজ আর বেঁচে নেই। তারপর নাফিজের লাশ মর্গের রুমে রেখে মেডিকেলের কর্তৃপক্ষকে আমার ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর দিয়ে চলে আসি। যদি নাফিজের পরিবারের পক্ষ থেকে কেউ যোগাযোগ না করে, তাহলে আমার সাথে যেন মেডিকেলের কর্তৃপক্ষ যোগাযোগ করে।

শহীদ গোলাম নাফিজের মা ৪ আগস্ট নাফিজ বাসা থেকে বের হওয়ার শেষ মুহূর্ত থেকে শুরু করে নাফিজের দাফন পর্যন্ত সেই সময়ের ঘটনাগুলো বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন—'৪ আগস্ট সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ একবার নাফিজ বাসা থেকে বের হয়ে আবার বাসায় আসে। তারপর সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে বাসা থেকে বের হয়। নাফিজের সাথে আমার শেষ কথাপোকথন—

মা: আব্বু আজকে বাইরে না যাইলে হয় না?

নাফিজ: আম্মু একটু যাই না!

মা: আব্বু আজকে তুমি বাইরে যাও, আমি চাই না। তোমাকে তো আমি কখনো নিষেধ করি নাই।

নাফিজ: আম্মু একটু যাই না।

মা: কোথায় যাবা?

নাফিজ: এই নিচে একটু হাঁটতে যাব বন্ধুদের সাথে।

মা: আব্বু তুমি আজকে বন্ধুদের সাথে হাঁটতে যাও, আমি চাই না।

নাফিজ: আম্মু এমন করেন কেন, যাই না একটু! তারপর ওর বড় ভাইয়া রাহেলকে শেষবারের মতো বলে—ভাইয়া আসি, এ বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

বিকেল তিনটায় ওর বন্ধু মুহিদের ফোন থেকে কল করে বলে— হ্যালো আম্মু, আমরা হাঁটতে বের হইছিলাম, হাঁটতে হাঁটতে আন্দোলনে আইসা পড়ছি। আমি বলি, বাবা তুমি কোথায় আন্দোলনে গেছো? উত্তরে বলে, আম্মু আমরা এক দফা এক দাবি আদায়ে বড় ভাইয়াদের সাথে একটা মিছিল পাইছি, আমরা পাঁচ ফ্রেন্ড মিলে সেই মিছিলে আসছি আর বড় ভাইয়ারা আছে আমাদের সাথে। আমরা ভালো অবস্থানে আছি। তখন আমি ওকে বলি, তাড়াতাড়ি তুমি বাসায় আসো আমার ভালো লাগতেছে না, তোমার আব্বু রাগ করবে। আমার কথার উত্তরে ও বলে, হ্যাঁ আম্মু আইসা পড়তেছি, আম্মু আইসা পড়তেছি। আম্মু রাখি। এ বলে ফোন কেটে দেয়।

টিএসসিতে খুঁজে ঢাকা মেডিকেলে যাই, ইতিমধ্যে নাফিজের ছোট মামা ও মামি চলে আসেন ঢাকা মেডিকেলে। ঢাকা মেডিকেলে চার তারিখে এডমিশন নেয়া প্রত্যেকটা রোগীকে আমরা দেখি, এটা কনফার্ম হওয়ার জন্য যে এর মাঝে নাফিজ আছে কি না। আমরা ঢাকা মেডিকেলেও নাফিজকে খুঁজে পাইনি। তারপর আমি এবং নাফিজের বাবা পিজি হসপিটালে যাই। আর নাফিজের মামা-মামি সোহরাওয়ার্দী এবং পঙ্গু হাসপাতালে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা করে। আমরা একইভাবে নাফিজকে পিজিতে খোঁজার চেষ্টা করি, চার আগস্ট মেডিকেলে আসা সকল রোগীর মুখ আমরা দেখি একে একে। এবং রোগীর এন্ট্রির খাতাটাও আমরা দেখি। কিন্তু আমার নাফিজকে এখানেও খুঁজে পাই না। এমনকি আমরা মর্গেও খুঁজে দেখি, কোথাও নাফিজের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। এরপর আমরা পিজি থেকে সিএনজি নিয়ে বাসায় যাই, নাফিজের ছবি নেওয়ার উদ্দেশ্যে, যেন ওর ছবিটা সবাইকে দেখাতে পারি। সিএনজি বাসার নিচে রেখে আমরা বাসায় ঢুকি নাফিজের ছবি নেওয়ার জন্য।

ইতিমধ্যে রিকশায় শুয়ে থাকা নাফিজের ছবিটা মানবজমিন রাত বারোটায় তাদের অনলাইন নিউজে প্রচার করলে ভাইরাল হয়ে যায়। নাফিজের বড় ভাই রাসেলকে নাফিজের বন্ধুরা ছবিটা দেয় এবং নাফিজের বড় ভাই রাসেল সেই ছবিটা সাথে সাথে তার ছোট মামাকে দেয়। তো আমরা বাসায় আসার পর, নাফিজের বড় ভাই রাসেল আমাকে নাফিজের রুমে নিয়ে গিয়ে আমার হাতে এক গ্লাস পানি দিয়ে বলে, আম্মু আপনি পানিটা খান। আমি তখন পানির গ্লাসটা ওর টেবিলের ওপর রেখে দুই রাকাত নফল নামাজ পরে আল্লাহর কাছে দোয়া করি 'আল্লাহ যাই হোক না কেন, আমার নাফিজ যেন সুস্থ শরীরে বাসায় ফিরে আসে।' আর নাফিজের বড় ভাই রাসেল ও তার বাবা মিলে নাফিজের ছবিটা দেখতে থাকে ও মানবজমিন পত্রিকার নম্বরে ফোন দিয়ে খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করে। ছবিটা কে কোথা থেকে তুলেছে। নাফিজের কোনো ঠিকানা তারা জানে কি না। কিন্তু তারা যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হয়। পরে আমরা সবাই মিলে রাত সাড়ে বারোটার দিকে ফার্মগেটে আল-রাজি হাসপাতালে নাফিজের সন্ধানে যাই, কিন্তু সেখানে নাফিজের কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। পরে মানবজমিনের অফিসের সন্ধানে কারওয়ান বাজারে যাই। যিনি নাফিজের ছবিটা মানবজমিন পত্রিকায় ছাপিয়েছে, তার খোঁজ খবর নিতে। কারওয়ান বাজারে যাওয়ার পরে আমরা মানুষকে জিজ্ঞাসা করতেছিলাম মানবজমিনের অফিস কোথায়, ইতিমধ্যে নাফিজের ছোট মামা রাত দুইটার দিকে নাফিজের আব্বুকে কল করে বলে—দুলাভাই নাফিজের সন্ধান পাইছি, আপনারা সোহরাওয়ার্দী মেডিকেলে আসেন। তৎক্ষণাৎ আমরা সোহরাওয়ার্দী মেডিকেলে যাই।

আমরা যাওয়ার পর নাফিজের মামা আমার থেকে আড়ালে নিয়ে যায় নাফিজের আব্বু এবং ভাইকে, এবং তাদেরকে সবকিছু বলে। তারা আড়ালে কান্নাকাটি করছিল। আর আমি এবং নাফিজের ছোট মামি সীমা নাফিজের মহদেহ যে ঘরে রাখা হয়েছিল, সে ঘরের সামনে বসে ছিলাম। আমি সেখানে বসে নাফিজের ছোট মামী সীমাকে বলতেছিলাম—এই সীমা, আমার নাফিজ কই? সীমা আমার নাফিজ কোথায়? এই সীমা, বুঝতে পারো না, আমি তোমাকে বলতেছি—আমার নাফিজ কোথায়? নাফিজের কাছে নিয়ে যাও আমাকে এখনি। আমাকে বসায় রাখছো কেন এখানে? আমার তখন মনে জাগে নাই যে, আমার নাফিজ আর নেই। পরে সীমা আমার বাম হাতে শাহাদাত আঙ্গুল ধরে দেখায় দিল যে, নাফিজ ওই রুমে আছে। আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না, ওই রুমটা দেখার জন্য।

এরপর আমরা যখন নাফিজের লাশটা দেখতে চাইলাম, মেডিকেল কতৃপক্ষ লাশ দেখতে দিচ্ছিল না। তারা লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করার বিনিময়ে লাখ টাকা দাবি করে বসে। এরপর তাদের দাবি পূরণ করলে, লাশের ছাড়পত্র দেয় এবং লাশ দেখার অনুমতি দেয়। পরে নাফিজের আব্বু এবং বড় ভাই দুজনে মিলে নাফিজকে দেখে। তারা দেখতে পায়—ও চোখ দুটো খুলে আছে! ওর মাথা, মুখ, নাক, কপালে অজস্র আঘাতের চিহ্ন। দাঁতগুলো প্রায় সব ভেঙ্গে যাওয়ার মতো অবস্থা, ঠোঁটটা কালো কিটকিটে হয়ে গেছে, নাকটা ভেঙ্গে গেছে, মাথায় আঘাত পাওয়ার কারণে মাথার খুলিটা নরম হয়ে গেছে। হাতে পায়ে অজস্র মোটা মোটা লাঠি দিয়ে মারের দাগ। ঠিক বুকের মাঝখানে গুলি লেগে বড় ছিদ্র হয়ে গুলি পিঠ দিয়ে বের হয়ে গেছে। গুলি লাগার স্থানে গজসুতা দিয়ে গর্তটা বন্ধ করে দিছে, যেন রক্তক্ষরণ না হয়। এবং বেশ কিছু রাবার বুলেটের ক্ষত শরীরে দৃশ্যমান ছিল। পরে আমরা নাফিজকে অ্যাম্বুলেন্সে করে ওর দাদার বাসায় নিয়ে আসি রাত ৩:৪৫-এর দিকে। ৫ আগস্ট ফজরের নামাজের পরে গোসল করানের সময় গুলি লাগার ছিদ্র থেকে গজসুতাটা পরে যায় তখন জমাট বাধা রক্ত টপ টপ করে পড়তে থাকে। সকাল ৯টায় জানাজা শেষে সকাল ১১টা নাগাদ দক্ষিণখান, দোবাদিয়া বাজার, মধুবাগ গণকবরস্থানে দাফন করা হয়।

'নাফিজের শেষ মুহূর্তের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তার বড় ভাই গোলাম রাসেল বলেন—'৩ আগস্ট রাতের বেলা বারোটা নাগাদ নাফিজ আমার রুমে আসে, তারপর দুই ভাই মিলে দেশ, দেশের জনগণ, ফ্যাসিস্ট সরকারের নিপীড়ন, স্বাধীনতা, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন, সমন্বয়কদের আটক—এইসব বিষয়

নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা করি। আলোচনার এক পর্যায়ে নাফিজ বলে—ভাইয়া তোমার স্বপ্ন কী, তুমি বড় হয়ে কী হইতে চাও?

রাসেল: আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যেতে চাই। তোর স্বপ্ন কী, তুই বড় হয়ে কী হতে চাস?

নাফিজ: আমি আসলে বড় হয়ে সেনাপ্রধান হতে চাই। দেশ ও দেশের মানুষের জন্য কিছু করতে চাই।

রাসেল: তোর হঠাৎ আর্মি অফিসার হতে চাওয়ার কারণ কী?

নাফিজ: ভাইয়া তুমি কি জানো, আর্মির চাকরি এমন একটা চাকরি, যেখানে জীবন ও মৃত্যু দুইটাই গর্বের। যেখানে বেঁচে থাকলে মানুষ সম্মান করে আর মারা গেলে শহীদ হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। আমি আসলে দেশের জন্য কিছু করতে চাই, যেন দেশ ও দেশের মানুষ আমাকে সারা জীবনের জন্য মনে রাখে।

রাসেল আক্ষেপ করে বলেন—আমার ভাই নাফিজ তার স্বপ্নের সেনাপ্রধান হতে পারেনি। কিন্তু দেশপ্রেম, দেশপ্রীতি, দেশের পতাকা মাথায় পড়ে দেশের জন্য আত্মত্যাগ করেছে। ওর নিথর দেহটা যখন রিকশায় করে নিয়ে যাচ্ছিল, দেখে মনে হচ্ছিল—সমগ্র বাংলাদেশটা একটা রিকশায় করে যাচ্ছে। নাফিজ ১৮ তারিখ থেকেই আন্দোলনে সক্রিয় ছিল। নাফিজের বড় ভাই গোলাম রাসেল বলেন—'১৮ তারিখ বেলা বারোটা নাগাদ ও বাসা থেকে ওর বন্ধুদের সাথে এলাকায় খেলতে যাওয়ার কথা বলে বের হয়। তারপর বেলা আড়াইটা-তিনটা নাগাদ নাফিজের বড় ভাই রাসেলকে ফোন দিয়ে বলে, ভাইয়া আমরা তো খেলতেছি, হয়তো আমার আসতে একটু দেরি হবে। আমি ভাবি, হয়তো সে খেলতেছে, তাই আমি তাকে আর কোনো জোরজবরদস্তি করি না।

ও বিকাল তিনটা সাড়ে তিনটা নাগাদ ওর বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নেয়। বিদায় নিয়ে ও মহাখালী এসকেএস টাওয়ারে ছাত্রদের সাথে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে যায়। ঐদিন মহাখালী এসকেএস খুবই উত্তাল। আশেপাশে যত বিশ্ববিদ্যালয় সাউথ ইস্ট, আহসানুল্লাহ, বুটেক্স বিশ্ববিদ্যালয় ও বিএফ শাহীন কলেজের ছাত্ররা বের হয় আন্দোলন করার জন্য।

সাধারণ জনতাও তাদের সাথে সড়কে অবস্থান গ্রহণ করে এবং পুলিশের নিক্ষিপ্ত কাঁদানে গ্যাস, টিয়ারশেলের মুখে পড়ে, ঐদিন নাফিজ পায়ের রানের দুইটা ও সারা দেহে তিনটা থেকে চারটা রাবার বুলেট খায়। তারপরও এসকেএস টাওয়ারে যখন আটকা পড়ে যায় তখন ওর বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ করে ও কোনমতে sks

টাওয়ার থেকে বের হয়ে ওর বন্ধুর বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করে একটু স্বাভাবিক হয়ে বাসায় ফেরত আসে আমরা এই বিষয়টা জানতাম না। অনেকদিন পরে আমরা এই বিষয়টা সম্বন্ধে অবগত হই। নাফিজ আন্দোলনের শুরুতে ছাত্রদের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে ও বেশ কয়েকবার পুলিশে হামলার সম্মুখে পড়ে। এছাড়া ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ও ছাত্রদের পক্ষে আন্দোলনে খুবই সোচ্চার ছিল।

গোলাম নাফিজ ২২শে মে ২০০৮ সালে মিরপুর, ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২০২৪ সালে বনানী বিদ্যানিকেতন স্কুল এন্ড কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হন। নাফিজ নৌবাহিনী কলেজ ঢাকার এইসএসসি ২০২৬ ব্যাচের সাইন্স বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন।

নাফিজ ছিলেন একজন ধার্মিক এবং দেশপ্রেমিক যুবক। তার বড় ভাই রাসেল বলেন— 'নাফিজ চেষ্টা করত, প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার জন্য। নাফিজ সময় পেলেই কুরআন এবং হাদিস অধ্যয়ন করতেন। তার মাঝে ইসলামকে জানার আগ্রহ ছিল প্রচুর। এছাড়া নাফিজ পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন লেখকদের গল্প, কবিতা, উপন্যাস পড়তে খুবই পছন্দ করত। নাফিজ পড়াশোনার পাশাপাশি ক্রিকেট, ফুটবল, দাবা, ব্যাডমিন্টন খেলায় খুবই পারদর্শী ছিল। এছাড়াও স্কাউট ও রেড ক্রিসেন্টের সক্রিয় সদস্য ছিলো।'

তথ্যসূত্র:

১. নাফিজের মা, বাবা এবং বড় ভাই গোলাম রাসেল

২. প্রত্যক্ষদর্শী : দুই রিক্সাওয়ালা

তথ্য সংগ্রহে:

মোঃ নাহিদ হাসান সজীব; স্টোরি মেকিং: মোঃ নাহিদ হাসান সজীব এবং ড. মোহাম্মাদ সরোয়ার হোসেন

‘যদি না পাঠাতাম, তাহলে তো আমার ছেলেকে হারাতাম না’

গুলি থেকে বাঁচতে দুই বন্ধু একসঙ্গে দৌড়াচ্ছিল, কিন্তু কিছুক্ষণ পর তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর অকস্মাৎ গুলিবিদ্ধ হয়ে শাহাদাত বরণ করে শিহাব। অন্য বন্ধু সামিরের জীবনেও ঘটে যায় এক হৃদয়বিদারক ঘটনা—গুলিবিদ্ধ আপন বড় ভাইকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয় তারই চোখের সামনে।

শহীদের নাম : ওয়াকিল আহমেদ শিহাব
বয়স : ১৯ বছর ৬ মাস (জন্ম-২৭ জানুয়ারী ২০০৫)
মৃত্যুর তারিখ : ৪ আগস্ট ২০২৪
পিতার নাম : সিরাজুল ইসলাম
মাতার নাম : মাহফুজা আক্তার
ঠিকানা : দক্ষিণ কাশিমপুর, সদর, ফেনী
শিক্ষা : এসএসসি

শহীদ ওয়াকিল আহমেদ শিহাব ছিলেন ফেনী সরকারি কলেজের এইচএসসি দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। তাঁর স্বপ্ন ছিল বিদেশে গিয়ে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে নেওয়া। সে স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যেই পড়াশোনার পাশাপাশি শিহাব মোবাইল সার্ভিসিংয়ের কাজ শিখছিলেন, যেন বিদেশে গিয়েও ওই সেক্টরে কাজ করতে পারেন।

‘একটি সন্তানকে ঘিরে বাবা-মায়ের অনেক স্বপ্ন থাকে। সন্তানকে বড় করে তোলার পেছনে কত মেহনত, ত্যাগ আর ভালোবাসা লুকিয়ে থাকে, তা কেবল মা-বাবাই জানেন। কিন্তু যখন সেই সন্তানকে হারাতে হয়, যে হারায়, সে-ই কেবল বুঝতে পারে, জীবনের কতটা অমূল্য অংশ হারিয়ে ফেলেছে!’— দীর্ঘশ্বাস আর হৃদয়ের গভীর কষ্ট নিয়ে এভাবেই পুত্রের স্মৃতিচারণ করছিলেন ওয়াকিল আহমেদ শিহাবের মা মাহফুজা আক্তার।

ওয়াকিল আহমেদ শিহাবের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তার মা মাহফুজা আক্তার বলেন, শিহাবের আব্বু কর্মসূত্রে দেশের বাইরে থাকেন, আর উনার বয়সও হয়েছে। শিহাব চাইত দ্রুত দেশের বাইরে গিয়ে কর্মক্ষেত্রে ভালো একটি অবস্থান তৈরি করে তার আব্বুকে দেশে ফিরিয়ে আনতে। সে সবসময় ভাবত, কীভাবে পরিবারটাকে আরও সুন্দর করা যায়। শিহাবের ইচ্ছা ছিল ছোট ভাইকে অনেক পড়াশোনা করানোর। আমাকে বলত, 'আমি যতটুকু পারছি পড়াশোনা করছি, কিন্তু আমার ভাইকে অনেক পড়াশোনা করাব। ভালো একটা পর্যায়ে নিয়ে যাব।' ছোট ভাইকে খুব আদর করত, তার প্রতি খেয়াল রাখত এবং বলত, 'আম্মুকে চিন্তায় ফেলে কোথাও যেয়ো না।' রাতে শিহাবের সাথে কথা বলতে বলতে দশটা-এগারোটা বেজে যেত। আমাকে বলত, 'আম্মু, আপনি কোনো চিন্তা কইরেন না। আপনার স্বপ্নগুলো পূরণ করতে পারলেই হবে। আমাদের আর কোনো কিছুর প্রয়োজন নাই। আপনি সুখে থাকলেই আমরা দুই ভাই সুখে থাকব।' আমার (মাহফুজা আক্তার) তো অনেক স্বপ্ন ছিল। আমার ছেলে আস্তে আস্তে বড় হচ্ছিল। ছেলের একটা কাজের ব্যবস্থা হবে। এর পর ওকে বিয়ে দিব। আমাকে শিহাব বলত, 'আমার যখন ২৮ বছর হবে, আমি তখন বিয়ে করব।' স্বপ্নগুলো তো আর পূরণ হলো না। স্বপ্নগুলো স্বপ্নই থেকে গেল।

শিহাব ঘুরতে খুব পছন্দ করত। তবে খারাপ কোনো আড্ডায় যেত না। আমাকে একটা কথাই বলত যে, 'আম্মু একদিন বুঝবেন, আমি কোনো খারাপ ছেলের সাথে চলি না। আমার সবগুলো বন্ধু ভালো।' এইটা আমারে কেন যে সবসময় বলত, আমি জানতাম না। আমার ছেলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ত। ফজরের নামাজে মাঝে মাঝে উঠতে চাইত না। আমি তখন বলতাম, 'ঘরে হলেও নামাজ পড়। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সময় মতো পড়।

আমার ছেলে শুরু থেকেই আন্দোলনে সাথে যুক্ত হয়, তবে এগুলো আমাকে জানাত না। কিন্তু আমি বুঝতে পারতাম, সে আন্দোলনে যাচ্ছে। কোটা সংস্কার আন্দোলন শুরু হওয়ার পর সকল মায়ের মতো আমিও শিহাবকে সতর্ক হয়ে চলতে বলতাম।'

৪ আগস্ট, ২০২৪, রবিবার

শেখ হাসিনা সরকার ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বিগত ২০ দিন ধরে ছাত্র-জনতার ওপর নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে হাজারেরও বেশি মানুষকে হত্যা করেছে। এর প্রতিবাদে ওই দিন সকাল থেকে সরকার পতনের একদফা দাবিতে সর্বাত্মক

অসহযোগ কর্মসূচি পালন শুরু করে আপামর ছাত্র-জনতা। সকাল থেকেই ফেনী শহরের মহিপাল পয়েন্টে ঢাকা-চট্টগ্রাম রোড অবরোধ করে ছাত্র-জনতা অবস্থান কর্মসূচি শুরু করে। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায়, ওই দিন সকালে শিহাবের দোকান কিছুক্ষণ খোলা থাকার পর ছুটি হয়ে যায়।

শিহাবের কর্মস্থল মহিপাল হওয়ায়, সকাল দশটার দিকে সামির (ইকবাল মেমোরিয়াল ডিগ্রি কলেজ, এইচএসসি- দ্বিতীয় বর্ষ) শিহাবকে ফোন দিয়ে মহিপাল পয়েন্টের পরিস্থিতি জানতে চায়। সেই ঘটনা স্মরণ করে সামির বলেন, সকাল দশটার দিকে আমি শিহাবকে ফোন দিয়ে মহিপালের পরিস্থিতি জানতে চাই। ও বলল, মহিপাল পয়েন্টে অনেক আন্দোলনকারী জমায়েত হচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, পুলিশ আছে কি না? ও বলল, পুলিশ আছে, তবে মনে হয় আজকে পুলিশ কিছু করবে না।

বারোটার কিছু আগে ওর দোকান ছুটি হয়ে গেলে ও আমাকে ফোন দিয়ে জানতে চায়, আমি কোথায় আছি। আমি জানাই যে, আমি মহিপাল পয়েন্টে আন্দোলনে আছি। এরপর দেখা করে অল্প সময় অবস্থান করার পর বলল, 'আম্মু বারবার ফোন দিচ্ছে। আমি একটু বাড়ি যাব, বাড়ি থেকে আবার আন্দোলনে আসব।' আমি তখন বলেছিলাম, 'আচ্ছা যা, আজ আর আসিস না আন্দোলনে।' ও বলল, 'না, আসব। তুই থাক এখানে।' শিহাব ওই দিন অন্যান্য দিনের তুলনায় দ্রুত বাসায় ফেরায় তার মা তাকে বলেছিলেন, 'আজকে যেহেতু সময় আছে, চুলটা কেটে আসো। শুক্রবার আসতে অনেক দেরি।'

মায়ের কথা অনুযায়ী শিহাব চুল কাটাতে বাসা থেকে বের হয়। তবে এটাই ছিল শিহাবের শেষবারের মতো বাহিরে যাওয়া, এরপর সে বাড়ি ফিরেছে ঠিকই, কিন্তু লাশ হয়ে। বাসা থেকে বেরিয়ে শিহাব সামিরের সাথে পুনরায় আন্দোলনে যোগ দেয়, আর সেখান থেকেই শুরু হয় তার চিরকালীন যাত্রা। শিহাবের মা আক্ষেপ করে বলেন, 'আমি তো জানতাম আমার ছেলে কোথাও যাবে না। কেন চুল কাটতে পাঠালাম? যদি না পাঠাতাম, তাহলে তো আমার ছেলেকে হারাতাম না।'

এরপরের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে সামির বলেন, শিহাব সাড়ে বারোটার দিকে আবার বাসা থেকে মহিপাল পয়েন্টে এসে আন্দোলনে যোগ দেয়। আমরা একসাথে আন্দোলন করছিলাম। যোহরের আজানের পর রাস্তায় একসাথে যোহরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করি। আমরা দ্বিতীয় জামাতে নামাজ পড়ি। দ্বিতীয় জামাত শেষ হওয়ার পরপরই ট্রাংকরোডের দিক থেকে মহিপালের দিকে একটি মিছিল আসতে থাকে।

মিছিলটিকে আন্দোলনকারীদের মিছিল মনে করে আমরা কয়েকজন স্বাগত জানাতে এগিয়ে যাই। তবে কিছু দূর যাওয়ার পর দেখি, এটি আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের মিছিল। তারা ককটেল নিক্ষেপ করতে করতে মহিপাল পয়েন্টের দিকে এগিয়ে আসছে। তখন আমরা কিছুটা পিছু হটে আরও বেশি আন্দোলনকারী সঙ্গে নিয়ে সন্ত্রাসীদের প্রতিহত করার জন্য অগ্রসর হই। আমরা সরকারি জিয়া মহিলা কলেজের কাছাকাছি পৌঁছালে আওয়ামী লীগের কর্মীরা আমাদের খুব কাছাকাছি এসে সরাসরি গুলি চালানো শুরু করে। তখন আমরা পেছনের দিকে, অর্থাৎ মহিপাল পয়েন্টের দিকে দৌড়াই। আমি আর শিহাব একসাথে দৌড়াচ্ছিলাম। শিহাব আমার হাত ধরে দৌড়াচ্ছিল, কিন্তু মহিপাল পয়েন্টে পৌঁছাতেই সে আমার হাত ছেড়ে দেয়, আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। সে সময় আমার মাথা কাজ করছিল না। আমি মহিপাল ফ্লাইওভারের ওপর উঠে পড়ি।

সন্ত্রাসীরা ক্রমাগত গুলি চালাতে থাকে। অনেকক্ষণ পর গুলিবর্ষণ থামলে, শিহাবের ফোন থেকে কেউ আমাকে কল দিয়ে জানায় যে শিহাব গুলিবিদ্ধ হয়েছে। আমি বুঝতে পারিনি, কলটি শিহাব নিজে দিয়েছিল নাকি অন্য কেউ ওর ফোন দিয়ে দিয়েছিল। এরপর আমি আমার বড় ভাই সরোয়ার জাহান মাসুদকে কল করি। প্রথমবার তিনি কল রিসিভ না করলেও দ্বিতীয়বার অপরিচিত একজন কল রিসিভ করে জানায়, মাসুদ ভাই সার্কিট হাউস গলির মুখে গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে আছেন। আমি দ্রুত মাসুদ ভাইয়ের কাছে ছুটে যাই। মাসুদ ভাইকে হাসপাতালে নেওয়ার সময় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা আমাদের রাস্তা আটকে ভাইয়াকে পিটিয়ে হত্যা করে। শিহাব কী অবস্থায় আছে তখন আর জানতে পারিনি। পরে জানতে পারি, শিহাব ওই সময়ই মারা গেছে।' শিহাবের ছোট ভাই ওয়ামিদ আহমেদ সয়েম বলেন, 'ভাইয়ার শরীরে তিনটি গুলি লাগে—একটা পায়ে, একটা পিঠে, আরেকটা মাথায়। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তিনি সার্কিট হাউজের গলির মুখে পড়ে ছিলেন। এরপর সন্ত্রাসীরা সরে গেলে কয়েকজন আন্দোলনকারী তাকে নিয়ে সার্কিট হাউজের গলির ভেতরে আসতে থাকেন। গলির ভেতরে নিয়ে আসার সময় পাসপোর্ট অফিসের সামনে একবার ভাইয়া তাদের হাত থেকে পড়ে যান। পরে তাকে আবার তুলে নিয়ে আন্দোলনকারীরা পাসপোর্ট অফিসের গলির ভেতরে চলে যান।

ভিডিওঃ আন্দোলনকারীরা গুলিবিদ্ধ শিহাবকে সার্কিট হাউজের গলির ভিতর থেকে পাসপোর্ট অফিসের গলির ভেতরে নিয়ে যায়।

এরপর ভাইয়া যে দোকানে কাজ শিখতো ওই দোকানের লোকেরা খবর পেয়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে হাসপাতালে নেওয়ার পথেই ভাইয়া মারা যান। দুপুর আড়াইটার দিকে আমরা জানতে পারি যে, ভাইয়া মারা গেছেন। এরপর আমি এবং আমার চাচা দ্রুত হাসপাতালে যাই এবং সিএনজিতে করে ভাইয়ার লাশ বাসায় নিয়ে আসি, কারণ অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যাচ্ছিল না। রাত নয়টায় ভাইয়াকে জানাজা শেষে দাফন করা হয়। কিন্তু জানাজার সময়ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা সমস্যা তৈরি করে।

ছবি: গুলিবিদ্ধ শিহাবের নিথর দেহ

ওই মুহূর্তের পরিস্থিতি বর্ণনা করে শিহাবের বন্ধু রোমান বলেন, 'জানাজায় যারা আসছে, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা তাদের লিস্ট করতেছিল, তাদেরকে থ্রেট দিতেছিল পরে দেখে নিবে। অনেক মানুষ জানাজার উদ্দেশ্যে বাজার পর্যন্ত এসে তারপর ফিরে গেছে। কারণ আওয়ামী লীগর নেতাকর্মীরা বাজারে অবস্থান করতেছিল।'

শহীদ ওয়াকিল আহমেদ শিহাব বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি 'জয়লস্কর সমাজ উন্নয়ন সংস্থা' এবং 'জরুরি রক্তের প্রয়োজনে আমরা এগিয়ে আসব, ইনশাআল্লাহ' সহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। শিহাব নিয়মিত রক্তদান করতেন। শিহাবের মা বলেন, 'আমাকে বলত না যে, ও রক্ত দেয়। কিন্তু একদিন বলল, আমি রক্ত দিয়ে আসছি। পরে আমি চিল্লাইয়া বললাম, তোর গায়ে কি অত রক্ত আছে?

তুই এত রক্ত দিস কেন? তখন আমাকে বলল, আম্মু, আপনি টেনশন কইরেন না। আমার কিছু হবে না। রক্ত তো মাসে মাসে পরিবর্তন হয়।' শিহাবের বন্ধুরা আফসোস করে বলেন, 'শিহাবের মতো একজন বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।'

তথ্যসূত্র :

১. শিহাবের মা, ভাই (ওয়ামিদ আহমেদ সয়েম) এবং বন্ধু (রোমান) এর সাক্ষাৎকার

২. প্রত্যক্ষদর্শী: শিহাবের বন্ধু এবং আন্দোলনের সহযোদ্ধা মাসুম আল সামির সাক্ষাৎকার

৩. ভিডিও: গুলিবিদ্ধ শিহাবকে সার্কিট হাউজের গলির মুখ থেকে পাসপোর্ট অফিসের গলির ভেতর নিয়ে যাওয়ার ভিডিও

তথ্য সংগ্রহে:

মোঃ কামরুজ্জামান এবং মোঃ নাহিদ হাসান সজীব;

স্টোরি মেকিং: মোঃ কামরুজ্জামান এবং ড. মোহাম্মাদ সরোয়ার হোসেন

'যদি বেঁচে না ফিরি, গর্বিত হইও'

শহীদের নাম : শাহারিয়ার খান আনাস।
বয়স : ১৬ বছর ৯ মাস (জন্ম-১৪ অক্টোবর ২০০৭)
মৃত্যুর তারিখ : ৫ আগস্ট ২০২৪।
পিতা: সাহরিয়া খান পলাশ।
মাতা : সানজিদা খান দীপ্তি।
ঠিকানা : গেন্ডারিয়া, ঢাকা।
শিক্ষা : ১০ম শ্রেণি, আদর্শ একাডেমি, গেন্ডারিয়া, ঢাকা

৫ আগস্ট ২০২৪। ভোরের স্নিগ্ধ নীরবতায়, বাসার সবাই যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, শাহারিয়ার খান আনাস বাবা-মাকে উদ্দেশ্য করে একটি চিঠি লিখে চুপিসারে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। কাউকে কিছু না জানিয়ে বের হওয়ার কারণ ছিল একটাই—শঙ্কা; পাছে পরিবারের কেউ তাকে দেখে ফেলে, তাহলে তো 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে।

আনাস যোগ দেয় উত্তাল আন্দোলনের জনস্রোতে, যে আন্দোলন ছিল জাতির ওপর চেপে বসা এক জগদ্দল পাথরকে উৎখাতের লক্ষ্যে ছাত্র-জনতার চূড়ান্ত লড়াই। সেই আন্দোলনের জোয়ারে শরিক হয়ে তিনি সহযোদ্ধাদের বলেছিলেন, 'আমার যদি গুলি লাগে, তবে যেন তা হাতে-পায়ে না লাগে। আল্লাহ যেন আমাকে সাথে সাথেই শহীদ হওয়ার তাওফিক দান করেন।' আনাসের মনোবাসনা পূরণ হয়েছে। যে স্পটে আনাস গুলিবিদ্ধ হয়, সেই স্পটেই সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। আনাসের বয়সই-বা কত ছিল? মাত্র ১৭ বছরের এক টগবগে কিশোর। সমবয়সী অন্যদের তুলনায় একটু সহজ-সরল, 'বোকা' বলা যায়। খুবই লাজুক এবং নিজেকে প্রকাশ করতে একটু অস্বস্তি বোধ করত। তবে ছেলেটির মনে ছিল অদম্য সাহস এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার প্রবল ইচ্ছা।

কোটা সংস্কার আন্দোলন আনাসের মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। জালিম শাসকের জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আগুন জ্বলছিল তার হৃদয়জুড়ে। আনাসের

শাহাদাতের পর তার রুম থেকে পাওয়া যায় আন্দোলন চলাকালীন সময়ে নোট খাতায় লিখিত সাত পৃষ্ঠার চিঠি। চিঠিতে আনাস ১৮ কোটি মানুষকে জালেম সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে লিখেছিলেন, সময় হয়েছে এখন এই পরাধীনতার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসার। নিজের অধিকার আদায়ে সংগ্রাম করার। আমার, তোমার একার দ্বারা কিছুই হবে না। আমাদের সবাইকে একত্রিত হতে হবে। ১৮ কোটি জনগণ প্রত্যেকে একত্রিত হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করব। আমাদের পূর্ব প্রজন্ম তাদের রক্তের বিনিময়ে দেশটাকে স্বাধীন করেছে। এবার আমাদের কর্তব্য আমরা আবার দেশটাকে স্বাধীন করব। আমরা মনে রাখব এই দেশটা আমার, আমাদের। দেশটা আমাদের গর্ব। দেশটা আমাদের অধিকার। প্রত্যেকের অধিকার। মনে রাখতে হবে, বাঁচলে মাথা উঁচু করে বাঁচব। তবুও অন্যায়ের সাথে আপোষ করব না। হোক তাতে মৃত্যু। স্লোগান একটিই হবে, আমার দেশ, আমার অধিকার। সইব না আর কারও অন্যায়-অবিচার।

আন্দোলনে যোগদানের অদম্য ইচ্ছা

আনাসের মনের গভীরে লাখো তরুণের সাথে উত্তাল রাজপথে আন্দোলনে যোগ দেওয়ার এক অদম্য ইচ্ছা দানা বাঁধে। তবে তার সহজ-সরল স্বভাবের কারণে সে একা যেতে সাহস পাচ্ছিল না। পরিচিত কারও সঙ্গ প্রয়োজন মনে করে, ৩ আগস্ট রাতে সে তার বন্ধু তুহিনকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মেসেঞ্জারে জানায়—দোস্ত, মনটা খারাপ। আমাদের ভাইদের হত্যা করা হচ্ছে। আমিও আন্দোলনে যাব। কিন্তু কারও সাপোর্ট চাচ্ছিলাম। তুই যাবি আমার সাথে? আমার ভাইদের পাশে দাঁড়াতে চাই। সেলফিশের মতো কীভাবে বাসায় বসে থাকি? কালকে যাবি?
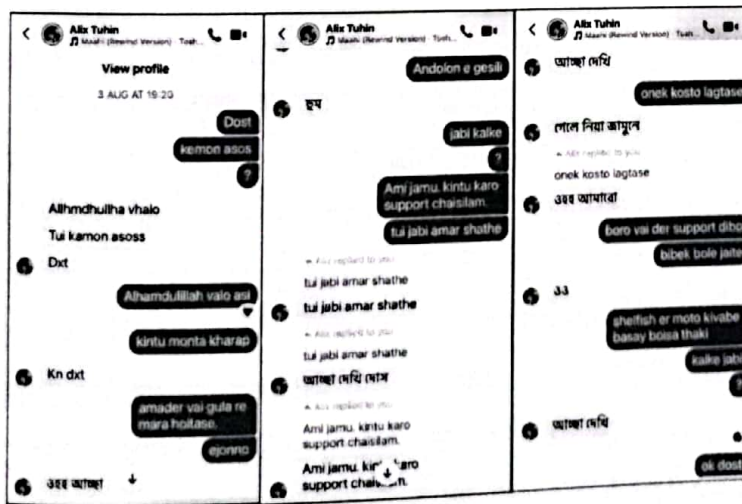
ছবিঃ মেসেঞ্জারে বন্ধু তুহিনের সাথে আন্দোলন নিয়ে আনাসের কথোপকথন

বাবা-মার বাধার কারণে ৪ আগস্ট আনাস আন্দোলনে যোগ দিতে পারেনি, তবে ০৪ আগস্ট দিবাগত রাতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ছাত্র জনতার ঢেউ তার অন্তরেও আছড়ে পড়েছিল। সেই অনুভূতি তাকে ভেতরে-বাহিরে তোলপাড় করে দিয়েছিল। সে রাতেই জনসমুদ্রে মিশে যেতে চেয়েছিল আনাস। বাবা-মা রাজি না হওয়ায় ওই রাতে বের হতে না পারলেও, পরের দিন ভোরে বাবা-মাকে কিছু না জানিয়ে দেশ বাঁচানোর শপথ নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছিল এই অকুতোভয় তরুণ।

ওই দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আনাসের মা সানজিদা খান দীপ্তি বলেন—৪ আগস্ট দিবাগত রাত তিনটা পর্যন্ত আমরা একসাথে টেলিভিশন দেখছিলাম। তখন শহীদ মিনারের লাইভ সম্প্রচার হচ্ছিল। সেখানে অনেক মানুষের জমায়েত ছিল। আনাস বলল, 'মা, চলো, আমরাও যাই।' ওর বাবা বললেন, 'তুমি কি পাগল হয়ে গেছ? এখন আমরা কীভাবে যাব?' আনাস বলল, 'দেখো, কত মানুষ জমায়েত হচ্ছে।' ওর বাবা বললেন, 'ওটা ফেক নিউজ। কারফিউ চলছে, সেনাবাহিনী মাঠে আছে। আমরা কীভাবে বের হব? আর এত দূরে যাব কীভাবে?' তখন আনাস মন খারাপ করল।

রাতে যখন সমন্বয়কদের একজন আহ্বান জানাল, 'প্রতি পরিবার থেকে অন্তত একজন হলেও আসুন, 'আনাস আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'মা, এই কথাটা কেন বলল? এভাবে কেন বলল?' আমি উত্তর দিলাম, 'বাবা, আমরা যারা ঢাকায় থাকি, আমাদের জন্য গন্তব্য অনেক কাছে। যারা ঢাকার বাইরে থাকে, তাদের জন্য তো অনেক দূরে। তাদের জন্য তো আর পরিবারের সবার ঢাকা আসা সম্ভব না। এক পরিবার থেকে একজন করে আসলেও অনেক মানুষ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবে।' আমি তাকে এভাবে বুঝিয়ে বললাম।

এই কয়েকদিন ধরে আনাস অনেক উদ্বিগ্ন ছিল। তেমন পড়ত না। সারাদিন ইউটিউবে খবর দেখত। ৩১ জুলাই আন্দোলনের পক্ষে ফেসবুকের প্রোফাইল পিকচার পরিবর্তন করেছিল। প্রতিদিনই সে আন্দোলনে যেতে চাইত। প্রতিদিন তার বাবা বলত, 'তোমাকে নিয়ে যাব, সময় হোক'। কিন্তু বের হতে দিত না। ৫ তারিখে আর কিছু বলেনি। চিঠি লিখে চলে গেছে। আন্দোলনকারী ছেলেদের কাছেও বলছে, 'আমি বাসায় না বলে চলে আসছি। একটা চিঠি লিখে রেখে আসছি। আমার বাবা জানলে আমাকে আসতে দিবে না।' আনাস 'মার্চ টু ঢাকা কর্মসূচি'-তে কীভাবে যোগ দেবে, তা জানতে সে তার প্রাইভেট শিক্ষকের কাছে জিজ্ঞাসা করে। প্রাইভেট শিক্ষক তাকে বলেন, তাঁতী বাজারে গেলে সেখানে আরও অনেক

আন্দোলনকারীর সঙ্গে দেখা হবে। সেখান থেকে সবাই মিলে চাঁনখারপুলে গিয়ে একত্রিত হবে। এরপর তারা বকশিবাজার হয়ে ঢাকা মেডিকেলের সামনে দিয়ে শহীদ মিনার এবং শাহবাগের দিকে এগিয়ে যাবে। শাহবাগ থেকে নির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা অনুযায়ী তারা গণভবনের দিকে যাত্রা করবে।

শহীদের রক্তে রাঙা 'আল্লাহ' নামের নেমপ্লেট

আনাসের হৃদয় গহীনে যে ঝড় বয়ে যাচ্ছিল, তা তাকে আর স্থির থাকতে দেয়নি। দুর্বার আকর্ষণে টেনে নিয়ে গিয়েছিল স্বৈরাচার পতনের আন্দোলনে। ৫ আগস্ট সকালে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় আনাস তার বুকপকেটে যত্নসহকারে রেখে দিয়েছিল একটি ছোট নেমপ্লেট। নেমেপ্লেটে জ্বলজ্বল করছিল আরবিতে লেখা 'আল্লাহ' শব্দটি। নেমপ্লেটটি সবসময় তার সাইকেলের সামনে শোভা পেত, তবে শাহাদাতের দিন আনাস এটি নিজের সঙ্গে নিয়ে বের হয়। আনাসের অদম্য সাহসের উৎস ও রহস্য লুকিয়ে ছিল এই ঐতিহাসিক নেমপ্লেটের মাঝেই, যেখানে লেখা ছিল মহান আল্লাহর নাম। বুকপকেটের পাশ ঘেঁষে একটি বুলেট তার পাঁজর ভেদ করে বেরিয়ে যায়, আর আনাসের রক্তে রঞ্জিত সেই নেমপ্লেটটি যেন হয়ে ওঠে তার শাহাদাতের নীরব সাক্ষী।

ছবিঃ আনাস বাসা থেকে বের হওয়ার সময় একটি ছোট মোবাইল এবং আল্লাহ নামের একটি নেমপ্লেট সাথে নেয়।

শেষ চিঠি, বাবা-মায়ের প্রতি

বাড়ি থেকে বের হবার আগে আনাস একটি চিঠি লিখে রেখে যায়। যে চিঠি হয়ে থাকবে আগামী দিনে চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক এক প্রামাণ্য দলিল, যে চিঠি আগামীর দিনগুলোতে আনাসের মতো লাখো টগবগে তরুণকে জালেমের জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে অনুপ্রেরণা যোগাবে—

> মা, আমি মিছিলে যাচ্ছি। আমি নিজেকে আর আটকিয়ে রাখতে পারলাম না। সরি আব্বুজান, তোমার কথা অমান্য করে বের হলাম। স্বার্থপরের মতো ঘরে বসে থাকতে পারলাম না। আমাদের ভাইরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য

কাফনের কাপড় মাথায় বেঁধে রাজপথে নেমে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। অকাতরে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিচ্ছে। একটি প্রতিবন্ধী কিশোর, সাত বছরের বাচ্চা, ল্যাংড়া মানুষ যদি সংগ্রামে নামতে পারে, তাহলে আমি কেন বসে থাকব ঘরে! একদিন তো মরতেই হবে। তাই মৃত্যু ভয় করে স্বার্থপরের মতো ঘরে বসে না থেকে সংগ্রামে নেমে গুলি খেয়ে বীরের মতো মৃত্যুও অধিক শ্রেষ্ঠ। যে অন্যের জন্য নিজের জীবনকে বিলিয়ে দেয়, সেই প্রকৃত মানুষ। আমি যদি বেঁচে না ফিরি, তবে কষ্ট না পেয়ে গর্বিত হইও। জীবনের প্রতিটি ভুলের জন্য ক্ষমা চাই। —শাহারিয়ার খান আনাস

[চিঠির বানানগুলো সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে]

Date: ০৫/০৮/২০২৪

মা, আমি মিছিলে যাচ্ছি। আমি নিজেকে আর আটকিয়ে রাখতে পারলাম না। সরি আব্বুজান। তোমার কথা অমান্য কোরে বের হোলাম। স্বার্থপরের মতো ঘরে বোসে থাকতে পারলাম না। আমাদের ভাই রা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কাফনের কাপড় মাথায় বেধে রাজপথে নেমে সংগ্রাম কোরে যাচ্ছে। অকাতরে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিচ্ছে। একটি প্রতিবন্ধি কিশোর, ৭ বছরের বাচ্চা, ল্যাংরা মানুষ যদি সংগ্রামে নামতে পারে, তাহলে আমি কেনো বোসে থাকবো ঘরে। একদিন তো মরতে হবেই। তাই মৃত্যুর ভয় কোরে স্বার্থপরের মতো ঘরে বোসে না থেকে সংগ্রামে নেমে গুলি খেয়ে বীরের মতো মৃত্যুও অধিক শ্রেষ্ঠ। যে অন্যের জন্য নিজের জীবনকে বিলিয়ে দেয় সেই প্রকৃত মানুষ। আমি যদি বেচে না ফিরি তবে কষ্ট না পেয়ে গর্বিত হয়ো। জীবনের প্রতিটি ভুলের জন্য ক্ষমা চাই।

আনাস

Apetiz

ছবি: বাসা থেকে বের হওয়ার আগে বাবা-মাকে উদ্দেশ্য করে লিখিত চিঠি।

পড়ছে। আনাসের লেখনীতে কেবল তার নিজস্ব আদর্শই নয়, বরং এক মুক্তিকামী প্রজন্মের আবেগ, সংগ্রাম এবং আত্মত্যাগের বাস্তব প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। আনাস ছিল জুলাই বিপ্লবের অন্যতম এক মহানায়ক। সে কেবল এই চিঠিই লেখেনি, পুরো আন্দোলনের সময় তার নোট খাতায় সে আরও সাত পৃষ্ঠার চিঠি লিখেছিল। আনাস আমাদের এই বিপ্লবের ইতিহাসকে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছে এই সাত পৃষ্ঠার চিঠিতে, আগামী দিনে যা এই বিপ্লবের অন্যতম দলিল হয়ে থাকবে।

যেমন ছিল আনাসের শেষ মুহূর্তগুলো

সকালে বাসার সবাই ঘুম থেকে জাগার আগেই ঘর থেকে বের হয়ে তাঁতী বাজার চলে যায় আনাস। বাসা থেকে বের হওয়ার আগে সে ব্যাগে কিছু পরিধেয় কাপড় নিয়ে বের হয়। তার ইচ্ছা ছিল, যতদিন না এই দেশ পুনরায় স্বাধীন হচ্ছে, সে আর ঘরে ফিরবে না। এ যেন শত্রুর করাল গ্রাস থেকে দেশকে মুক্ত ও স্বাধীন করতে এক অকুতোভয় মুক্তিসেনার মরণপণ সংকল্প। তাঁতী বাজার গিয়ে পরিচয় ঘটে মুন্সীগঞ্জ থেকে আসা আব্দুর রহমান ফাহাদের সাথে। অল্প সময়েই তার সাথে বন্ধুত্ব হয়ে যায় আনাসের। ওই দিনের ঘটনা প্রবাহের স্মৃতিচারণ করে আব্দুর রহমান ফাহাদ (শিক্ষার্থী, আলিম প্রথম বর্ষ, ধীপুর ইসলামিয়া ফাজিল মাদরাসা, টংগিবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ) বলেন—দিনটি ৫ই আগস্ট ২০২৪ (৩৬ জুলাই)। সেদিন ছিল ‘লং মার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচি এবং ‘গণভবন’ দখলের ঘোষণা। আমাদের বাসা থেকে গিয়েছিলাম আমি, আমার ছোট ভাই আর আমার খালাতো ভাই।

আমরা তাঁতী বাজারে গিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান নিলাম। সেদিন তাঁতী বাজার থেকে মিছিল বের হওয়ার কথা। আমি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ফেসবুকিং করছিলাম আর অপেক্ষায় ছিলাম সিনিয়র ভাইদের ফোনের জন্য। তখন সকাল নয়টা। হঠাৎ এক ছেলে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, ‘ভাই, আপনি কি মিছিলে যাবেন?’ আমি প্রথমে কিছুটা হকচকিয়ে গেলাম এবং কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। পরে তার লেবাস আর কাঁধের ব্যাগ দেখে বুঝতে পারলাম, সেও আন্দোলনে অংশ নিতে এসেছে। আমি তাকে বললাম, ‘জ্বি ভাই, আমি মিছিলে যাচ্ছি। কিন্তু আপনি কে?’ সে বলল, ‘ভাই, আমার এক শিক্ষক আছেন, যার সাথে কথা বলে আমি এখানে এসেছি। উনি বলছিলেন, তাঁতী বাজার থেকে মিছিল বের হবে, তাই আমি এখানে চলে এসেছি। কিন্তু আমি তার সাথে যোগাযোগ করতে পারছি না।’

তারপর আমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হলাম। তার নাম আনাস, বাসা গেন্ডারিয়া। দশম শ্রেণিতে পড়াশোনা করে। এরপর আমি তাকে বললাম, 'ঐ কর্নারে গিয়ে দাঁড়ান, আমাকে নজরে রাখবেন। ইশারা করলে চলে আসবেন।' সে সম্মত হয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। এইভাবে করেই সকাল দশটা বেজে গেল। আনাস এসে আমাকে বলল, 'ভাই, দশটা বেজে গেল, এখনো তো কোনো সাড়া পাচ্ছি না।' আমি বললাম, 'যেখান থেকে মিছিল শুরু হবে সেখানে আমাদের সিনিয়র ভাইয়েরা আছেন। ওখান থেকে আমাকে কল দিবে। আপনি একটু ধৈর্য ধরেন।' তো আমরা সেখানে অপেক্ষা করতে থাকি, ঘোরাফেরা করতে থাকি এবং অনেক কথাও বলতে থাকি। সাড়ে দশটার দিকে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি শুরু হলো। আশেপাশের দোকানপাট সব বন্ধ। আমরা দুইজন একটা মার্কেটের নিচে সিঁড়িতে বসে পড়লাম। আমাদের মধ্যে তখন স্বৈরাচার সরকারের অত্যাচার নিয়ে কথা চলছিল। কথায় কথায় আনাস বলল, 'আমি বাসায় কিছু বলে আসিনি। বললে আমাকে আসতে দিত না। সবাই ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় একটা চিঠি লিখে বের হয়ে এসেছি। কারণ আমার ভাইয়েরা মরতেছে আর আমি বাসায় বসে থাকতে পারছি না।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি আজকে বাসায় গেলে তো আপনাকে আর বের হতে দেবে না। তাহলে পরবর্তী আন্দোলনগুলোতে কীভাবে অংশগ্রহণ করবেন?' উত্তরে সে বলল, 'আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে বাসা থেকে বের হয়েছি। প্যান্ট আর শার্ট সঙ্গে নিয়ে এসেছি। যতদিন আন্দোলন চলবে, ততদিন বাড়ি ফিরব না।' আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে থাকবেন কোথায়?' সে বলল, 'আমি কাউকে চিনি না, তবে যে কোনো এক ভাইয়ের কাছ থেকে ম্যানেজ করে নেব।'

এরপর আমরা আবার কথায় মগ্ন হলাম। এক পর্যায়ে আনাস বলল, 'দেখেন ভাই, আমাদের কত ভাই পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে অন্ধ আর পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। এটা ভাবলেই আমার খুব কষ্ট লাগে। আমি আল্লাহর কাছে একটাই দোয়া করি, যদি কোনোদিন গুলি লাগে, তাহলে যেন সঙ্গে সঙ্গে মরে যাই। একদিন তো মরতেই হবে ভাই।' এই অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব জমে উঠেছিল। এইদিকে বৃষ্টি চলমান, তাই আনাস বলল, 'আমার ব্যাগটা ওয়াটারপ্রুফ না, আপনি একটু কষ্ট করে আপনার ব্যাগের ভেতর আমার ব্যাগটা রাখবেন?' আমি বললাম, 'অবশ্যই।'

এগারোটা দশ মিনিটের দিকে কল এলো যে, বার্ন ইউনিটের সামনের মোড়টা ছাত্রজনতা দখল করবে। সবাই আশপাশ থেকে লাঠি-শোটা নিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে। আনাস একটা লাঠি পেয়েছে, কিন্তু আমি কিছুক্ষণ খোঁজার পরও লাঠি পাইনি।

আনাস আমাকে জোর করে নিয়ে গিয়ে একটা লাঠি ভেঙে দিল আর একটা লাল কাপড়ের টুকরো হাতে বেঁধে দিল। দূরে পুলিশের একটা দল দাঁড়িয়ে আছে। আমরা ছাত্রজনতা স্লোগান দিতে শুরু করলাম।

প্রায় দশ মিনিট ধরে এইভাবেই চলল। হঠাৎ পুলিশ দূর থেকে রাবার বুলেট ছুঁড়তে শুরু করল। আমরা ছাত্রজনতা আত্মরক্ষার্থে পাশের গলিতে অবস্থান নিলাম। পুলিশ বুলেট ছুঁড়তে ছুঁড়তে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আমরা ইট-পাটকেল সংগ্রহ করে পুলিশের দিকে ছোড়ার চেষ্টা করি, কিন্তু তাদের রাবার বুলেটের তেজ ক্রমশ বাড়ছে। আমরা ছিলাম গলির ভেতরে, আর পুলিশ মেইন রোডে। আনাস আমার সাথে ছিল, আর বারবার বলছিল, 'ভাই, আমরা পালাচ্ছি কেন?' আনাসের জীবনে এই প্রথম আন্দোলন, তাই সে জানত না, পুলিশের সাথে কীভাবে মোকাবেলা করতে হয়। আমি বললাম, 'ভাই, আমরা পালাচ্ছি না। যদি সরাসরি তাদের সামনে দাঁড়াই, নিশ্চিত গুলি করবে। তাই আমরা গলিতে থেকে ইট-পাটকেল ছুঁড়ব। তাদের বুলেট শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব।'

এক পর্যায়ে লক্ষ করলাম, আমাদের ওপর একটা ড্রোন ঘুরছে। কেউ বলছে এটা সাংবাদিকের ড্রোন, কেউ বলছে পুলিশ আমাদের অবস্থান জানার জন্য ব্যবহার করছে। কিছুক্ষণ পর ওপর থেকে রাবার বুলেট আসল, প্রায় সবার গায়ে লাগল। দূর থেকে ছোঁড়ার কারণে তেমন ক্ষতি হয়নি, তবে আমার হাতে একটু চামড়া ফেটে রক্ত বের হলো। আনাসের মাথায় ছোট একটা বুলেট লাগলো, সামান্য রক্ত বের হলো। আনাস আমাকে বারবার জিজ্ঞাসা করছিলো, 'ভাই, এই বুলেটে তো কোনো ক্ষতি নাই তাই না?' আমি বললাম, 'না, এই বুলেটে মৃত্যুর ঝুঁকি নাই।'

এভাবেই চলতে থাকল। আমরা আন্দোলনে ব্যস্ত, আর তাদের রাবার বা ছররা বুলেট প্রায় শেষের পথে। আমরা পাথর ভাঙছিলাম। এমন সময় হঠাৎ করে পুলিশ একটা সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়ে মারল, আর সাথে সাথে তারা গলির ভেতরে ঢুকে রাইফেল নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। এক মুহূর্তের মধ্যে দেখলাম পুরো গলি ফাঁকা হয়ে গেছে। তখন এক বাসার গেটের ভেতর থেকে এক ভাই আমাকে ডাকছে, 'এই ভাই, তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকেন!' আমি ঢুকে পড়লাম আর গেট বন্ধ করে দিলাম।

এদিকে আনাস অন্যদিকে চলে গেছে। এবার পুলিশ রাইফেল দিয়ে গুলি করতে শুরু করেছে। প্রায় দশ মিনিট আমরা আতঙ্কে ছিলাম, আর পুলিশের গুলির আওয়াজ শুনছিলাম। দশ মিনিট পর গেটটা খোলার পরে দেখি রক্ত ছিটকে পড়ে

আছে। এখানে যারা ছিলাম, আমরা আলোচনা করতেছি কার গায়ে গুলিটা লাগতে পারে। ঠিক তখনই আমার ছোট ভাইয়ের ফোন এলো। ছোট ভাই বলল, 'সকাল থেকে তোমার সাথে যে ছেলেটা ছিল, তার তো গুলি লেগেছে, ছেলেটা বোধ হয় বাঁচবে না।' এই কথা শুনে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। আমার ভাই জানাল যে, মুজাহিদুল ইসলাম ভাই তাকে রিকশায় করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি উপস্থিত সবাইকে সবকিছু বললাম। কিছুক্ষণ পর এক ভাই রক্তমাখা একটা লাঠি নিয়ে আসলো। আমি লাঠিটা দেখেই চিনে ফেললাম—এটা আনাসের লাঠি।

ভিডিওঃ গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে থাকে আনাস

আবার আন্দোলন শুরু হলো। সবাই একত্র হয়ে ঝুঁকি নিয়ে এগোতে থাকলাম। এক পর্যায়ে পুলিশ সব পালিয়ে গেলে আমরা রাস্তা দখল করে নিলাম। ছাত্রজনতার সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকল। সবাই রওনা দিলাম শাহবাগের উদ্দেশ্যে। এদিকে আমার বারবার আনাসের কথা মনে পড়ছে—সে কি আদৌ বাঁচবে? এভাবে প্রায় আধা ঘণ্টা বা পয়তাল্লিশ মিনিট হাঁটার পর দেখলাম, মানুষের মুখে মুখে শোনা যাচ্ছে, 'হাসিনা পালাইছে।' প্রথমে এটাকে গুজব ভেবেই উড়িয়ে দিলাম। কিন্তু আরও কিছুটা এগোতেই দেখলাম, ছাত্রজনতা উচ্ছ্বাসে মিছিল করতেছে, 'পালাইছে রে পালাইছে, খুনি হাসিনা পালাইছে।'

আমার কাছে সম্পূর্ণ ঘটনা স্বপ্নের মতো মনে হতে লাগল। পথে পরিচিত এক ভাইয়ের সাথে দেখা হলো, তার সাথে শাহবাগে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ অবস্থান করলাম। এরপর আমরা সংসদ ভবনে গেলাম। সেখানে মাগরিবের নামাজ আদায় করলাম। এরপর বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার পালা। আমরা আব্দুল্লাহ মুজাহিদ ভাইয়ের সাথে রওনা হলাম, আর আনাসের ব্যাগটা তখনো আমার কাছেই ছিল। আমরা নিশ্চিত হতে পারছিলাম না—আনাস কি আদৌ বেঁচে আছে?

বাসায় এসে আমি আনাসের ব্যাগটা খুলে দেখি, কোনো বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় কি না। কিন্তু ব্যাগে ছিল শুধুমাত্র একটা প্যান্ট, একটা টি-শার্ট, একটা ভাইয়োডিনের বোতল, একটা পাতা প্যারাসিটামল, আর দুই-তিনশ টাকা। আমরা অনেক খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করলাম। এক পর্যায়ে মুজাহিদুল ইসলাম ভাই আনাসের একটি খবর পত্রিকায় দেখলেন। তখন জানতে পারলাম, আনাস মারা গেছে। এরপর আমরা তার বাসায় গিয়ে ব্যাগটা ফিরিয়ে দিয়ে এলাম।

ছবিঃ ঘাতকের গুলি আনাসকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়

মুজাহিদুল ইসলাম (দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা, ডেমরা, ঢাকা, আল-হাদিস ডিপার্টমেন্ট, ২০১৬-১৭ সেশন) ৫ আগস্টের ঘটনাপ্রবাহ এবং পরবর্তীতে আনাসের পরিবারের কাছে আনাসের ব্যাগ হস্তান্তরের ঘটনা স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন—

৫ আগস্ট, বেলা বারোটার দিকে আমরা চানখারপুল সংলগ্ন জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটের পাশে দাঁড়িয়ে আন্দোলন শুরু করি। কিন্তু পুলিশের তীব্র গুলিবর্ষণের কারণে আমরা দল বেঁধে বিচ্ছিন্ন হয়ে শেখ বোরহানউদ্দিন পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের রাস্তা ও আশপাশের গলিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হই। এক পর্যায়ে পুলিশ ছররা গুলি চালাতে চালাতে গলির ভেতরে প্রবেশ করে। আমার বাম পায়ে একটি ছররা গুলি এসে লাগে, যা তাৎক্ষণিকভাবে বের করে ফেলা হয়। পরে আমি এবং অন্যান্য আন্দোলনকারী পূর্ব দিকে কিছুটা এগিয়ে যেতে থাকি। ঠিক তখনই, এপিবিএন পোশাক পরা কয়েকজন পুলিশ হঠাৎ গলির ভেতরে প্রবেশ করে আমাদের দিকে বন্দুক তাক করে। পরিস্থিতি বুঝে আমরা সবাই পূর্ব দিকে দৌড়ে পালাই। এ সময় আমার বাম পাশে থাকা একটি ছেলে হঠাৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। কিন্তু পুলিশ হাঁটু গেড়ে বন্দুক তাক করে থাকায় আমরা তাকে সাহায্য করতে পারিনি। অল্প সময় পর পুলিশ সরে গেলে, আমি ও আরেকজন মিলে ছেলেটিকে তুলে একটি রিকশায় করে মিটফোর্ড হাসপাতালে পাঠিয়ে দিই।

আমার সঙ্গে থাকা আব্দুর রহমান ফাহাদ জানায়, ছেলেটির নাম আনাস। সে গেন্ডারিয়ার কোনো এক স্কুলে পড়াশোনা করে। আনাস বাসায় কিছু না জানিয়ে একটি চিঠি লিখে আন্দোলনে যোগ দেয়। তার ব্যাগ ফাহাদের কাছে ছিল। তবে,

ফাহাদও আনাসের সঙ্গে এই আন্দোলনেই প্রথম পরিচিত হয়। তাই আনাসের পরিবারের কোনো ফোন নম্বর বা ঠিকানা ফাহাদের কাছে ছিল না। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আমরা তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। পরবর্তীতে দীর্ঘ এক মাস পর শহীদ তালিকা দেখে ও তার শিক্ষকের একটি ফেসবুক স্ট্যাটাসের মাধ্যমে তার পরিবারের সন্ধান পাই। পহেলা সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে আমরা তাদের সঙ্গে দেখা করি এবং আনাসের ব্যাগটি তাদের হাতে তুলে দিই।

সকালে বাসা থেকে বের হওয়ার আগে আনাস একটি ছোট সাইজের চাইনিজ মোবাইল সাথে নেয়। মোবাইলটিতে কোনো সিম ছিল না, তবে সে কয়েকজন আত্মীয়ের নাম্বার সেভ করে রেখেছিল। এই মোবাইল থেকেই আনাসের মায়ের নাম্বার পেয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী (সৌরভ) ফোন করে। না হলে, হয়তো আনাসের লাশ বেওয়ারিশ হিসেবে কোথাও দাফন করা হতো। শহীদ আনাসের মা বলেন, 'আগের দিন আমি দেখছিলাম, মোবাইলটা চার্জ দিচ্ছে। তখন জানতাম না যে, সে বের হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল।'

দুপুর প্রায় একটা বেজে পনেরো মিনিট, অপরিচিত একটি নাম্বার থেকে কল আসে আনাসের মায়ের ফোনে। অপর প্রান্ত থেকে জানানো হয়, দ্রুত মিটফোর্ড হাসপাতালে যেতে হবে তাদের । মা প্রথমে ভাবলেন, হয়তো কাঁদানে গ্যাসের শেলের ধোঁয়ায় আনাস অসুস্থ হয়ে পড়েছে, অথবা বড় কোনো অঘটন ঘটে থাকলে গায়ে রাবার বুলেট লেগেছে। কিন্তু নিয়তি বড়ই নির্মম, হাসপাতালে পৌঁছানোর পর বাবা-মা যা দেখলেন, তা কোনোভাবেই কল্পনা করতে পারেননি। সিঁড়ির পাশে একটি স্ট্রেচারে রাখা ছিল তাদের প্রাণপ্রিয় পুত্রের রক্তাক্ত নিথর দেহ। বাগানের সবচেয়ে সুন্দর গোলাপটি ঝরে পড়েছে চিরদিনের জন্য।

আনাসের মরদেহ নিয়ে ফেরার সময়

অ্যাম্বুলেন্স, ভ্যান বা সিএনজি—কিছুই না পেয়ে তারা অটোরিকশায় উঠে কোলে করে শহীদ আনাসের লাশ বাসায় নিয়ে যান। আসরের নামাজের পর ধূপখোলা মাঠে আনাসের জানাজা আদায় করা হয়। আনাসের লাশ গোসল করানো হয়নি, কারণ শহীদের লাশ গোসল করানো হয় না। এরপর আনাসকে তার দাদির কবরে দাফন করা হয়। আনাসের জন্ম ২০০৭ সালের ১৪ই অক্টোবর, সোমবার রোজার ঈদের দিন; এবং মৃত্যু ০৫ আগস্ট, ২০২৪, সোমবার, বিজয়ের দিন।
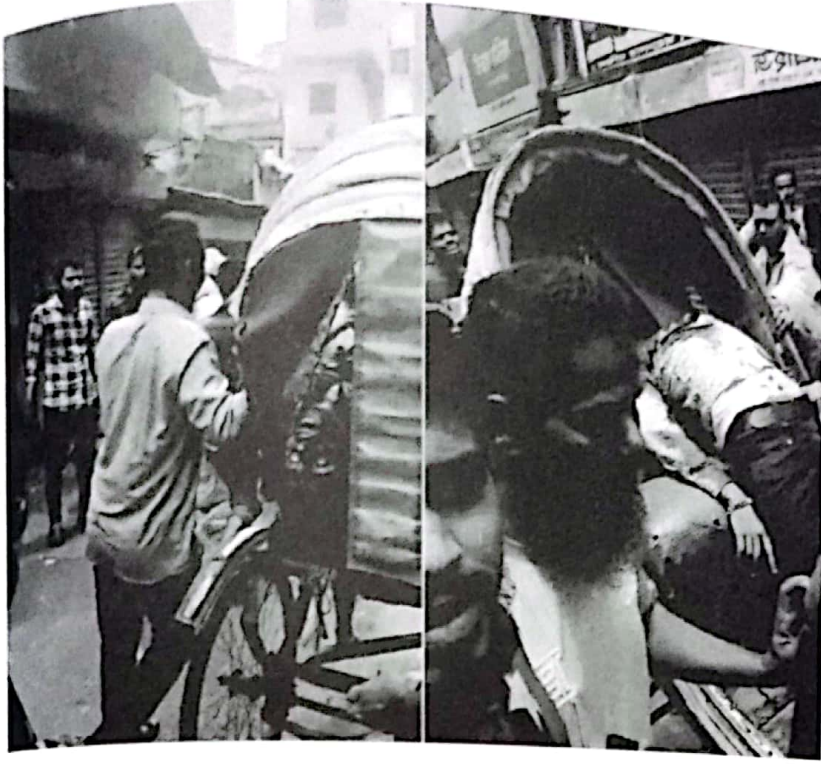
ছবি: অটোরিকশায় করে আনাসের লাশ বাসায় আনা হয়।

অধরাই রয়ে গেল পিতামাতার স্বপ্ন

শহীদ শাহারিয়ার খান আনাস সবসময় রুটিন অনুসরণ করত। কখন ঘুমাবে, কখন উঠবে, কখন স্কুলে যাবে, কখন খাবার খাবে, কখন নামাজ পড়বে, সব কিছুই ছিল তার নির্ধারিত রুটিনে। স্কুলে গিয়ে সে নামাজও পড়ত। ঘরের কাজে সহযোগিতা করত। ছেলে হারানোর শোক নিয়ে আনাসের বাবা, সাহরিয়া খান পলাশ বলেন, 'আনাসের ইচ্ছা ছিল, সে ইঞ্জিনিয়ার হবে, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করবে। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রতি তার অনেক আগ্রহ ছিল। আমাদেরও ইচ্ছা ছিল, আনাসকে উচ্চশিক্ষার জন্য দেশের বাহিরে পাঠিয়ে তার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার।'

ছবিঃ সন্তানের নিথর দেহ জড়িয়ে ধরে শোকাহত বাবার কান্না

তিনি আরও বলেন, 'আমার বয়স হয়ে গেছে। আনাসের ছোট দুই ভাই বয়সে অনেক ছোট। সাফওয়ানের বয়স ৫ বছর আর সুফিয়ানের বয়স ২ বছর। আমরা ভাবতাম, আনাস তার ছোট ভাইদের দেখে-শুনে বড় করবে। আমাদের অনেক স্বপ্ন ছিল তাকে নিয়ে,

কিন্তু তা আর বাস্তবে রূপ নিল না। স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই রয়ে গেল। একটা বুলেটের কাছে সব স্বপ্ন হার মেনে গেল। ওর কোনো আবদার ছিল না। মার্কেটে শপিংয়ে গেলে সে কিছু কিনতে চাইত না। এই বার রোজার ঈদে আমি রাগ কইরা বলছি, 'ভালো একটা জুতা কেনো। তোমার তো চামড়ার জুতা নাই। অনুষ্ঠানে যাইতে হইলেও একটা ভাল জুতা লাগে।' না, সে কিনবে না। পরে প্লাস্টিকের স্যান্ডেল কিনছে ৩০০ টাকা দামের। আমার ছেলেটা যখন শহীদ হয়, তখন ওর পায়ে সেই প্লাস্টিকের স্যান্ডেলটাই ছিল।

মা আসো আমরা আবার মিল হইয়া যাই..

আমি যদি কখনো ওর সাথে রাগ করতাম, ও আইসা বলত, 'মা মাফ কইরা দাও। মা সরি, সব ভুলে যাও। আসো আমরা আবার মিল হইয়া যাই।' এই কথাটাই আমাকে সবচেয়ে কষ্ট দেয়। আমার তো আর কোনো সন্তান মনে হয় এমনে কইব না। আমার পিছে পিছে ঘুরত, আমি রাগ করতাম যা তুই আর কথা বলবি না। ও আমার পিছে পিছে ঘুরত। শহীদ আনাসের মা আক্ষেপ করে এসব বলেন। 'এখনো প্রতিদিন বিকাল ৩টা বাজলে মনে হয়, আমার আনাস স্কুল থেকে বাসায় আসব। পরক্ষণেই আবার মনে হয়, আমার মানিকের তো চিরদিনের সফর শুরু হইয়া গেছে। আল্লাহ আমার মানিকটাকে সুখে রাখুক।'

তথ্যসূত্র :

১. আনাসের বাবা এবং মায়ের সাক্ষাৎকার

২. প্রত্যক্ষদর্শী: সহযোদ্ধা আব্দুর রহমান ফাহাদ এবং মুজাহিদুল ইসলামের সাক্ষাৎকার

৩. ভিডিও : গুলিবিদ্ধ অবস্থায় আনাস মাটিতে লুটিয়ে পড়ে থাকার ভিডিও এবং রিকশায় করে আনাসের লাশ বাসায় আনার ভিডিও

তথ্য সংগ্রহে:

মোঃ কামরুজ্জামান এবং মোঃ নাহিদ হাসান সজীব;

স্টোরি মেকিং: মোঃ কামরুজ্জামান এবং ড. মোহাম্মাদ সরোয়ার হোসেন

তাদের মৃত্যুর প্রতিবাদ করতেই আমি আন্দোলনে গিয়েছি

১৬ জুলাই রংপুরে পুলিশের গুলিতে আবু সাঈদের বীরত্বপূর্ণ শাহাদাত এবং পুলিশ ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের হাতে দেশের বিভিন্ন স্থানে আরও কয়েকজন আন্দোলনকারী নিহত হওয়ার পর আপামর ছাত্র-জনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন থেকেই আন্দোলনের পথে যাত্রা শুরু হয় ইয়াসির সরকারের। ১৭ জুলাই আন্দোলন থেকে বাসায় ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেলে মা, বোন, এবং বড় ভাইয়ের প্রশ্নবাণে পড়তে হয় তাকে।

শহীদের নামঃ ইয়াসির সরকার
বয়সঃ ১৭ বছর ৮ মাস (জন্ম- ২০ নভেম্বর ২০০৬)
মৃত্যুর তারিখঃ ৫ আগস্ট ২০২৪
পিতাঃ মো ইউসুফ সরকার
মাতাঃ বিলকিস আক্তার
ঠিকানাঃ শনির আখড়া, ঢাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এইচএসসি (দ্বিতীয় বর্ষ), সরকারি আদমজী নগর এম.ডব্লিউ কলেজ, আদমজীনগর, নারায়ণগঞ্জ

হাফসা (বড় বোন) : তুই এত দেরি করে বাসায় আসলি কেন? আন্দোলনে গিয়েছিলি, তাই না? ইয়াসির : হ্যাঁ হাফসা : ঝামেলা হয়েছিল নাকি? ইয়াসির : আর বলিস না, সবাই ভীতু! লাঠি হাতে কাউকে দেখলেই একত্রে না থেকে যে যার মতো পালিয়ে যায়। আজকে শনির আখড়াতে অনেক শিক্ষার্থী ছিল। আমাদের ওপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে কিছু লোক লাঠি নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখে আমি আর আমার সাথের ভাইটা একনাগাড়ে ইট ছুড়ছিলাম। হঠাৎ পিছনে তাকিয়ে দেখি, আমাদের সাথে কেউ নেই। সবাই অনেক দূরে চলে গেছে। সন্ত্রাসীদের একজনের মুখে ইট পড়ায় সে পিছপা হয়। এরপর ছাত্ররা একসাথে এগিয়ে এসে ওদের ধাওয়া দিয়ে তাড়িয়ে দেয়।

হাফসা : তুই একা একা সামনে গিয়েছিস কেন? মাথা খারাপ নাকি তোর?

ইয়াসির : সবাই যদি ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায়, তাহলে সামনে থাকবে কে?

ইয়াকুব (বড় ভাই) : তুই আন্দোলনে গিয়েছিস কেন? তোর পড়াশোনা অনুযায়ী এখন কি কোনো সরকারি চাকরি পাবি?

ইয়াসির : ভাইয়া, আমি চাকরির জন্য আন্দোলনে যাইনি। দেখছো না, আমাদের ভাইদের কীভাবে অন্যায়ভাবে মারা হচ্ছে? তাদের মৃত্যুর প্রতিবাদ করতেই আমি আন্দোলনে গিয়েছি।

মা : আগামীকাল থেকে তোর আর আন্দোলনে যেতে হবে না।

তারপর ইয়াসিরের বড় ভাই আর কিছুই বলেননি। মা বাধা দেবেন বলে ইয়াসির মাকে কখনো বলত না যে, সে আন্দোলনে যাচ্ছে। ফোন করলে বলত, 'এইতো আম্মু, আমি বাসার সামনেই আছি!'

ইয়াসির এবং তার মায়ের কথপোকথন:

ইয়াসির : আম্মু, দেখছো কতো মানুষ শহীদ হচ্ছে! তারা তো অনেক ভাগ্যবান।

মা : যারা শহীদ হয়, তারা তো চলেই যায়। কিন্তু তাদের মা-বাবার কী অবস্থা হয়! তাদের তো সারাজীবন এই কষ্ট বহন করে বেঁচে থাকতে হয়।

৩৫ জুলাই (৪ আগস্ট)

শেখ হাসিনা সরকার পতনের একদফা দাবিতে অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম দিন। দুপুরবেলা আহত হয়ে ইয়াসির বাসায় ফিরে। হাতে ব্যান্ডেজ দেখে হাফসা জিজ্ঞেস করে,

হাফসা : তোর হাতের এই অবস্থা হলো কীভাবে?

ইয়াসির : রাস্তা দিয়ে একটা অ্যাম্বুলেন্স যেতে দেখে কয়েকজন লোক সেটাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করতে শুরু করে। আমি ঠেকাতে গেলে হাতে লাঠির আঘাত লাগে।

মা : (বরফ দিতে দিতে) বাবা, একটা আঙুলে ব্যথা পেয়ে তুমি এত কষ্ট পাচ্ছো। যারা আন্দোলনে গিয়ে পঙ্গু হচ্ছে, তারা কতটা কষ্ট পাচ্ছে, ভেবেছো? তুমি আর আন্দোলনে যেও না। মায়ের কথা শুনে ইয়াসির হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল, আর কিছুই বলল না।

৩৬ জুলাই (৫ আগস্ট)

সকাল সাড়ে দশটায় মায়ের ডাকে ঘুম ভাঙে ইয়াসিরের। ঘুম থেকে উঠেই ফোন হাতে নিয়ে ফেসবুকে ঢোকে। বড় বোন হাফসা বসা পাশে।

ইয়াসির : হাফসা, ফেসবুক দেখেছিস? দেখ, ঢাকার বাইরে থেকে হাজার হাজার মানুষ ঢাকায় আসছে!

ঠিক তখনই নেট চলে যায়। কিছুক্ষণ পর মা এসে বলেন,

মা : বাবা, বাইরে থেকে আটা আর চিনি নিয়ে আয়।

ইয়াসির আটা-চিনি নিয়ে এসে বলে আম্মু, আমাকে একটু লেবুর শরবত বানিয়ে দাও। মা শরবত বানিয়ে দিলে ইয়াসিন সেটা খেয়ে নেয়। তবে সকালে আর নাস্তা করেনি। বারোটার দিকে মা আর বোনের অনুরোধ উপেক্ষা করে ইয়াসির আন্দোলনের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

হাফসা : ভাই, আজকে আর বের হওয়ার দরকার নাই।

ইয়াসির : ঐদিকে যাচ্ছি না।

মা : বাবা, ঐদিকে যাস না।

ইয়াসির : ঐদিকে যাচ্ছি না।

মা ও বোনের অনুরোধ রাখেনি ইয়াসির। বাসা থেকে বের হয়ে বন্ধুদের সঙ্গে যোগ দেয় স্বৈরাচার পতনের আন্দোলনে। ওইদিন তার বন্ধুরা স্বৈরাচার পতনের আনন্দ উপভোগ করলেও, ইয়াসিরের তা ভাগ্যে ছিল না। ওই দিনের ঘটনাপ্রবাহ স্মৃতিচারণ করে ইয়াসিরের বন্ধু এবং আন্দোলনের সহযোদ্ধা মো. সাকিব (শিক্ষার্থীঃ এইচএসসি-দ্বিতীয় বর্ষ, মাতুয়াইল হাজী আব্দুল লতিফ ভূইয়া কলেজ, ঢাকা) বলেন: 'আমি, ইয়াসির এবং আরো কয়েকজন বন্ধু মিলে ১৭ জুলাই থেকেই প্রতিদিন একসাথে আন্দোলনে যেতাম। ইয়াসির সবসময় আন্দোলনের সামনে থাকত। যখন পুলিশ গুলি শুরু করত, আমরা সবাই পিছনে সরে যেতাম, কিন্তু ও সহজে আসতে চাইত না। ও চেষ্টা করত কোনো এক জায়গায় লুকিয়ে থেকে আবার সবার আগেই ময়দানে উপস্থিত হওয়ার। আন্দোলনের সময় আমাদের অনেক বন্ধু আহত হয়।

৫ আগস্ট, শেখ হাসিনা দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার দিন, আমরা ইয়াসিরসহ আট-নয়জন বন্ধু দুপুর পর্যন্ত একসাথে ছিলাম। আমরা সাড়ে বারোটার দিকে শনির আখড়ায় শনি মন্দিরের গলিতে একত্রিত হই। আমাদের সাথে কয়েকজন সিনিয়র ভাইও ছিলেন। তারপর আমরা ধীরে ধীরে কাজলার পাড় অতিক্রম করি। আমাদের সঙ্গে থাকা অনেক মানুষ কিছুদূর এগোত, আবার পিছিয়ে যেত—এইভাবে চলছিল। দুপুর দুইটার দিকে আমরা শুনতে পেলাম, শেখ হাসিনা হয়তো আজ দেশ ছেড়ে চলে যাবে। তখন নেট পুনরায় চালু হয়। আমরা মজা করছিলাম, হাসছিলাম, আশপাশে ঘুরাঘুরি করছিলাম। তখন ইয়াসির বলল, 'চল সামনে যাই।' আমরা সবাই একসাথে আস্তে আস্তে সামনে এগোতে থাকি। আমরা কুতুবখালির সামনে গিয়ে দাঁড়াই। পুলিশ তখন থানার ভেতর থেকে ফায়ার করছিল। আমরা ধীরে ধীরে আরও সামনে এগিয়ে যাত্রাবাড়ী মাছের আড়তের কাছাকাছি পৌঁছে যাই।

আমাদের সঙ্গে অনেক মানুষ ছিল। একপর্যায়ে তিনটার কিছুক্ষণ আগে, সব পুলিশ একসাথে থানার ভেতর থেকে গুলি করতে করতে বাইরে বের হতে শুরু করে। অনেক মানুষ গুলিবিদ্ধ হতে থাকে। আমরা যে যেভাবে পারি দৌড় দিই। এত গুলি চলছিল যে, আমরা একসঙ্গে থাকতে পারছিলাম না। আমরা দৌড়ে কুতুবখালি পাড় হয়ে যাই। তখন আমাদের সঙ্গে ইয়াসির ছিল না। আমরা আবার আস্তে আস্তে যাত্রাবাড়ী মাছের আড়তের দিকে এগোতে থাকি, দেখার জন্য যে, ওকে খুঁজে পাওয়া যায় কি না। তখন দেখি, শুরুতে ইয়াসিরের মতো কালো টিশার্ট পরা একজন লুকিয়ে বসে আছে। কিছুক্ষণ পর আড়তের দিকে দৌড় দেয়। এমন সময় পুলিশ আবার গুলি শুরু করলে, আমরা পিছু হটি। এরপর ইয়াসিরকে আর দেখি নাই। আমরা ভেবেছিলাম, গুলি থামার পর সে বাসায় চলে গেছে।'

দুপুর আড়াইটার দিকে ইয়াসিরের বড় বোন হাফসা খবর পান, অবশেষে দেশ স্বৈরাচারমুক্ত হচ্ছে। কিন্তু মনে অস্থিরতা, ইয়াসির ফোন ধরছে না। চারপাশে এত খুশির মাঝেও মনের ভেতর ভয় ঢুকে গেল। ফোনের পর ফোন দিচ্ছেন, কিন্তু তিনটার পর থেকে ফোন বন্ধ। সন্ধ্যা ছয়টা বেজে গেল, এখনো ইয়াসিরের ফোন বন্ধ। তখন হাফসা তাদের এলাকার ফেসবুক গ্রুপে পোস্ট দেন: 'আমার ছোট ভাই, ইয়াসির। দুপুর থেকে ওকে ফোনে পাচ্ছি না। কেউ দেখে থাকলে যোগাযোগ করতে বলবেন প্লিজ।'

এরপরের ঘটনা শুধুই কষ্টের আর বেদনার। হাফসা সে সময়ের স্মৃতিচারণ করে বলেন: 'আমি গ্রুপে পোস্ট দেওয়ার পর অনেকেই কমেন্টে বলছিল, কোনো হাসপাতালে দেখতে। আবার কেউ কেউ কমেন্টে লাশের ছবি দিচ্ছিল। তাদের এসব

কমেন্ট দেখে খুব রাগ হচ্ছিল, এই ভেবে যে, দুপুরেই আমার ভাইটা বাসা থেকে বের হলো। আমি ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারছি না বলে পোস্ট দিয়েছি, আর কিছু মানুষ আমাকে লাশের ছবি দিয়ে জিজ্ঞাসা করছে, এইটা আমার ভাই কি না!

বড় ভাইয়া আশপাশের হাসপাতালগুলোতে খুঁজে দেখলেও ইয়াসিরকে পাওয়া যায়নি। রাত প্রায় এগারোটার দিকে সেই পোস্টের কমেন্টে একজন আমাকে ইয়াসিরের লাশের ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এইটা আপনার ভাই কিনা?' মুহূর্তেই ছবিটা দেখে থ হয়ে গেলাম। কোনোভাবেই মানতে পারছিলাম না, এটাই আমাদের ইয়াসির। এইটা যেনো ইয়াসির না হয়। বড় ভাইয়াকে ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভাইয়া, এইটা কি আমাদের ইয়াসির?' ভাইয়া বলল, 'এই ছবি কোথায় পেলি? এইটাই তো আমাদের ইয়াসির।' তাৎক্ষণিক সেই আপুর সাথে যোগাযোগ করে জানতে পারি, আমার ভাই ঢাকা মেডিকেলের মর্গে আছে। কিছু সময়ের জন্য যেনো দুনিয়াটা অন্ধকার হয়ে গেল। ভাইয়ের কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হলাম। চোখে অনবরত পানি পড়ছে। মনে মনে দোয়া করছিলাম, 'আল্লাহ, ছবিতে যা দেখেছি সব যেন মিথ্যা হয়। গিয়ে যেন দেখি আমার ভাই সামান্য একটু চোট পেয়েছে। আমরা যাওয়া মাত্রই যেন সুস্থ হয়ে যায়।'

ছবি: ইয়াসিরের নিথর দেহ

পৌঁছে দেখি, মেঝ ভাই দাঁড়িয়ে কান্না করছে। আমার মাথা এলোমেলো হয়ে গেল। মনে হলো, আমি কোনো দুঃস্বপ্ন দেখছি, চোখ খুললেই দুঃস্বপ্ন শেষ হয়ে যাবে। চোখ বন্ধ করে ভাবতে চাইলাম, এইটা আসলেই একটা দুঃস্বপ্ন। এইতো, মনে হচ্ছে

ইয়াসির আমাকে ডাকছে, হিহি করে হাসছে! পরক্ষনেই চোখ খুলতেই মনে হলো, নাহ আমি কোন স্বপ্নে নেই। ভয়াবহ এক বাস্তবতার সামনে দাঁড়িয়ে আছি।

খুনসুটি আর ঝগড়া ঝাটিতে ভাইকে কখনো জড়িয়ে ধরা হয়নি। সেদিন ভাইকে জড়িয়ে ধরলাম। গালে স্পর্শ করতেই অনুভব করলাম মুখটা একদম ঠান্ডা হয়ে গেছে। হাত ধরতেই দেখলাম, হাতটা শক্ত, বুঝতে পারলাম, আমার ভাইটা আল্লাহর কাছে চলে গেছে। তাও ইয়াসির ইয়াসির বলে ডাকলাম, যদি সাড়া দেয়! কিন্তু নাহ, আজকে আর সাড়া দিল না। ভাইয়ের ডান হাতে দেখলাম কালিমা তাইয়্যিবা লেখা একটা পতাকা, যেটা আন্দোলনের সময় কিনেছিল। মাথায় পড়তে মানা করেছিলাম বলে হাতে পড়েছিল। এইটা হাতে থাকা অবস্থাতেই সে আল্লাহর কাছে চলে গেল। বুকের একপাশে গুলি, অন্যপাশে ব্যান্ডেজ। পিঠ থেকে রক্ত ঝরছে। ভাইয়ের তাজা রক্ত মাটিতে পড়ছে! গোসল করানোর সময়ও ওর রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়নি। আমার ভাইকে মেজো ভাই গোসল করিয়েছে। গোসলের পর জানতে পারলাম, আমার ভাইয়ের শরীরে তিনটি গুলি লাগছে। বুকের দুপাশে দুইটা আর মেরুদণ্ডে একটা। বুকের বাম পাশের গুলিটা একপাশ দিয়ে ঢুকে আরেকপাশ দিয়ে বড় ছিদ্র করে বের হয়ে গেছে। আমার ভাইকে চিরদিনের জন্য আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিল। দূরত্বটা আকাশ সমান। যেখান থেকে কেউ ফিরে আসে না। ভাই নেই ভাবলেই দুনিয়াটা শূন্য মনে হয়। শখের স্বাধীনতা, শখের দেশ—সবকিছুই আছে। শুধু আমার ভাই নেই।'

ভিডিওঃ ঘাতকের বুলেট ইয়াসিরের দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়

ইয়াসিরের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তার বড় ভাই ইয়াকুব সরকার বলেন: 'ইয়াসির গরীব, ক্ষুধার্তদের সাহায্য করার চেষ্টা করত। আন্দোলনের সময় একদিন দুপুরে রিকশায় বাসায় ফেরার পথে রিকশাওয়ালাকে ক্লান্ত দেখে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে, উনি দুপুরের খাবার খায়নি। তখন রিকশাওয়ালাকে বাসায় এনে খাবার খাওয়ায়। সাইক্লিংয়ের প্রতি তার খুব আগ্রহ ছিল। খাবার খেতে বসে মুখে খাবার দিতো আর বড় বোনকে বলত 'এইসব কী রান্না করেছিস, ভালো হয়নি।' 'ভালো না হলে খাচ্ছিস কেন? খাবি না।' তখন বলত, 'আমি না খেলে তোর বানানো সব খাবার নষ্ট হয়ে যাবে, তাই খাচ্ছি।' বাহির থেকে বাসায় ফিরেই বলত, 'আম্মু, লেবুর শরবত বানিয়ে দাও।' মিষ্টি খাবার অনেক পছন্দ করত। আম্মু এখন কোনোকিছু বানালেই বলেন, 'ইয়াসির এটা পছন্দ করত।'

ইয়াসির ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র হলেও দিন দিন বড়দের মতো দায়িত্বশীল হয়ে উঠেছিল। বাবা-মায়ের দেখাশোনা কিংবা পরিবারের কোনো প্রয়োজনে, সবার কাছে সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য ছিল ইয়াসির। ইয়াসিরের কথা স্মরণ করে কান্নাভেজা কণ্ঠে তার মেজো ভাই ইয়াহিয়া সরকার বলেন: 'আমি মাদরাসার খেদমতে ব্যস্ত থাকি। আর বড় ভাই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে চাকরিরত আছেন। আমাদের বাড়ির দেখাশোনা, ভাড়া তোলা, বাজার করা, আব্বুর ঔষধ আনা, আব্বু-আম্মুকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া—এই সবকিছুই ইয়াসির করত। আসলে আব্বুর ভরসার লাঠিটাই ভেঙে গেছে।

আব্বু আগের চেয়ে অনেক বেশি দুর্বল হয়ে গেছেন। ইয়াসির যখন আব্বুকে নিয়ে বাইরে যেত, সবসময় উনার পাশে থাকত এবং দেখে রাখত। আব্বু এখনো বলেন, 'রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময়, মাঝে মাঝে মনে হয়, ইয়াসির আমার সামনে দিয়ে হাঁটছে।' 'আন্দোলনে শহীদ হওয়া বাকি সবার মতোই আমার ভাই একজন শহীদ বীর। আল্লাহ যেন আমার ভাইয়ের শাহাদাতকে কবুল করেন, তাকে শহীদের মর্যাদায় সমুন্নত করেন এবং জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেন। ইয়াসিরের সঙ্গে শহীদদের নিয়ে মায়ের সেই কথাটা বাবা-মাকে দেখলে খুব অনুভব করি, 'যারা শহীদ হয়, তারা তো চলেই যায়। কিন্তু তাদের মা-বাবার কী অবস্থা হয়! তাদেরতো সারাজীবন এই কষ্ট বহন করে বেঁচে থাকতে হয়।'—শহীদ ইয়াসিরের বোন হাফসা বুশরা।

তথ্যসূত্র:

১. ইয়াকুব সরকার (ভাই), ইয়াহিয়া সরকার (ভাই) এবং হাফসা বুশরা (বোন)-এর সাক্ষাৎকার

২. প্রত্যক্ষদর্শী: ইয়াসিরের বন্ধু এবং আন্দোলনের সহযোদ্ধা মোঃ সাকিব-এর সাক্ষাৎকার

৩. ভিডিও: ইয়াসিরের লাশের ক্ষতচিহ্নের ভিডিও।

তথ্য সংগ্রহে:

মোঃ কামরুজ্জামান;

স্টোরি মেকিং: মোঃ কামরুজ্জামান এবং ড. মোহাম্মাদ সরোয়ার হোসেন

‘তুই শহীদ হইলে তো আমরাও ভাগ্যবান’

শহীদের নাম: খুবাইব আহমাদ
বয়স: ২৫ বছর ৫ মাস (জন্ম ৫ মার্চ ১৯৯৯)
মৃত্যুর তারিখ: ৫ আগস্ট ২০২৪
পিতা: মাওলানা আব্দুর রহমান
মাতা: আবিদা সুলতানা
ঠিকানা: কাজলার পাড়, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
শিক্ষা: দাওরা হাদিস, জামিয়া ইবরাহিমিয়া ইসহাকিয়া কাজলার পাড় মাদরাসা।

‘আম্মা, আমার নাম না আব্বায় খুবাইব রাখছে, খুবাইব রা. তো শহীদ হইয়া মারা গেছেন। আমনে আমার লাইগা দোয়া কইরেন, আমিও যেন শহীদ হই। মার দোয়া তো কবুল হয়। আল্লাহ আমারে যেন শহীদ হিসেবে কবুল করে।’ ‘তুই শহীদ হইলে তো আমরাও ভাগ্যবান, আমরা শহীদের বাপ-মা হবো।’—মা এবং সন্তানের এই কথোপকথন হয় ৪ আগস্ট ২০২৪-এ।

সুহাইল আহমাদ এবং খুবাইব আহমেদ, দুই ভাই মাদরাসার শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও কোটা সংস্কার আন্দোলনের শুরু থেকেই শনির আখড়া এবং যাত্রাবাড়ী পয়েন্টে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আন্দোলনের দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সুহাইল আহমাদ (বড় ভাই) বলেন: ‘সাধারণ জনগণ, বিশেষত ইসলাম এবং আলেম-ওলামার ওপর ফ্যাসিস্ট হাসিনা যেভাবে নির্যাতন চালাচ্ছিল, খুবাইব এর থেকে পরিত্রাণ চাইত। কীভাবে হাসিনার জুলুম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে তা নিয়ে মাদরাসার সহকর্মী এবং পরিচিতদের সঙ্গে প্রায়ই আলোচনা করত। আন্দোলন চরম আকার ধারণ করার পর সে মাদরাসার উস্তাদদের বলত, ‘আমি মনে হয় শহীদ হইয়া যামু। জুলাই আন্দোলনের শুরু থেকেই আমরা দুই ভাই একসাথে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতাম। আবু সাঈদ এর মৃত্যুর আগ থেকেই আমরা শনির আখড়া এবং যাত্রাবাড়ির বিভিন্ন কর্মসূচিতে যুক্ত থাকতাম। ‘ব্লকেড’

কর্মসূচিগুলোতে অংশগ্রহণ শেষে একসাথে ফিরে আসতাম। অবশ্য কয়েকদিন খুবাইব আমাকে ছাড়াই অন্যদের সঙ্গে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে।'

খুবাইবের মনে ছিল ফ্যাসিবাদ এবং জুলুমের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ। তিনি ছিলেন জালিমের বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং জুলুমের প্রতিবাদী এক নির্ভীক কর্মী। ৪ আগস্ট, যাত্রাবাড়ী এলাকায় পুলিশের ধাওয়া খেয়ে তিনি আশ্রয় নেন এক টং দোকানে। সেখানেই তার দেখা হয় মাসুদ আজহারের সঙ্গে। মাসুদ আজহার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন: 'আমি ঢাকার উত্তর যাত্রাবাড়ীর কলাপট্টির জামিয়াতুল মা'আরিফ আল ইসলামিয়াতে উসুলুল ফিকহ নিয়ে পড়াশোনা করছি। আমাদের মাদরাসাটি যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তার পাশে, একদম প্রধান পয়েন্টে অবস্থিত। সরকার যখন নির্বিচারে মানুষ হত্যা শুরু করে, তখন থেকেই আমরা সক্রিয় হই। আমরা প্রতিদিন বিকেলে, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবারের ছুটির দিনগুলোতে প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নিতাম। তবে আমাদের তুলনায় অন্যান্য মাদরাসার ছাত্ররা আন্দোলনে আরও বেশি সক্রিয় ছিল। যাত্রাবাড়ী এলাকার আন্দোলনে মাদরাসার ছাত্রদের ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

জুলাইয়ের শেষ ছয় দিন, অর্থাৎ ৩১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত, আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে দিনভর আন্দোলনে সক্রিয় ছিলাম। উস্তাদরা আমাদের কৌশল শিখিয়ে প্রস্তুত করতেন। ৩ আগস্ট, আমাদের মাদরাসার ছাত্র আবদুল্লাহ আল মামুন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারাত্মকভাবে আহত হয়। রাতের বেলা আমরা ক্যাম্প বসিয়ে ট্রেনিং করতাম। ট্রেনিংয়ে শেখানো হতো কীভাবে টিয়ারশেল উল্টো করে ছুড়ে মারতে হয় এবং পুলিশের সরাসরি মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকতে হয়। এছাড়াও শেখানো হতো বিভিন্ন বুলেট থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়। রাতের ট্রেনিংয়ে আরও অন্তর্ভুক্ত ছিল কিভাবে আন্দোলনে নেতৃত্বে দিতে হয়, ঐক্যবদ্ধ থাকতে হয়, মিছিল করতে হয়, স্লোগান দিতে হয়, এবং দূরের কাউকে সাহায্য করতে হয়। ফিল্ড লেবেলে আন্দোলনকারী অনেক ছিল কিন্তু নেতৃত্বে দেওয়ার মতো মানুষ কম ছিল। এসব বিষয়ে আমরা প্রশিক্ষণ করাতাম। আর দিনের বেলা আন্দোলনে নামতাম। সাধারণত দেখা যেত, বিভিন্ন জায়গা থেকে বিক্ষিপ্তভাবে লোকজন আন্দোলনে অংশ নিত, এবং তারা প্রায়শই অগোছালো ও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকত। আমরা এই বিক্ষিপ্ত লোকজনকে একত্র করে একটি জায়গায় নিয়ে আসতাম। তাদের সংগঠিত করে নেতৃত্ব দিতাম, কারণ সাধারণত নেতৃত্বের অভাব ছিল খুবই প্রকট। যে কেউ নেতৃত্ব দিতে পারত না। কলাপট্টি এলাকার কাঠের দোকান থেকে কাঠের শিট নিয়ে আমরা ঢাল বানাতাম এবং তা ব্যবহার করতাম পুলিশের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে।

৪ আগস্ট, যথারীতি যাত্রাবাড়ী জনপথ মোড় এলাকায় আন্দোলনে অংশ নিই। সেদিন আমরা ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার মধ্যে পড়ে পাশের গলিতে সরে যাই এবং একটি ছোট চায়ের দোকানে আশ্রয় নিই। দোকানে প্রবেশ করে খুবাইব এবং আরও কয়েকজনকে দেখতে পাই। আমি খুবাইবকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কেমন আছেন? এখানে কখন আসলেন?' খুবাইব জানাল, তারা দশ মিনিট আগে পুলিশের ধাওয়া খেয়ে পালিয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছে। তার সঙ্গে আরও কয়েকজন ছিল, যারা প্রতিদিন আন্দোলনে একটি গ্রুপ হয়ে আসত। তারা অনেক দূর থেকে এসে আন্দোলনে অংশ নিত। খুবাইবের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তার মধ্যে ভয় এবং আতঙ্ক দেখতে পেলাম। কিন্তু সেই ভয়কে ছাপিয়ে তার ভেতরে এক অদম্য জজবা, এক অনন্য চেতনা ছিল। ফ্যাসিবাদ এবং জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সেই চেতনা সেদিন খুবাইবের চেহারায় স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল। তার চোখেমুখে ছিল প্রচণ্ড রাগ এবং ক্ষোভ। সেদিন অল্প সময়ের সেই সাক্ষাতে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, খুবাইব সত্যিই সংগ্রামী এবং জালিমের বিরুদ্ধে সোচ্চার একজন কর্মী।

আমরা তখনও বের হতে সাহস পাচ্ছিলাম না, কারণ ভয় ছিল, পুলিশ আমাদের দেখে ফেলতে পারে। কিন্তু খুবাইব বারবার বের হওয়ার পরিকল্পনা করছিল। কীভাবে আশপাশে লুকিয়ে থাকা ছাত্রদের একত্রিত করে সামনে এগোনো যায় এবং আবার ইট-পাথর জোগাড় করে পুলিশের দিকে ছোড়া যায় সেই কৌশল ভাবছিল। এরপর আমরা ওই দোকানে হালকা নাস্তা করি। কিন্তু খুবাইব ও তার সঙ্গীরা আবার আন্দোলনে ফিরে যায়। সেদিন খুবাইবের সঙ্গে সেটাই আমার শেষ দেখা। এরপর তার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। সেদিন আন্দোলন এভাবেই চলতে থাকে। ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার পর আমরা কয়েকজন আহত ছাত্রকে পাশের জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাই। পরে মাদরাসায় ফিরে বিকেলবেলা আন্দোলনরত ছাত্রদের মধ্যে পানি বিতরণ এবং অন্যান্য সেবামূলক কাজে যুক্ত হই। এভাবেই সেদিনের আন্দোলন শেষ হয়।'

৩৬ জুলাই, ২০২৪ (৫ আগস্ট, ২০২৪)

গত বিশ দিন ধরে স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরাসরি নির্দেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের হামলায় সারাদেশে হাজারেরও বেশি ছাত্র-জনতার প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। ৫ আগস্ট সকাল থেকেই পুরো বাংলাদেশ উৎকণ্ঠায়। আজ কী হতে চলেছে? এত রক্তের বিনিময়েও কি এই দেশ রক্তখেকো খুনির হাত থেকে রেহাই পাবে না? কয়েক সপ্তাহে শত

শত প্রাণহানির পরও ৫ আগস্ট 'লং মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচিতে অগণিত মানুষ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও করতে মিছিল নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। তাদের প্রত্যাশা—অবশেষে হয়তো কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসছে।

সুহাইল আহমাদ প্রতিদিন ছোট ভাইকে নিয়ে আন্দোলনে গেলেও ওই দিন একা একাই বাসা থেকে বের হন। সকালবেলার ঘটনা স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, 'আমি সবসময় আমার ভাইরে নিয়া আন্দোলনে যাইতাম। ঐদিন আমি একবার গেছি হের রুমের দরজার সামনে। ভাবছি, দরজায় নক করমু। আমি চাইছি হেরে নিয়া বাহির হইতে। হে হের রুমে শুইয়া রইছে। আর করাগাত করিনাই। থাক, হে ঘুমাক। আমি একা একাই বের হইয়া গেছি। আমাদের মাদরাসার এক উস্তাদরে নিয়া গেছি। পরে আমার ভাই ঘুম থেকে উঠছে। ঘুম থেকে উঠে আমাদের ড্রাইভাররে নিয়া যাত্রাবাড়ির দিকে রওনা দিছে। যাওয়ার সময় খুবাইব এর সাথে আমাদের মাদরাসার মুরুব্বী হাফেজ সাহেব হুজুরের সাথে দেখা হইছে। হুজুর ভাইরে জিজ্ঞাসা করছে, 'খুবাইব ভাই কই যাইতেছেন?' আমার ভাই বলছে, 'যাত্রাবাড়ী যাইতেছি।' হুজুর ভাইকে সতর্ক করে বলেন, 'যাত্রাবাড়ির দিকে গুলাগুলি হইতেছে। একটু হুশে চইলেন।' আমার ভাই কয়, 'আমি তো শহীদ হইতে যাইতেছি।' হুজুরের সাথে এটাই শেষ কথা।' ওই দিন শেখ হাসিনার পতনের পূর্ব মুহূর্তে যাত্রাবাড়ী থানার সামনে ঘটে এক ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ। নির্বিচারে পাখির মতো গুলি করে মানুষ হত্যা করা হয়। বুলেটের মুহুর্মুহু আওয়াজে চারপাশে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। মানুষের আর্তনাদ ও কান্নায় ভারী হয়ে ওঠে আশেপাশের পরিবেশ। প্রাণ বাঁচানোর জন্য মানুষ প্রাণপণ ছুটছিল। ঐ দিন যাত্রাবাড়ী থানার সামনে পুলিশের গুলিতে খুবাইব মৃত্যুবরণ করেন।

International Truth and Justice Project নামক একটি সংগঠন ২০২৪ সালের ৫ই আগস্ট ঢাকার যাত্রাবাড়ী পুলিশ স্টেশনের বাহিরে ব্যাপক গুলিবর্ষণের ঘটনার ফরেনসিক বিশ্লেষণ তৈরি করে। মোবাইল ফোন এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে প্রাপ্ত ফুটেজগুলো সংগ্রহ ও যাচাই করে তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা ওই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে একটি তথ্যচিত্র তৈরি করে। উক্ত তথ্যচিত্রের একটি অংশে শহীদ খুবাইবের শেষ মুহূর্তগুলো ফুটে ওঠে। সেই তথ্যচিত্রের আলোকে যাত্রাবাড়ী থানার সামনে নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞের ঘটনাটি উপস্থাপন করা হলো।

ভিডিওঃ ৫ আগস্ট যাত্রাবাড়ী থানার সামনে পুলিশ হত্যাযজ্ঞ চালায়

যাত্রাবাড়ী থানার সামনে নির্বিচারে হত্যা

৫ই আগস্ট, ২০২৪। দুপুর ২টার ঠিক আগে মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার ঘেঁষে যাত্রাপথে যাত্রাবাড়ী থানার পাশ দিয়ে একটি মিছিল অতিক্রম করছিল। এ সময় দাঙ্গা দমনের পোশাক পরা বিপুল সংখ্যক পুলিশ থানার বাইরে এসে বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে শুরু করে। নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীরা আতঙ্কে পালানোর চেষ্টা করলেও মাত্র কয়েক মিটার দূর থেকে একাধিক পুলিশ ১২গেজ পাম্প অ্যাকশন শটগান ব্যবহার করে বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। পরবর্তীতে, গুলির ক্ষতচিহ্ন পরীক্ষা করে অস্ত্র বিশেষজ্ঞরা শিসার প্লেট ভর্তি জীবননাশক কার্তুজ ব্যবহারের প্রমাণ পান। এর মিনিটখানিক পর কিছু পুলিশ সদস্য হাঁটু গেঁড়ে বিক্ষোভকারীদের দিকে নিশানা করে গুলি করতে থাকে। অস্ত্র বিশেষজ্ঞরা তাদের কয়েকজনের অস্ত্রগুলিকে চাইনিজ টাইপ ৫৬, AK প্যাটার্ন রাইফেল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

তিন মিনিট পর, তিনটি জিপে করে সেনা সদস্যদের একটি দল উপস্থিত হয়। তখন পুলিশ সদস্যরা থানার ভেতরে ফিরে যায়। সে সময় সেনাসদস্যরা তাদের অস্ত্র নিচু রেখে শান্তভাবে জনতার দিকে এগিয়ে যায়। এর দুইদিন আগে সেনাবাহিনী ঘোষণা করেছিল যে তারা জনগণের পাশে থাকবে।

বেলা ২টা ৫ মিনিটে সেনা সদস্যরা বিক্ষুব্দ জনতার ছোট একটি দলের সাথে সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে কথা বলতে থাকে। এরই মধ্যে কিছু বিক্ষোভকারী অন্তত দুটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। সেনাবাহিনী সবাইকে নিজ নিজ স্থানে থাকার অনুরোধ জানায়। কিন্তু দুই মিনিট পর, সৈন্যরা থানার দিকে সরে আসতে উদ্যত হলে বিক্ষোভকারীরা তাদের পিছু নেয়। তখন সৈন্যরা তাদের থামিয়ে দেয়। ইতিমধ্যে আরও জনতা মিছিল করে এসে জড়ো হতে থাকে। বেলা দুইটা বিশ মিনিট নাগাদ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনগামী মিছিল থেকে অনেকেই থানার সামনে এসে জড়ো হয়ে যায়। থানার প্রবেশপথে সৈন্যদের একটি ছোট দল পাহারা দিচ্ছিল। তখনও তারা জনতাকে শান্ত রাখতে চেষ্টা করছিল। সৈন্যদের কেউ কেউ বিক্ষোভকারীদের থানার সামনে থেকে সরে যেতে ইশারা করে এবং থানার ভেতরে অবস্থানরত পুলিশকে তাদের স্থানে থাকার জন্য বলে। এর ১৬ মিনিটের ভিতর থানার সামনে আরও বিক্ষোভকারীরা জমা হয়। কিন্তু সৈন্যরা থানার সামনে তাদের অবস্থান ধরে রাখে। এ সময় বিক্ষোভকারীরাও শান্তভাবে অবস্থান করছিল। থানার ভেতরে থাকা পুলিশ এবং বাইরের জনতার মাঝখানে তখনও এক সারি সৈন্য থানার প্রবেশমুখে দাঁড়িয়ে ছিল। এ সময় থানার ভেতর থেকে একজন পুলিশ সদস্য উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে

হেঁটে আসেন। তিনি সৈন্য ও বিক্ষোভকারীদের দিকে মুখ করে থাকা দুই পুলিশের পেছনে দাঁড়ান। তাকে দেখে মনে হয়, তিনি যেন কিছু একটা করার জন্য অপেক্ষা করছেন। এরই মধ্যে পেছনে থাকা পুলিশ সদস্যারা এগিয়ে আসতে শুরু করে। একজন অফিসার তাদের সামনে আসার জন্য হাত দিয়ে ইশারা করতে থাকে।

হঠাৎ, সামনে অপেক্ষমাণ পুলিশ সদস্য প্রবেশমুখে পাহারারত সৈন্যদের ওপর দিয়ে জনতার দিকে একটি গ্রেনেড ছুড়ে মারেন। অস্ত্র বিশেষজ্ঞরা এটিকে 'ডিলে ফিউজড স্টান গ্রেনেড' বা 'ডিজঅরিয়েন্টেশন গ্রেনেড' হিসেবে শনাক্ত করেছেন। গ্রেনেডের ফিউজ থেকে সৃষ্ট ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যায়। চার সেকেন্ডের মাজে গ্রেনেড বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের ঢাক্কায় আশপাশের এলাকা বেশ দূর পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। এর মাজে থানার ভিতর নেতৃত্বস্থানী সাদা পোষাকে এক ব্যাক্তি হাত তুলে পুলিশকে অবস্থান ধরে রাখার নির্দেশ দেন। গ্রেনেড বিস্ফোরণে সঙ্গে সঙ্গে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। বিপুল সংখ্যাক পুলিশ নির্বিচারে গুলি করতে করতে থানা থেকে বের হতে থাকে। জীবন বাঁচাতে জনতা দিকবিদিক ছুটতে থাকে। যেন এ এক যুদ্ধক্ষেত্র।

দুপুর দুইটা ছয়চল্লিশ মিনিটের দিকে থানার সামনে এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখা যায়— জীবন বাঁচাতে কেউ ফ্লাইওভারের পিলারের নিচে আশ্রয় নিচ্ছেন, কেউ দৌড়ে পালাচ্ছেন। আর পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালিয়ে মানুষ হত্যা করছে। একপর্যায়ে গুলাগুলির মধ্যেই থানার ভেতর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসেন দুইজন ব্যক্তি। পুলিশ তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। তাদের মধ্যে সাদা টুপি পরা একজনের শরীরে শর্টগানের গুলি এসে আঘাত করে। তিনি জীবন বাঁচাতে হামাগুড়ি দিয়ে দ্রুত দেয়ালের আড়ালে চলে যান। থানার বাম পাশে দুজন মাটিতে পড়ে ছিলেন। তারা তখনও জীবিত ছিলেন। তবে এর কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশের গুলি এসে লাগে একজনের পায়ে। গুলির আঘাতে তার পায়ের পাতা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এক মিনিট পর, আহতদের নিথর দেহ পাশ কাটিয়ে রাস্তায় নেমে আসে পুলিশ। তারা ফ্লাইওভারের পিলারের পেছনে আশ্রয় নেওয়া মানুষদের দিকে গুলি ছুঁড়তে থাকে। রাস্তার আরেকটু দূরে অন্যরাও প্রাণ ভয়ে হামাগুড়ি দিয়ে দূরে সরে যেতে থাকে।

পুলিশের দাঁড়ানোর ভঙ্গি ও আচরণ দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় তারা নিজেদের ওপর কোনো আক্রমণের আশঙ্কা তাদের নেই। অবিরাম গুলিবর্ষণ ও প্রহার চলতে থাকে বেশ কয়েক মিনিট ধরে। পুলিশ সদস্যরা নিরস্ত্র আটকে পড়া মানুষের দিকে অবিরাম গুলি চালিয়ে যাচ্ছিল। আহত একজন ব্যক্তিকে লাঠি দিয়ে বারবার আঘাত করা হয়, এরপর তার মাথায় লাথি মারা হয়। তার পাশে পড়েছিল মৃত আর আহত ব্যক্তিরা।

দুপুর দুইটা আটচল্লিশ মিনিটের দিকে একদল পুলিশ সদস্য ফ্লাইওভারের নিচে আশ্রয় নেওয়া দুই তরুণকে একদম কাছ থেকে একের পর এক গুলি করতে থাকে। লাল শার্ট পরিহিত এক ব্যক্তি একাধিক গুলিবিদ্ধ হয়ে পিলারের মেঝেতে পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকেন। দ্বিতীয় ব্যক্তিও আহত হন, কিন্তু একজন পুলিশ অফিসার তাকে বেরিয়ে আসতে ইশারা করেন। তখন আরেকজন পুলিশ সদস্য তাকে বন্দুক দিয়ে আঘাত করলেও প্রথম অফিসার তাকে হাতের ইশারায় পালিয়ে যেতে বলেন এবং সহকর্মীদের গুলি না করার ইশারা করেন। এদিকে, একই সময়ে আরেক তরুণ গলির দিকে দৌড় দিলে অন্য পুলিশ সদস্যরা তাকে ধাওয়া করে। তারা ক্রমাগত তার দিকে গুলি ছুড়তে থাকে। পরবর্তীতে পলায়নরত বিক্ষোভকারী লাশ সেই গলিতেই পাওয়া যায়।

তিনটা বাজতে নয় মিনিট বাকি (দুপুর দুইটা একান্ন মিনিট)। এমন সময় সাদা আলখেল্লা পরিহিত এক ব্যক্তিকে মারতে শুরু করে পুলিশ। রাইফেলের বাট ও লাঠি দিয়ে তাকে পেটাতে থাকে। তিনি ছুটে দৌড় দিলে কয়েকজন পুলিশ পিছু নেয় আর শর্টগান দিয়ে তাকে লক্ষ্য করে গুলি করতে থাকে। এ সময় তিনি দৌড়ে পিলারের অন্যপাশে পৌঁছালে অন্য পুলিশরা আরও সূক্ষ্ম নিশানায় রাইফেল দিয়ে তার দিকে গুলি করা শুরু করে। সাদা আলখেল্লা পড়িহিত ওই ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় পড়ে যায়। তার নিথর দেহ রাস্তায় পড়ে থাকে। মৃত দেহের সংখ্যা বাড়তে থাকে। একজন পুলিশ সদস্য থানার সামনে একটি দেহকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে। গুলির তীব্রতা কমে আসলে বেঁচে যাওয়া ভীতসন্ত্রস্ত হতবিহ্বল ব্যক্তিরা একটি সরু গলিতে আহত ও মৃতদের সাহায্য করতে শুরু করে। আহত-মৃতদের উদ্ধারের কাজ শুরু করে অনান্যা মানুষজনও। নিহতদের একজনের নাম ইয়াসির সরকার। কলেজ ছাত্র শহীদ ইয়াসিরের বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর। আর সাদা আলখেল্লা পরিহিত ব্যক্তি, যাকে রাইফেলের বাট ও লাঠি দিয়ে পিটানোর পর গুলি করে শহীদ করা হয়, তিনিই ছিলেন খোবাইব আহমাদ।

ছবিঃ হাশপাতালের বারান্দায় নিহত খুবাইবের লাশ

নিহতদের উদ্ধার করার পর ভ্যানের ওপর স্তূপ করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই করুণ দৃশ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রত্যক্ষদর্শী আসিফ বলেন—‘৫ই আগস্ট, শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালানোর পর, আমরা নারায়ণগঞ্জ স্টেডিয়াম এলাকা

থেকে বিজয় উদযাপন করার জন্য গণভবনের দিকে রওনা দেই। আমি শনির আখড়া ঢালের বেশ আগেই নেমে পড়ি। তখন সাড়ে তিনটা বাজে। সেখানে গিয়ে দেখি, অনেক মানুষের জটলা। জটলার ভেতরে একটা ভ্যান গাড়িতে প্রচুর লাশ—একটার পর একটা স্তূপ করে রাখা। আমি এই দৃশ্য দেখে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না—এসব লাশ কোথা থেকে এলো? স্বৈরাচারের পতন ইতোমধ্যেই হয়ে গেছে, শেখ হাসিনা পালিয়ে গেছে। তাহলে এই মুহূর্তে আবার লাশের হিসাব আসছে কেন? ওই ভ্যানটি সাইনবোর্ডের দিকে যাচ্ছিল, আর আমি বিপরীত দিক থেকে আসছিলাম। এরপর সামনে এগিয়ে মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারের নিচ দিয়ে যাত্রাবাড়ী মোড়ের দিকে এগোতে থাকি। যাত্রাবাড়ী মোড়ের কাছাকাছি পৌঁছাতেই দেখি, পুলিশ প্রচুর গুলি চালাচ্ছে! তখনই লাশের বিষয়টি পরিষ্কার হতে শুরু করল এবং আগে দেখা লাশগুলোর হিসাব মিলতে শুরু করে।'

ঢাকা মেডিকেলের বারান্দায় লাশের স্তূপে শহীদ খুগুলিবিদ্ধ লাশ

খুবাইবের শরীরে গুলিবিদ্ধ হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই তার পরিবার খবর পায়—সে এবং তাদের ড্রাইভার গুলিবিদ্ধ হয়েছে। পরে পরিবার ড্রাইভারকে মুগদা হাসপাতালে খুঁজে পেলেও খুবাইবকে খুঁজে পাচ্ছিল না। ড্রাইভারের হাতে গুলি লেগে হাত ছিদ্র করে বের হয়ে গেছে। পরবর্তীতে অনেক খোঁজাখুঁজির পর, মাগরিবের পর ঢাকা মেডিকেলের মর্গের সামনের বারান্দায় খুবাইবের নিথর দেহ পাওয়া যায়। খুবাইবের কিডনির পাশে একটি বড় গুলি লেগেছিল। রাত সাড়ে দশটায় জামিয়া ইবরাহিমিয়া ইসহাকিয়া কাজলার পাড় মাদরাসার মাঠে জানাজার পর শহীদ খুবাইবকে দাফন করা হয়। খুবাইব চেয়েছিলেন শহীদী মৃত্যু, আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. খুবাইবের ভাই (সুহাইল আহমাদ)-এর সাক্ষাৎকার

২. প্রত্যক্ষদর্শী মাসুদ আজহার এবং আসিফ-এর সাক্ষাৎকার

৩. গুলিবিদ্ধ হওয়ার ভিডিও ফুটেজ

তথ্য সংগ্রহে:

মোঃ কামরুজ্জামান;

স্টোরি মেকিং: মোঃ কামরুজ্জামান এবং ড. মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন

ও আমার বন্ধু। ওকে বাঁচান, ও এখনো জীবিত আছে

ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আন্দোলনে সহযোদ্ধা এবং মৃত্যুর প্রত্যক্ষদর্শী আবুল কালাম আজাদের জবানিতে শহীদ মাহবুবুল হাসানের জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো তুলে ধরা হলো—

শহীদের নাম : মাহবুবুল হাসান মাসুম
বয়স: ২৫ বছর (জন্ম, ২৫ মার্চ ১৯৯৯)
মৃত্যুর তারিখ : ৭ আগস্ট ২০২৪
পিতার নাম : নোমান হোসেন
মাতার নাম: ফেরদৌস আরা বেগম
ঠিকানা: সোনাগাজী ফেনী
শিক্ষা: চতুর্থ বর্ষ, আলহাজ্ব আবদুল হক চৌধুরী ডিগ্রী কলেজ

কোটা সংস্কার আন্দোলনের একদম শুরু থেকেই আমরা এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। প্রতিদিন বিকেলে মুভমেন্টের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করতাম। শুরু থেকেই আমরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ বিষয়ে প্রচুর লেখালেখি করেছি। এছাড়া, ফেসবুক প্রোফাইল পরিবর্তন, পোস্ট শেয়ার করাসহ বিভিন্ন কার্যক্রমেও আমরা সক্রিয় ছিলাম। সেই সময় থেকেই আমরা নানান ধরনের হুমকি-ধামকির সম্মুখীন হতে শুরু করি।

আমাদের বন্ধুত্ব ছিল একটু আলাদা। আমাদের ছয়জন বন্ধুর একটি ঘনিষ্ঠ সার্কেল ছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর আমরা ছয়জন যেকোনো একটি জায়গায় বসতাম। সবারই নিজস্ব ব্যবসা ছিল। শহীদ মাহবুবেরও একটি ছোট ব্যবসা ছিল। ওর বড় ভাই একটি চা কোম্পানির ডিলারশিপের দায়িত্বে ছিলেন। মাহবুব ফেনীতে সেই ব্যবসাটি পরিচালনা করত। সে সোনাগাজীর বিভিন্ন মার্কেটেও পণ্য সরবরাহ করত। শহীদ মাহবুব ফেনী শহরে ভাড়া বাসায় থাকত। ওর বাসা ছিল মহিপাল প্লাজার পাশেই, দুই রুমের একটি

ফ্ল্যাট। এক রুমে ব্যবসা পণ্য রাখত, আর অন্য রুমে নিজে থাকত। প্রায় প্রতিদিনই সে সোনাগাজীতে এসে পণ্য সরবরাহ করত। তবে পণ্য সরবরাহের চেয়ে বড় বিষয় ছিল, আমাদের সঙ্গে না বসলে সে যেন শান্তি পেত না। দুপুরে খাওয়ার পর চলে আসত, কখনো কখনো খাওয়া-দাওয়া না করেই চলে আসত।

আন্দোলনের সমর্থনে প্রোফাইল পিকচার পরিবর্তন করে মাসুম

আমাদের এখানে, সোনাগাজী উপজেলায় কোনো আন্দোলন হয়নি। আন্দোলন হয়েছিল ফেনী শহরে। ২ ও ৩ আগস্ট ফেনী শহরের ট্রাঙ্ক রোড দোয়েল চত্বরে যে আন্দোলন হয়েছিল, তা মোটামুটি শান্তিপূর্ণ ছিল। কিন্তু ৪ আগস্ট যা ঘটল, তা আমাদের জন্য সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল। মানুষ যে এতটা নিকৃষ্ট হতে পারে এবং একজন মানুষ আরেকজনের প্রতি এতটা হিংসাত্মক আচরণ করতে পারে, তা আমাদের কল্পনারও বাইরে ছিল। ৪ আগস্ট আমি ও মাহবুব মাঠপর্যায়ে ফেনীর আন্দোলনে অংশগ্রহণ করি। ২ ও ৩ আগস্ট আমার ছোট ভাই মুর্শিদ আলম আকাশ (বয়স ১৭) আন্দোলনে গিয়েছিল। তবে আমি জানতাম না যে, সে আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। ৪ আগস্ট তার বাম চোখের নিচে গুলি লাগে। গুলি বের করা ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় সে এখনো গুলিবিদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। ৩ আগস্ট দিবাগত রাতে আমি এবং আমার ছোট ভাই পরিকল্পনা করি, আমরা ৪ আগস্ট একসাথে আন্দোলনে যাব। মাহবুবকে রাতেই মেসেঞ্জারে বললাম, 'আমরা কালকে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করব।' মাহবুব আমাদের স্বাগত জানাল।

ছবিঃ আন্দোলনের সমর্থনে ফেসবুকে সরব ছিলেন মাসুম

৪ আগস্ট ফেনী শহরের মহিপালে কর্মসূচি ছিল। সকালবেলা তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে মহিপালের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। সোনাগাজীতে রাস্তায় ছাত্রলীগ, যুবলীগ এবং আওয়ামী লীগের ক্যাডাররা ব্যারিকেড দিয়ে রেখেছিল। যাত্রীদের চেক করে তারপর সিএনজিতে উঠতে দিচ্ছিল।

আমি আমার ভাইকে বললাম, 'তুই একা আয়, আমি একা যাই। আমি আগে যাই, দেখে নেই সবকিছু ঠিক আছে কি না। রাস্তায় কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না, সেগুলো তোকে আগে জানিয়ে দিচ্ছি।' পরে আমি একা চলে গেলাম। পথে পথে আমার ছোট ভাইকে ফোন দিয়ে লোকেশনগুলো জানিয়ে দিচ্ছিলাম—কীভাবে যেতে হবে বা কোথাও কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না।

আমি মহিপালে সাড়ে দশটার দিকে পৌঁছে সরাসরি মাহবুবের বাসায় চলে যাই। গিয়ে দেখি, সে শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছে। আমি তাকে তাড়া দিতে থাকি। বললাম, 'তাড়াতাড়ি রেডি হও। দেরি করলে আমরা পিছিয়ে পড়ব।' আমরা চাইছিলাম মূল পয়েন্টে, ঠিক মাঝখানে থাকতে।

মাহবুব আমাকে বলল, 'আমাকে অল্প সময় দাও, আমি গোসল করে একদম ফ্রেশ হয়ে বের হব।' আমি যাওয়ার আগেই তার খাওয়া-দাওয়া শেষ। এরপর আমি অপেক্ষা করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে গোসল করে একদম ফ্রেশ হয়ে বের হলো। মাহবুব সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে পছন্দ করত। ওজু ও পরিচ্ছন্নতা ছিল তার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমাদের মধ্যে মাহবুবই ছিল সবচেয়ে পরিপাটি, স্মার্ট, নম্র-ভদ্র এবং চরিত্র ও আচরণে সবার চেয়ে উন্নত।

মাহবুব তার বাসা থেকে একটি পানির বোতলে মরিচের গুঁড়া মিশিয়ে আমাকে দিয়ে বলল, 'এটাও নাও। ফেস-টু-ফেস সংঘর্ষ হলে এটা কাজে লাগবে।' পাশাপাশি সে আমাকে একটি টুথপেস্ট দিল এবং বলল, 'এই টুথপেস্টটা নাও। টিয়ারশেল চোখে বা মুখে লাগলে ব্যবহার করা যাবে।' মাহবুব আগে চট্টগ্রামে থাকার সময় তার বোন-জামাইয়ের ফার্মেসিতে সহযোগিতা করত, তাই প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে তার ভালো ধারণা ছিল। সব প্রস্তুতি নিয়ে আমরা তার বাসা থেকে বের হয়ে গেলাম।

আমরা এগারোটার দিকে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে একত্রিত হই। জোহরের আজানের আগ পর্যন্ত বিভিন্ন স্লোগান ও কবিতার মাধ্যমে আন্দোলন চলতে থাকে। অনেক বোনেরাই শরবত, ফল ও হালকা নাস্তা বিতরণ করছিলেন। মহিপালের ফলের দোকানদাররা তাদের ফলের ক্যারেট নিয়ে এসে পেয়ারা, আপেল ইত্যাদি বিলিয়ে দিচ্ছিলেন। তারা বলছিলেন, 'খাও, আমাদের কোনো টাকা লাগবে না।

আজকে তোমাদের জন্য সবকিছু ফ্রি।' মাহবুব পাশের একটি জায়গা থেকে দুটি লাঠি সংগ্রহ করে একটি নিজে নিল এবং আরেকটি আমাকে দিয়ে বলল, 'এইটা হাতে রাখ, যদি কোনো সংঘর্ষ হয়, কাজে লাগবে।'

বারোটার পর মাহবুবের বড় ভাই মাহমুদুল হাসান—যিনি চট্টগ্রামে থাকেন—মাহবুবকে ফোন করলেন। তিনি বিভিন্ন নিউজে দেখেছেন, মহিপালে ছাত্ররা একত্র হয়েছে এবং সেখানে আন্দোলন করছে। অন্যদিকে, ট্রাঙ্ক রোডে সরকারদলীয় সংগঠনগুলো (আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ) আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং মুখোমুখি সংঘর্ষের সম্ভাবনা রয়েছে। স্লোগানের শব্দের কারণে ঠিকমতো কথা বোঝা যাচ্ছিল না। মাহবুবের বড় ভাই বারবার বলছিলেন, 'তুমি বাসায় চলে যাও। বাসা তো কাছেই।' কিন্তু মাহবুব বাসায় যায়নি। আমাকে বলল, বড় ভাই ফোন দিয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে কি বাসায় চলে যাবা? সে বলল, না। একটু পর জোহরের আজান হবে। নামাজ পড়ে তারপর আন্দোলন শেষ করে বাসায় যাব।

মাহবুব পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ গুরুত্বসহকারে আদায় করত। মাঝে মাঝে নফল রোজা রাখত। গত বছর রমজানে সে ইতিকাফে বসেছিল। ওর সবচেয়ে বড় গুণ ছিল, প্রতি ওয়াক্ত নামাজের পর ১০ থেকে ১৫ মিনিট কুরআন তিলাওয়াত করত। প্রতি রমজানে বিভিন্ন জায়গায় আমরা ইফতার মাহফিল করতাম, সবসময় মাহবুবই মোনাজাত করত। সবার জন্য দোয়া করত। শেষ সময়ে সে আমাদের মাঝে মধ্যমণি হয়ে উঠেছিল। জোহরের আজানের সময় আমাদের স্লোগান বন্ধ ছিল। তখন আমরা সবাই চিন্তা করছিলাম, নামাজ কোথায় পড়ব? যদি মসজিদে যাই, তাহলে আওয়ামী লীগ স্পট দখল করে নেবে। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, রাস্তায় জামাতের সঙ্গে নামাজ পড়ব। মাহবুবের হাতে একটি দুই লিটারের পানির বোতল ছিল, সেখান থেকে কিছু পানি আমার জন্য ঢেলে দিল, আমি ওজু করলাম। আমরা দুই বন্ধু একসঙ্গে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লাম। মাহবুব তার গোসলের ওজু দিয়ে নামাজ পড়ে নিল।

সেদিন জোহরের নামাজের দুইটি জামাত অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম জামাতে আমি ও মাহবুব অংশগ্রহণ করতে পারিনি। আমি ওজু করতে করতে প্রথম জামাত শেষ হয়ে যায়। তারপর দ্বিতীয় জামাতে আমরা অংশগ্রহণ করি। একটা পঞ্চাশ মিনিটের দিকে, দ্বিতীয় জামাত শেষ হওয়ার পরপরই হঠাৎ ছাত্রলীগ, যুবলীগ, আওয়ামী লীগের কর্মীরা ট্রাঙ্ক রোড থেকে আক্রমণ করতে করতে মহিপালের দিকে এগিয়ে আসে। প্রথমে অনেকে ভেবেছিল, আন্দোলনকারীদের কোনো মিছিল আসছে। ভুল ধারণা নিয়ে অনেকেই এগিয়ে গিয়ে রিসিভ করতে চেয়েছিল। কিছুদূর অগ্রসর

হওয়ার পর দেখা গেল, সন্ত্রাসীরা ককটেল নিক্ষেপ করতে করতে আসছে। তখন যারা রিসিভ করতে গিয়েছিল, তারা পিছিয়ে আসে।

কিছুক্ষণ পর আমরা অনেক আন্দোলনকারী ওদের প্রতিহত করতে ট্রাঙ্ক রোডের দিকে এগিয়ে যাই। সন্ত্রাসীরা এবং আমরা যখন প্রায় মুখোমুখি হয়ে যাই, তখন তারা আমাদের দিকে গুলি শুরু করে। তখন আমরা পেছনের দিকে, অর্থাৎ মহিপাল পয়েন্টের দিকে দৌড় দেই। মহিপাল পয়েন্টে এসে আন্দোলনকারীরা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আমি, মাহবুবসহ আমরা কয়েকজন সার্কিট হাউজের দিকে চলে যাই। আমরা সার্কিট হাউজের গলির মুখ থেকে ওদের দিকে ইট নিক্ষেপ করছিলাম। তারা মহিপাল থেকে ছররা গুলি করছিল। হঠাৎ দেখি, সন্ত্রাসীরা আমাদের একদম কাছে, মহিপাল ফ্লাইওভারের নিচ থেকে জিয়াউদ্দিন বাবলুর নেতৃত্বে ভারী অস্ত্র দিয়ে গুলি করতে শুরু করেছে। আমি দেখলাম, গুলি শুরু হতেই কয়েকজন পড়ে গেল। ফ্লাইওভারের নিচে কাঁচাবাজার আছে, সেই জায়গাটা অন্ধকার। সন্ত্রাসীরা মূলত ওই দিক দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে মহিপাল পয়েন্ট থেকে আমাদের সামনে চলে এসে গুলি করতে শুরু করে।

তখন আমরা দৌড় দিলাম। কে কোন দিকে দৌড়াচ্ছে, তা দেখার সময় ছিল না। যে যেখানে পারলাম, সেখানে আশ্রয় নিলাম। আমি দৌড়ে সার্কিট হাউজের গলির ভেতর প্রবেশ করে একটা দোকানে ঢুকলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে দোকানের শাটার নামিয়ে দিলাম। তখন আমি প্রথমে আমার ছোট ভাইকে ফোন দিলাম। সে আমাকে জানাল, সে নিরাপদে আছে। এরপর আমি মাহবুবকে ফোন দিলাম। তার ফোনে কল যাচ্ছিল, কিন্তু ফোন ধরছিল না। আমার খুব টেনশন হচ্ছিল। আমি দেখছিলাম, কয়েকজন পড়ে গেছে, কিন্তু কে পড়েছে তা আর লক্ষ করার সময় ছিল না।

কিছুক্ষণ পর গুলি থামলে আমি মাহবুবকে ফোন দিতে দিতে দোকান থেকে বের হলাম। ফোন দিতে দিতে দৌড়াচ্ছি, খুঁজছি সে কোথায় আছে। কিন্তু সে ফোন ধরছে না। এরপর দৌড়াতে দৌড়াতে সার্কিট হাউজের গলির মুখে গেলাম। সেখানে কিছু মানুষ পড়ে ছিল। মাহবুব সড়কের মুখে পড়ে ছিল, তবে পাশে পড়ে থাকা একজনের কারণে তাকে দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল না। আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে, রাস্তায় মাহবুবের জুতা পরা পা দেখে আমার ভেতরে একটা মোচড় দিয়ে উঠল। মনে মনে ভাবলাম, 'ওটা তো মাহবুবের জুতা।' আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, এমনটা কীভাবে হতে পারে? এটা আমি মেনে নিতে পারছিলাম না। দৌড়াতে দৌড়াতে আরও একটু এগিয়ে গেলে মাহবুবকে দেখতে পেলাম। গুলি থেকে বাঁচতে

দৌড়ানোর সময় মাহবুবের মাথার পেছনের অংশে গুলি লাগে। মাথার পেছনে ছিদ্র হয়ে মগজ আর রক্ত একসঙ্গে রাস্তায় পড়ে আছে। ওর নাক ও মুখ দিয়ে রক্ত বের হচ্ছিল। ব্যথায় হাত-পা নেড়ে ছটফট করছিল।

ছবিঃ (ডানে) চিহ্নিত ব্যক্তি হচ্ছেন মাহবুবের বন্ধু আবুল কালাম আজাদ। তার জবানীতে পুরো ঘটনা বর্ননা করা হয়েছে। উনি সবাইকে ডাকতেছিলেন সাহায্য করার জন্য। (ডানে) মুমূর্ষু মাহবুবকে রিক্সা করে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছেন আবুল কালাম আজাদ।

মাহবুবের কাছে গিয়ে ওর মাথাটা আমার কোলে নিলাম। প্রথমে আমি ওর আহত স্থানটা বুঝতে পারিনি। ভাবছিলাম, যেহেতু ওর নাক-মুখে রক্ত ছিল, হয়তো সেখানেই আঘাত লেগেছে। কিন্তু ওর মাথাটা আমার কোলে নেওয়ার পর বুঝলাম, আসলে আঘাতটা মাথার পেছনে লেগেছে। দেখলাম, আমার হাতে মাহবুবের মগজ এসে পড়ে। তখন কীভাবে ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাব, সেটা বুঝতে পারছিলাম না। নিজেকে এত অসহায় লাগতেছিল। একটাই চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল—যেভাবেই হোক, ওকে হাসপাতালে নিতে হবে আর রক্তপাত বন্ধ করতে হবে। ওর শরীর কোলে নিয়ে চিৎকার করে বলছিলাম, 'ও আমার বন্ধু। ওকে বাঁচান, ও এখনো জীবিত আছে।'

কয়েকজন মুরব্বির সহায়তায় চারজন গুলিবিদ্ধ আন্দোলনকারীকে দুটি রিকশায় তুলে সার্কিট হাউজ হয়ে দাগনভূঞা রোডে কিছুটা এগিয়ে একটি অ্যাম্বুলেন্স পেয়ে যাই। ওই অ্যাম্বুলেন্সে চারজনকে তুলে তিনটি সিটে তিনজন, আর একজনকে নিচে রাখলাম। মহিপাল পয়েন্ট ওদের দখলে থাকায় আমরা সালাহউদ্দিন মোড়

হয়ে গ্যাস পাম্পের দিক দিয়ে গার্লস ক্যাডেট কলেজের সামনের রাস্তা ধরে সদর হাসপাতালে পৌঁছাই। সেখানে পৌঁছাতে পৌঁছাতে প্রায় চারটা বাজে। হাসপাতালে ইন্টার্ন ডাক্তাররা আমাদের অনেক সাহায্য করেছিলেন। মাহবুব ইশারায় অনেক কিছু বলতে চাচ্ছিল, কিন্তু কথা বলতে পারছিল না। আমি বারবার ওর হাত ধরে বলছিলাম, 'তুমি ধৈর্য ধরো, আল্লাহ আল্লাহ করো।' রিকশার ভেতরে যতবার ওর মাথায় হাত দিয়ে রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করেছি, মাহবুব বাম হাতে আমার হাত সরিয়ে দিচ্ছিল। মাথার ভেতরে গুলি থাকার কারণে চাপ দিলে সে প্রচণ্ড ব্যথা পাচ্ছিল। কী এক কঠিন অবস্থা! ওর রক্তে আমার পুরো শরীর ভিজে যায়।

মাহবুবের পরিবার চট্টগ্রামে থাকে। ওর অবস্থা জানার পর ওর বড় ভাই আমাকে ফোন দিয়ে অনুরোধ করেন মাহবুবকে দ্রুত অ্যাম্বুলেন্সে করে চট্টগ্রামে নিতে। সেখানে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে। আসলে ফেনী সদর হাসপাতালে ভালো চিকিৎসা হচ্ছিল না। আহতদের প্রায় সবাইকে আত্মীয়রা উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্য জায়গায় নিয়ে যাচ্ছিল। পরে মাহবুবের পরিবার থেকেই একটি অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হয়। অ্যাম্বুলেন্স আসার আগ পর্যন্ত মাহবুবের শরীরে একটি স্যালাইন চলছিল। এর মধ্যে একবার সে বমি করে, পেট থেকে শুধু রক্ত বের হয়। রক্তে ওর চোখ-মুখ, পুরো শরীর ভিজে যায়। পরে অনেক চেষ্টা করে আমি রক্তগুলো পরিষ্কার করি। বিকাল পাঁচটার দিকে আমি এবং বন্ধু সাইফুল মাহবুবকে নিয়ে চট্টগ্রামের উদ্দেশে রওনা দিই। রাস্তায় অনেক জায়গায় আওয়ামী লীগের লোকেরা আমাদের অ্যাম্বুলেন্স আটকে গালিগালাজ করছিল। আমরা অনুরোধ করছিলাম, 'আমাদের রোগীর অবস্থা ভালো না, দয়া করে যেতে দিন।'

চট্টগ্রামে যাওয়ার সময় মাহবুবের নাকে অক্সিজেন লাগানো ছিল। কিন্তু ব্যথার কারণে ও বারবার অক্সিজেন খুলে ফেলছিল। বন্ধু সাইফুল এসব সহ্য করতে পারছিল না। মাহবুবের মাথায় যে জায়গায় ব্যান্ডেজ করা হয়েছিল, সেখান থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হচ্ছিল না। আমি দেখছিলাম, যতই পথ এগোচ্ছি, ওর শরীরটা আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে। ভাটিয়ারি পৌঁছানোর পর দেখি, ওর পুরো সিট গড়িয়ে রক্ত নিচে পড়ছে। ওর মাথায় যে জায়গায় গুলি লেগেছিল, সেটি সিটের সঙ্গে লেগে ছিল। মুখে অক্সিজেন লাগানো। আমি ভাবছিলাম, ব্যান্ডেজের ফলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু আসলে বন্ধ হয়নি। ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত ক্রমাগত পড়ছিল। অ্যাম্বুলেন্সের নিচে রক্ত জমে গিয়েছিল। তখন বুঝলাম, ওর শরীরের সব রক্ত বের হয়ে যাচ্ছে।

সন্ধ্যার দিকে চট্টগ্রাম পার্কভিউ হাসপাতালে পৌঁছানোর পর মাহবুবকে আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। ৭ আগস্ট দুপুর ১২ টার দিকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়। ওইদিন বিকেল ছয়টার দিকে মাহবুব শাহাদাত বরণ করে।

তথ্যসূত্র :

১. মাহবুবুল হাসান মাসুমের বন্ধু, আন্দোলনের সহযোদ্ধা এবং ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আবুল কালাম আজাদ-এর সাক্ষাৎকার

তথ্য সংগ্রহে:

মোঃ কামরুজ্জামান, মোঃ নাহিদ হাসান সজীব;

স্টোরি মেকিং: মোঃ কামরুজ্জামান এবং ড. মোহাম্মাদ সরোয়ার হোসেন

চেকলিস্ট ১- নিহত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের লিস্ট

নোট- এটা পূর্ণাঙ্গ লিস্ট নয়। সমকাল (ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ১৩৫ শিক্ষার্থীর প্রাণক্ষয়' সমকাল, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪) এবং বনিক বার্তা (গুলিতে প্রাণ হারান বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭ শিক্ষার্থী' বনিক বার্তা, ৩০ আগস্ট ২০২৪) প্রতিবেদন এবং অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরী করা হয়েছে।

ক্রম	নাম	বিশ্ববিদ্যালয়	বিভাগ	মৃত্যুর তারিখ
১	আবু সাঈদ	রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর	ইংরেজী	১৬ জুলাই
২	শাইখ আসহাবুল ইয়ামিন	এমআইএসটি	সিএসই	১৮ জুলাই
৩	জাহিদুজ্জামান তানভীর	ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি	যন্ত্র কৌশল	১৮ জুলাই
৪	হৃদয় চন্দ্র তরুয়া	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	ইতিহাস	১৮ জুলাই
৫	মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস	এমবিএ	১৮ জুলাই
৬	পারভেজ শাকিল	মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	বিবিএ	১৮ জুলাই
৭	রুদ্র সেন	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	ক্যামি ইঞ্জিনি-য়ারিং	১৮ জুলাই
৮	মো. ইরফান ভূইয়া	ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	সিএসই	১৮ জুলাই
৯	আসিফ হাসান	নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ	ইংরেজি	১৮ জুলাই
১০	আহসান হাবীব তামিম	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	গণিত	১৯ জুলাই
১১	আসিফ ইকবাল	ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ	—	১৯ জুলাই

১২	ইমতিয়াজ আহমেদ জাবির	সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি	বিবিএ	২৬ জুলাই
১৩	রাব্বী মিয়া	সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি	ইইই	২০ জুলাই
১৪	মো. সেলিম তালু-কদার	বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন	মার্চেন্ডাইজিং	১ আগস্ট
১৫	মোঃ ফরহাদ হোসেন	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	ইতিহাস	৪ আগষ্ট
১৬	রাকিব হোসেন	সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি	টেক্সটাইল ইঞ্জি	৫ আগস্ট
১৭	রবিউল ইসলাম	সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি	টেক্সটাইল ইঞ্জি	৫ আগস্ট
১৮	মো. আহনাফ আবির আশরাফুল্লাহ	মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	ইইই	৫ আগস্ট
১৯	জোবায়ের ওমর খান	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস	আইন	
২০	সাজ্জাদ হোসেন সজল	সিটি ইউনিভার্সিটি	টেক্সটাইল ইঞ্জি	৫ আগস্ট
২১	রাসেল মাহমুদ	সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি	বাংলা	৫ আগস্ট
২২	শাহরিয়ার আল-আফরোজ শ্রাবণ	ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	সিএসই	৫ আগস্ট
২৩	সাকিব আনজুম	বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়	সিএসই	৫ আগস্ট
২৪	সুজন মাহমুদ মিথি	বিইউবিটি)	ইইই	৫ আগস্ট
২৫	মো. তাহমিদ আবদু-ল্লাহ অয়ন	বিইউবিটি)	সিএসই	১০ আগস্ট
২৬	মো. শাকিল হোসেন জুলফিকার	ইউডা	চারুকলা	৭ আগস্ট
২৭	ইকরামুল হক সাজিদ	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	অ্যাকাউন্টিং	১৪ আগস্ট
২৮	আবদুল কাইয়ুম	কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়	অ্যাকাউন্টিং	৫ আগস্ট

চেকলিস্ট ২- আন্দোলনে নিহত মাদরাসা ছাত্রদের লিস্ট

নোট- এটা পূর্ণাঙ্গ লিস্ট নয়। সমকাল পত্রিকায় ('প্রাণ ঝরেছে মাদরাসার ৪৫ শিক্ষার্থীর' সমকাল, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৪) প্রকাশিত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরী করা হয়েছে।

ক্রম	নাম	প্রতিষ্ঠান	মৃত্যুর তারিখ
১	শাফক্কাত সামির	জামেউল উলূম মাদরাসা , মিরপুর, ঢাকা	১৯ জুলাই, ২০২৪
২	জোবাইদ হোসাইন ইমন	আল্লাহ করিম মসজিদ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা	১৯ জুলাই, ২০২৪
৩	রাব্বি মাতবর	মিরপুর, ঢাকা	১৯ জুলাই, ২০২৪
৪	ইবরাহীম খলিল	হাফেজি মাদরাসা , সাইনবোর্ড, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা	১৯ জুলাই, ২০২৪
৫	সাদ মাহমুদ খান	জাবালে নূর দাখিল মাদরাসা , সিঙ্গাইর, মানিকগঞ্জ	২০ জুলাই, ২০২৪
৬	আশিকুল ইসলাম আল-ইয়াস	বনশ্রী, ঢাকা	১৯ জুলাই, ২০২৪
৭	মুহাম্মাদ আদিল	তামিরুল মিল্লাত মাদরাসা , ঢাকা	২০ জুলাই, ২০২৪
৮	মো. বাঁধন	-	৬ আগস্ট, ২০২৪
৯	আশিকুল ইসলাম	দিনাজপুর	১৯ জুলাই, ২০২৪
১০	হাফেজ সিফাত হোসাইন	তাঁতিবাজার, পুরান ঢাকা	১৯ জুলাই, ২০২৪
১১	নাহিদুল ইসলাম	আদাবর, ঢাকা	৫ আগস্ট, ২০২৪

ক্রম	নাম	প্রতিষ্ঠান	মৃত্যুর তারিখ
১২	হাফেজ মুহাম্মাদ যুবায়ের আহমদ	আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া মাখজানুল উলুম, খিলগাঁও	৫ আগস্ট, ২০২৪
১৩	ইশমামুল হক	চাঁনখারপুল, ঢাকা	৭ আগস্ট, ২০২৪
১৪	সায়েদ মুনতাসীর রহমান	তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা	৫ আগস্ট, ২০২৪
১৫	হাফেজ সাজ্জাদ হোসাইন সাব্বির	ফুলছোঁয়া মাদরাসা , চাঁদপুর	১৯ জুলাই, ২০২৪
১৬	মো. আয়াতুল্লাহ	মাখলাজুন ঈমান মাদরাসা , গাজীপুর	১৬ আগস্ট, ২০২৪
১৭	আব্দুল্লাহ আল মামুন	জামিয়া আশরাফিয়া মাদরাসা , ঢাকা	৪ আগস্ট, ২০২৪
১৮	হাফেজ সাদিকুর রহমান	মাদারীপুর	১৯ জুলাই, ২০২৪
১৯	তাওহীদ সান্নামাত	মাদারীপুর	১৯ জুলাই, ২০২৪
২০	নাসির ইসলাম	তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা	২০ জুলাই, ২০২৪
২১	মুহাম্মাদ জহিরুল ইসলাম	ছৈয়দপুর কামিল মাদরাসা , দেবীদ্বার, কুমিল্লা	৪ আগস্ট, ২০২৪
২২	হাফেজ আবদুল্লাহ	মাদরাসা তুল আবরার, শনির আখড়া, ঢাকা	৫ আগস্ট, ২০২৪
২৩	হাফেজ আনাস বিল্লাহ	সাতক্ষীরা	৫ আগস্ট, ২০২৪
২৪	শাহজাহান হৃদয়	মহাখালী, ঢাকা	২৪ জুলাই, ২০২৪
২৫	হাফেজ মাহমুদুল হাসান	জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা, ঢাকা	২৪ জুলাই, ২০২৪
২৬	খালিদ সাইফুল্লাহ	জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা, ঢাকা	২৪ জুলাই, ২০২৪
২৭	মাবরুর হুসাইন (গোলাম রাব্বি)	জামিয়া বাগে জান্নাত মাদরাসা , ঢাকা	২৪ জুলাই, ২০২৪
২৮	মাইন উদ্দিন	যাত্রাবাড়ী	২৫ জুলাই, ২০২৪
২৯	সুমন মিয়া	মাধবদী, নরসিংদী	২৩ আগস্ট, ২০২৪

ক্রম	নাম	প্রতিষ্ঠান	মৃত্যুর তারিখ
৩০	হোসাইন মিয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৪ আগস্ট, ২০২৪
৩১	মাহবুবুল হাসান মাসুম	ফেনী	৭ আগস্ট, ২০২৪
৩২	মো.শাকিল	যাত্রাবাড়ী	৫ আগস্ট, ২০২৪
৩৩	নুর মুস্তফা	দারুস সালাম মাদরাসা	৫ আগস্ট, ২০২৪
৩৪	জয়নুল আবেদীন	জামিয়া কারিমিয়া আলেয়া বেগম, কক্সবাজার	৫ আগস্ট, ২০২৪
৩৫	মুহাম্মাদ সিফাতুল্লাহ	জামিয়া ইসলামিয়া এমদাদুল উলূম, কিশোরগঞ্জ	৫ আগস্ট, ২০২৪
৩৭	আরজ আলী	সাতক্ষীরা	১৮ জুলাই, ২০২৪
৩৮	সাব্বির		১৮ জুলাই, ২০২৪

চেকলিস্ট ৩- জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ৩৬ দিনের কালপুঞ্জি

আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহের মূল রেফারেন্স হচ্ছে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)।[৩৬] প্রথম আলো থেকেও তথ্য নেয়া হয়েছে।[৩৭]

৫ জুন, সোমবার

সরকারি চাকুরির নিয়োগ ব্যবস্থায় কোটা পদ্ধতি সংস্কারের দাবিতে দেশব্যাপী বিক্ষোভের মধ্যে ২০১৮ সালে সরকার কর্তৃক জারি করা সার্কুলারকে অবৈধ ঘোষণা করে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ। ঘোষণার পরপরই, শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নেমে আসে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের জন্য ৫৬% চাকরি সংরক্ষণ করার সুবিধা দেয়ার কোটা পদ্ধতি বাতিলের দাবিতে সারা দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ মিছিল বের করে।

জুন ৬, মংগলবার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কোটা পদ্ধতির বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ করে। তবে ঈদুল আজহা উদযাপনের কারণে বিক্ষোভ শান্ত হলেও বিরতির পর তা আবার শুরু হয়।

৯ জুন, ২০২৪, শুক্রবার

সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থা পুনর্বহালের প্রতিবাদে আবারও বিক্ষোভ সমাবেশ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীরা তাঁদের দাবি মানতে সরকারকে ৩০ জুন পর্যন্ত সময় বেঁধে দেন। এ সময়ের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে সর্বাত্মক আন্দোলনের ঘোষণা দেন তাঁরা।

---

[৩৬] ছাত্র-জনতার জুলাই অভ্যুত্থানের কালপঞ্জি' বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪

https://www.bssnews.net/bangla/national/169358

[৩৭] ৩৬ দিনের আন্দোলন, সরকারের পতন' প্রথম আলো, ৬ আগস্ট ২০২৪

১ জুলাই, সোমবার

২৪ দিনের বিরতির পর, শিক্ষার্থীরা কোটা বাতিলের নতুন নির্বাহী আদেশের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এবং আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ করে। এরপর আন্দোলনকারীরা দাবি পূরণের জন্য ৪ জুলাই সময়সীমা নির্ধারণ করে।

২ জুলাই, মংগলবার

শিক্ষার্থীরা শাহবাগ মোড় এক ঘণ্টা অবরোধ করে বিক্ষোভ করে এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল বের করে এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সামনে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অন্তত ২০ মিনিট অবরোধ করে রাখে।

৩ জুলাই, বুধবার

শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার চত্বর থেকে একটি মিছিল বের করে এবং শাহবাগে বিক্ষোভ মিছিল করে নগরীর অন্যতম ব্যস্ত মোড়টি দেড় ঘণ্টা অবরোধ করে রাখে। এছাড়া, ছাত্ররা অন্যান্য কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত বিক্ষোভ অব্যাহত রাখে।

৪ জুলাই, বৃহস্পতিবার

আপিল বিভাগ হাইকোর্টের রায় স্থগিত করেনি যা কার্যত কোটা বাতিলের ২০১৮ সালের সার্কুলারকে অবৈধ করেছে। ফলে শিক্ষার্থীরা সারাদেশে তাদের বিক্ষোভ আরও তীব্র করে।

৫ জুলাই, শুক্রবার

সারাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রচারণা জোরদার করার জন্য, 'বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন' ব্যানারে শিক্ষার্থীরা অবস্থান কর্মসূচি, বিক্ষোভ, সমাবেশ এবং সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করে এবং ৭ জুলাই (রোববার) থেকে ক্লাস পরীক্ষা বর্জনের আহ্বান জানিয়ে দিনের কর্মসূচি শেষ করে। তারা এর পাশাপাশি ৬ জুলাই (শনিবার) প্রতিবাদ কর্মসূচি ঘোষণা করে। এদিন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুরের হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং টাঙ্গাইলের মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অবস্থান, বিক্ষোভ সমাবেশ ও রাস্তা অবরোধ করে।

৬ জুলাই, শনিবার

বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীরা 'বাংলা ব্লকেড' কর্মসূচির প্রথম দিনে রাজধানীর শাহবাগ, নীলক্ষেত, হেয়ার রোড, মিন্টো রোড, সায়েন্স ল্যাব, বাংলামোটর মোড় এবং ঢাকা-আরিচা ও ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কসহ প্রধান প্রধান সড়কগুলো কয়েক ঘণ্টার জন্য অবরোধ করে রাখে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শাহবাগ মোড়ে, ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা সায়েন্স ল্যাব মোড়ে, ইডেন কলেজের শিক্ষার্থীরা নীলক্ষেত মোড়ে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে এবং কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে অবরোধ করে।

দিনের কর্মসূচি শেষে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা সংসদে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সরকারি চাকুরির সব গ্রেডে অযৌক্তিক কোটা বাতিলের 'এক দফা' দাবি নিয়ে অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন।

৭ জুলাই, রবিবার

বাংলা অবরোধে শিক্ষার্থীরা রাজধানীতে অবরোধ কর্মসূচি পালন করায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্থবির হয়ে পড়ে ঢাকা মহানগরী। কেন্দ্রীয় কর্মসূচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সারাদেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দেয় শিক্ষার্থীরা।

৮ জুলাই, সোমবার

শিক্ষার্থীরা এদিন ঢাকার ১১টি স্থানে অবরোধ কর্মসূচি, নয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ, ছয়টি মহাসড়কসহ তিনটি স্পটে রেলপথ অবরোধ করে।

৯ জুলাই, মংগলবার

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন দেশের সড়ক ও রেলপথের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ভোর থেকে সন্ধ্যা অবরোধ ঘোষণা করে। এদিকে, হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আইনজীবীর মাধ্যমে আপিল করেন দুই শিক্ষার্থী।

১০ জুলাই, বুধবার

এদিন আপিল বিভাগ চার সপ্তাহের জন্য কোটার ওপর স্থিতাবস্থা জারি করেন। সব গ্রেডে সরকারি নিয়োগে কোটা পদ্ধতি সংস্কারের দাবি জানান শিক্ষার্থীরা।

১১ জুলাই, বৃহস্পতিবার

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, কোটা আন্দোলনকারীরা দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিরুদ্ধে তাদের পেশীশক্তি ব্যবহার করছে, যা অযৌক্তিক ও বেআইনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আন্দোলনকারীরা 'সীমা অতিক্রম করছে'। শিক্ষার্থীরা রাজধানীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে এবং মহানগরীর বাইরে মহাসড়কে অবস্থান বিক্ষোভ করে এবং পুলিশের বাধা সত্ত্বেও সড়ক, মহাসড়ক এবং রেলপথে যান চলাচল ব্যাহত করে।

১২ জুলাই, শুক্রবার

বিকেল ৫টার দিকে শিক্ষার্থীরা শাহবাগে জড়ো হয়ে এলাকা অবরোধ করে। এদিকে, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করতে গেলে ছাত্রলীগের একটি দল আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালায়। এ সময় ভিডিও ধারণকারী এক শিক্ষার্থীকে একটি হলে নিয়ে গিয়ে মারধর করে ছাত্রলীগের সদস্যরা।

১৩ জুলাই, শনিবার

সাপ্তাহিক ছুটির দিন থাকলেও দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে বিক্ষোভ মিছিল করে শিক্ষার্থীরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল শেষে শাহবাগ মোড় অবরোধ করে শিক্ষার্থীরা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রেললাইন অবরোধ করে বিক্ষোভ করে।পরে শিক্ষার্থীরা সন্ধ্যায় ঢাকায় একটি সংবাদ সম্মেলন করে অভিযোগ জানায় যে, মামলা দিয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। তারা ঘোষণা করে যে পরের দিন তারা সব গ্রেডের সরকারি চাকুরিতে কোটা সংস্কারের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি দেবে।

১৪ জুলাই, রবিবার

শিক্ষার্থীরা রাজধানীতে অবস্থান বিক্ষোভ ও অবরোধসহ মিছিল বের করে এবং পরে তাদের দাবি জানিয়ে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিনের কাছে স্মারকলিপি পেশ করে। সন্ধ্যায় গণভবনে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের রাজাকারের সন্তান বলে উল্লেখ করে বিতর্কিত মন্তব্য করেন, যা আন্দোলনকে আরও উসকে দেয়।

শেখ হাসিনার বক্তব্যের জবাবে শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এলাকায় মধ্যরাতে বিক্ষোভ মিছিল করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব মহিলা হলের ছাত্রীরা ছাত্রাবাসের গেটে কর্তৃপক্ষের লাগানো তালা ভেঙে বিক্ষোভে যোগ দেয়।

সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ফোরজি নেটওয়ার্ক বন্ধ করতে অপারেটরদের নির্দেশ প্রদান করে। এদিকে, বেলা সাড়ে ১১টার দিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনকারীদের ওপর বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের হামলায় ১৩ আন্দোলনকারী আহত হন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়েও বিক্ষোভ করে শিক্ষার্থীরা।

১৫ জুলাই, সোমবার

আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের গণমাধ্যমকে বলেন, দলের ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ শিক্ষার্থীদের 'উচিত জবাব' দেবে। ওবায়দুল কাদেরের নির্দেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা হামলা চালায় এবং নির্বিচারে তাদের পিটিয়ে অন্তত ৩০০ বিক্ষোভকারীকে আহত করে। হেলমেট পরা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে জোর করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে রড ও চাইনিজ কুড়াল নিয়ে প্রবেশ করে এবং পরে ঢামেক হাসপাতালের ভেতরে ও বাইরে আহত বিক্ষোভকারীদের ওপর হামলা চালায়। হাসপাতালের ভিতরে পার্ক করা বেশ কয়েকটি অ্যাম্বুলেন্স ভাঙচুর করে। কয়েক ঘণ্টার সংঘর্ষের পর আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি ছাত্রাবাস- ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ হল, ফজলুল হক মুসলিম হল ও অমর একুশে হলের নিয়ন্ত্রণ নেয়। এদিকে, সন্ধ্যায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের রাজশাহী শাখার হামলায় ছয় শিক্ষার্থী আহত হয়। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ককে ফোনে পরীক্ষার করার কথা বলে ডেকে ছাত্রলীগের লোকজন তাকে লাঞ্ছিত ও মারধর করে। আন্দোলনকারীরা ১৬ জুলাই বিকাল ৩টায় দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেশব্যাপী বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের ডাক দেন।

জুলাই ১৬, মংগলবার

ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং উত্তরাঞ্চলীয় রংপুরে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে এবং কমপক্ষে ছয়জন নিহত হয়। সারাদেশে শিক্ষার্থীরা ব্যাপক বিক্ষোভ করে। আন্দোলনকারীদের ওপর ছাত্রলীগ, যুবলীগসহ ক্ষমতাসীন দলের লোকজন হামলা চালায়। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রংপুরে ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের তুমুল সংঘর্ষে অন্তত ছয়জন নিহত হয়।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদ নিহত হওয়ার ফুটেজ ও ছবি এদিন ভাইরাল হওয়ায় রাতে সাধারণ শিক্ষার্থীরা পাল্টা লড়াই করে ছাত্রলীগকে ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাড়িয়ে দেয়। তারা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ নেতাদের কক্ষ ভাংচুর করার পাশাপাশি ঢাবি ও রাবি হলের বেশির ভাগ হরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহন করে। এর প্রেক্ষিতে শেখ হাসিনার সরকার দেশব্যাপী স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়। তবে পরদিন গায়েবানা জানাজা ও কফিন মিছিলের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করে শিক্ষার্থীরা। ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে ধাওয়া করে তাড়িয়ে দেয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের কক্ষ তছনছ-ভাঙচুর করে।

১৭ জুলাই, বুধবার

সকালের দিকে আন্দোলনকারীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন ক্যাম্পাস থেকে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের তাড়িয়ে দেয় এবং ক্যাম্পাসকে 'রাজনীতিমুক্ত' ঘোষণা করে। ছাত্ররা নিহতদের জন্য 'গায়েবানা জানাজা' আদায় করার চেষ্টা করে, কিন্তু পুলিশ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের সমাবেশে হামলা চালায়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাস বন্ধ করে ছাত্রদের তাদের ছাত্রাবাস খালি করার নির্দেশ দেয়। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে, হাসিনা জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন এবং ঘোষণা করেন যে, তিনি অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনতে বিচার বিভাগীয় তদন্ত শুরু করবেন। কোটা প্রসঙ্গে তিনি শিক্ষার্থীদের সুপ্রিম কোর্টের রায়ের জন্য অপেক্ষা করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এই সিদ্ধান্ত তাদের হতাশ করবে না। শিক্ষার্থীরা পরের দিনের জন্য সারা দেশে পরিবহণ চলাচল বন্ধ রাখর জন্য 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচির আহ্বান জানায়।

১৮ জুলাই, বৃহস্পতিবার

'সম্পূর্ণ শাটডাউন' কর্মসূচির প্রেক্ষিতে ঢাকায় ও অন্যান্য ৪৭টি জেলায় ব্যাপক সহিংসতা ঘটে। হাজার হাজার শিক্ষার্থী পরিবহন বন্ধ কার্যকর করার জন্য অন্যান্য বিভিন্ন গ্রুপের সাথে যোগ দেয়। পুলিশ ও অজ্ঞাত ব্যক্তিরা বুলেট, শটগানের গুলি ও রাবার বুলেট দিয়ে তাদের ওপর গুলি চালালে কমপক্ষে ২৯ জন শহীদ হওয়ার নিশ্চিত খবর পাওয়া যায়। পুলিশ ও ছাত্রলীগের লোকজন ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায়।

আন্দোলনকারীরা বিটিভি ভবন, সেতু ভবন ও অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। সারা দেশে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা হয় এবং মেট্রো রেলের কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়।

ঢাকা ছাড়াও দেশের ৪৭টি জেলায় বিক্ষোভ, সংঘর্ষ, পুলিশের গুলি ও হামলার ঘটনা ঘটে। এসব ঘটনায় আহত হয় অন্তত ১৫০০ জন। কোথাও কোথাও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে এবং কিছু জায়গায় ক্ষমতাসীন দলের লোকজনের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ হয়। সারাদেশে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্য মোতায়েন করা হয়। রাত ৯টা থেকে ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ।

১৯ জুলাই, শুক্রবার

এই দিনে, শেখ হাসিনা সরকার মধ্যরাতে দেশব্যাপী কারফিউ জারি করে এবং দিনব্যাপী সহিংসতায় কমপক্ষে ৬৬ জন নিহত হওয়ার পর সেনাবাহিনী মোতায়েন করে। নরসিংদীর কারাগার, মেট্রোরেল স্টেশন ও বিআরটিএ অফিসসহ আরও সরকারি প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়।

শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে বাধা দেয়ার প্রয়াসে, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ জনসমাগম ও মিছিল অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করে। ১৮ জুলাই থেকে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস দেশব্যাপী বন্ধ রাখা হয়। তবে শিক্ষার্থীদের 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে নজিরবিহীন সহিংসতা, গুলি, অগ্নিসংযোগ ও মৃত্যুতে কেঁপে ওঠে রাজধানী ঢাকা। মিরপুর ১০ ও কাজীপাড়া মেট্রো স্টেশনে ভাঙচুর চালানো হয়। অন্যান্য জেলায়ও সংঘর্ষ ঘটে। কেবল ঢাকা মহানগরীতেই গুলি ও সংঘর্ষে অন্তত ৪৪ জন নিহত হয়। ঢাকার বাইরে মোট ৫৯ জন নিহত হয়। এতে ছাত্র, রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী, পুলিশ, সাংবাদিক, পথচারীসহ কয়েক শতাধিক মানুষ আহত হয়। শুরু থেকে শুধু শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে অংশ নিলেও শুক্রবার স্থানীয়দেরও আন্দোলনে যোগ দিতে দেখা গেছে।

সারাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলনের ডাক ব্যাপকভাবে অব্যাহত রয়েছে। সকাল ১০টার দিকে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) শিক্ষকরা মুখে কালো চাদর পরে বিক্ষোভ করেন। বেলা আনুমানিক ১২:৪৫ মিনিটে, কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব থানায় বিক্ষোভকারীরা থানা ঘেরাও করার পরে, পুলিশ স্টেশনের ভিতর থেকে জনতার ওপর গুলি চালায়, এতে শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হয়।

নরসিংদীতে, জনতা কারাগারে ঢুকে জেলা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে প্রায় ৯০০ বন্দিকে মুক্ত করে দেয় এবং ৮০টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ১০০০ রাউন্ডের বেশি গুলি লুট করে। সারাদেশে বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে মোট ১০৩ জন নিহত হয়। রাতে কারফিউ জারি করা হয়; সেনা সদস্যদের মোতায়েন করা হয়। সারাদেশে ইন্টারনেট পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

২০ জুলাই, শনিবার

সেনা মোতায়েনের মধ্যে কারফিউর প্রথম দিনে অন্তত ২৬ জন নিহত হয়। যাত্রাবাড়ী, উত্তরা, বাড্ডা ও মিরপুরে ছিল সংঘর্ষের মূল পয়েন্ট। মোহাম্মদপুরেও সংঘর্ষ হয়। কারফিউর প্রথম দিনেই অন্তত ২৬ জন নিহত হয়। সরকার পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কারফিউ অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেয় এবং দুই দিনের 'সাধারণ ছুটি' ঘোষণা করে। কোটা আন্দোলনের নেতা এবং বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) কয়েকজন নেতাকে আটক করা হয়। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মূল সমন্বয়ক নাহিদ ইসলামকে ওই দিন ধরে নিয়ে যায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

২১শে জুলাই, রবিবার

সুপ্রিম কোর্ট কোটা মামলায় রায় প্রদান করে, সিভিল সার্ভিসের চাকরির বেশিরভাগ কোটা বিলুপ্ত করে এবং সিভিল সার্ভিসে ৯৩% শতাংশ নিয়োগ মেধার ভিত্তিতে সাধারণ আবেদনকারীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। কোটার মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনাদের সন্তানদের জন্য ৫ শতাংশ, জাতিগত সংখ্যালঘুদের জন্য এক শতাংশ এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের জন্য এক শতাংশ কোটা নির্ধারণ করা হয়।

এদিকে, বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে ৫৬ জন সমন্বয়কের পক্ষ থেকে সংবাদকর্মীদের কাছে একটি যৌথ বিবৃতি পাঠানো হয় যাতে শিক্ষার্থীদের 'কমপ্লিট শাটডাউন' আরও জোরদার করার আহ্বান জানানো হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, ৩০০ জনেরও বেশি ছাত্র ও মানুষ নিহত হয়েছে। শুধুমাত্র আদালতের আদেশ ব্যবহার করে সরকার হত্যার দায় এড়াতে পারে না। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, পুলিশ কিছু মূল সংগঠককে তুলে নিয়ে গেছে এবং তাদের বিবৃতি দিতে বাধ্য করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। সহিংসতা নিয়ে জাতিসংঘ, ইইউ, যুক্তরাজ্যের উদ্বেগ প্রকাশ করায় তিন বাহিনীর প্রধানরা (সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী) হাসিনার সঙ্গে দেখা করেন। কারফিউ চলতে থাকে এবং আরও সাতজন নিহত হয়।

আরও ৭জন নিহত হয়। তিন বাহিনীর প্রধান নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

২২শে জুলাই, সোমবার

আগের দিনের সংঘর্ষে আহত অন্তত ছয়জন মারা গেছেন। শেখ হাসিনা বিএনপি ও জামায়াতকে পরিণতির হুঁশিয়ারি দেন। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পাওয়ার আশা প্রকাশ করেছেন সেনাপ্রধান। বিএনপি ও জামায়াত নেতাদের গ্রেফতার অব্যাহত রয়েছে। আদালতের আদেশের ভিত্তিতে প্রণীত কোটা সংস্কার সংক্রান্ত গেজেট প্রজ্ঞাপনের অনুমোদন দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এদিন সংঘর্ষে আরও ১৩ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এবং মৃতের সংখ্যা ১৮৭-এ দাঁড়িয়েছে।

২৩ জুলাই, মঙ্গলবার

সুপ্রিম কোর্টের রায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সরকার কোটা পদ্ধতি সংস্কারের সার্কুলার জারি করলেও কোটা সংস্কার আন্দোলনের চার সংগঠক তা প্রত্যাখ্যান করেন। কারফিউর মধ্যেও বিরোধী নেতা ও বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে গ্রেপ্তার ও অভিযান অব্যাহত রয়েছে। সেদিনও বহু মানুষ নিহত হয়। বিরোধী দলের নেতাদের গ্রেফতার অভিযান অব্যাহত রয়েছে। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পরিষেবাগুলি ধীরে ধীরে অগ্রাধিকার দিয়ে পুনরায় চালু করা হয়। পরের দিন সম্পূর্ণ চালু করা হয়।

২৪ জুলাই, বুধবার

আন্তঃজেলা বাস ও লঞ্চ চলাচল আংশিকভাবে চালু রয়েছে। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পরিষেবা পুনরায় চালু করা হয়। এদিকে কোটা সংস্কার আন্দোলনের প্ল্যাটফর্ম 'বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন'-এর তিন সমন্বয়কারীকে পাঁচ দিন ধরে নিখোঁজ থাকার পর পাওয়া যায়। আসিফ মাহমুদ, আবু বাকের মজুমদার এবং রিফাত রশিদকে ১৯ জুলাই অজ্ঞাত ব্যক্তিরা তুলে নিয়েছিল। আসিফ এবং বাকের দুজনেই ফেসবুকে পোস্ট করেছিলেন যে, পাঁচ দিন তাদের চোখ বেঁধে রাখা হয়েছিল। রাজধানীর হাতিরঝিল এলাকায় আসিফ মাহমুদকে এবং ধানমন্ডি এলাকায় আবু বকরকে চোখ বেঁধে ছেড়ে দেয়া হয়।

২৫ জুলাই, বৃহস্পতিবার

জাপা নেতা আন্দালিব রহমান পার্থ, ব্যবসায়ী ডেভিড হাসনাত সহ আরও ডজন খানেক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সোশ্যাল মিডিয়া বন্ধ রাখা হয়। জাতিসংঘ,

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ক্র্যাকডাউন বন্ধ করার আহ্বান জানায়। সেনা মোতায়েনের পর হাসিনা প্রথম জনসমক্ষে উপস্থিত হন এবং একটি ক্ষতিগ্রস্ত মেট্রো রেল স্টেশন পরিদর্শন করেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও তিনজন মারা যান, মৃত্যুর সংখ্যা ২০৪ জনে দাঁড়ায়। শুক্রবার ও শনিবার সপ্তাহান্তে ৯ ঘণ্টার জন্য কারফিউ শিথিল করা হয়। অ্যামনেস্টি বলেছে যে, পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ওপর প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করেছে।

২৬ জুলাই, শুক্রবার

গোয়েন্দা পুলিশ ছাত্র আন্দোলনের তিনজন সংগঠককে তুলে নিয়ে যায়। সরকার উৎখাতের ডাক দেয় বিএনপি। শেখ হাসিনা সহিংসতায় আহতদের দেখতে হাসপাতালে যান। সারা দেশে ‘ব্লক রেইড’ শুরু। অন্তত ৫৫৫টি মামলা হয়েছে এবং ৬,২৬৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কারফিউ ঘোষণার পর জনসমক্ষে হাজির হওয়ার দ্বিতীয় দিনে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন করেন হাসিনা। জাতিসংঘ ক্র্যাকডাউন বন্ধ এবং ইন্টারনেট পরিষেবা সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধারের আহ্বান জানিয়েছে।

২৭ জুলাই, শনিবার

বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে ব্লক রেইড, বেশিরভাগ ছাত্র, অব্যাহত রয়েছে। ডিএমপির গোয়েন্দা শাখা আরও দুই সমন্বয়কারী সারজিস আলম ও হাসনাত আব্দুল্লাহকে হেফাজতে নেয়া হয়। তাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা দিতে এবং সাম্প্রতিক ঘটনা সম্পর্কে জানতে তাদের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে বলে জানায় ডিবি কার্যালয়।

গত ১১ দিনে মোট ৯,১২১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর মধ্যে শুধু রাজধানীতেই গ্রেফতার হয়েছেন ২ হাজার ৫৩৬ জন। ঢাকায় ১৪টি পশ্চিমা দেশের কূটনৈতিক মিশন একটি যৌথ চিঠি জারি করে, যাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অন্যায় কাজের জন্য জবাবদিহি করতে বলা হয়। ছাত্র আন্দোলনের আরও দুই সংগঠককে আটক করেছে গোয়েন্দা শাখা। শিক্ষার্থীদের গ্রেপ্তারে পুলিশ অভিযান অব্যাহত রেখেছে।

জুলাই ২৮, রবিবার

কোটা সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক নুসরাত তাবাসসুমকে হেফাজতে নেয় ডিবি। পরে রাত ৯টার দিকে ডিবি কার্যালয়ে রেকর্ড করা একটি ভিডিও

গণমাধ্যমে পাঠানো হয় যেখানে আগে হেফাজতে নেওয়া ছয় সমন্বয়কারী সব কর্মসূচি প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়ে একটি লিখিত বিবৃতি পড়ে শোনান। তবে, তিন সমন্বয়কারী - মাহিন সরকার, আব্দুল কাদের এবং আব্দুল হান্নান মাসুদ - বলেছেন যে, ডিবি হেফাজতে থাকা ছয় সমন্বয়কের ভিডিও বার্তাটি বিক্ষোভকারীদের আসল অবস্থান নয়। সমন্বয়কারীদের ডিবি কার্যালয়ে জিম্মি করা হয়েছিল এবং বার্তা পড়তে বাধ্য করা হয়েছিল।

দেশব্যাপী ক্র্যাকডাউন চলছে, শুধুমাত্র ঢাকা শহরে ২০০ টিরও বেশি মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছে ২.১৩ লাখেরও বেশি লোক। ১০ দিন পর মোবাইল ইন্টারনেট ফিরে এসেছে, কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া বন্ধ রয়েছে। সরকার প্রথমবারের মতো মৃতের সংখ্যা ১৪৭ বলে জানিয়েছে।

২৯ জুলাই, সোমবার

জামায়াত-শিবিরকে নিষিদ্ধ করার ঘোষণা দেয় সরকার। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের সাথে খাওয়ার ছবি শেয়ার করাসহ ছয় কোটা সংগঠককে উপস্থাপন করা নিয়ে ডিবিকে তিরস্কার করেছে হাইকোর্ট। সারা বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা 'নিপীড়ন বিরোধী শিক্ষক সমাবেশ' ব্যানারে ছাত্র হয়রানি ও গণগ্রেফতার বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন। তারা আটক শিক্ষার্থীদের মুক্তির দাবি জানান এবং চলমান শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন।

সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে সাম্প্রতিক কোটা সংস্কার আন্দোলনে নিহত শিক্ষার্থীদের স্মরণে এক মুহূর্ত নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়, যাকে শিক্ষকরা 'জুলাই গণহত্যা' হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে সহিংসতায় নিহতদের স্মরণে মঙ্গলবার শোক দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয়। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন সরকার ঘোষিত শোক দিবস প্রত্যাখ্যান করে। পাল্টা পদক্ষেপে, তারা একটি অনলাইন প্রচারণা ঘোষণা করে, তাদের মুখ এবং চোখের চারপাশে লাল ব্যান্ড দিয়ে ছবি পোস্ট করে।

৩০ জুলাই, মংগলবার

যারা সহিংসতায় প্রাণ হারিয়েছে তাদের স্মরণে সরকার একটি 'শোক দিবস' পালন করে, কিন্তু ছাত্ররা দিনটিকে প্রত্যাখ্যান করে। ছাত্র আন্দোলনের সমর্থকরা তাদের প্রত্যাখ্যান দেখানোর জন্য তাদের সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল লাল করে দেয় এবং রাজধানীতে, অন্যান্য স্থানে বিক্ষোভ করে।

কোটা আন্দোলনের ছয় সংগঠক এখনও ডিবির হেফাজতে। সহ পরীক্ষার্থীদের পুলিশ হেফাজত/জেল থেকে মুক্তি না দিলে শত শত এইচএসসি শিক্ষার্থী পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দেয়। পুলিশের বাধার মুখে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের মৌন মিছিল করে, বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সমাবেশ করে, অভিভাবকরা শিশুদের মৃত্যুর প্রতিবাদ জানায়। প্রাণহানির জন্য সরকারকে দায়ী করেছেন বিশিষ্ট নাগরিকরা। হাসিনা বলেছেন যে, সরকার বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য 'বিদেশী সহায়তা' নেবে এবং পরের দিন দেশব্যাপী শোক ঘোষণা করেছে। পুলিশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

৩১ জুলাই, বুধবার

হত্যা, গণগ্রেফতার, হামলা, মামলা, জোরপূর্বক গুম এবং ছাত্র ও নাগরিকদের হত্যার প্রতিবাদে সারাদেশে ছাত্ররা 'মার্চ ফর জাস্টিস' নামে প্রতিবাদ করেছে। দুপুর সোয়া ১টার দিকে বুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা হাইকোর্টের দিকে মিছিল করে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কাছে পুলিশ তাদের অগ্রগতি বন্ধ করে দেয়। ফলে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় ছাত্ররা দোয়েল চত্বরে জড়ো হয়। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হোয়াইট প্যানেলের শিক্ষকরাও যোগ দেন। প্রায় তিন ঘণ্টা বিক্ষোভের পর বিকেল ৩টার দিকে ঢাকায় বিক্ষোভ শেষ হয়। সকাল ১১টা নাগাদ বিক্ষোভকারীরা চট্টগ্রাম আদালত চত্বরে জড়ো হতে শুরু করে। পুলিশ ব্যারিকেড সত্ত্বেও, প্রায় ২০০ জন বিক্ষোভকারী চত্বরে প্রবেশ করে এবং অবস্থান নেয়। ৫০ থেকে ৬০ জন বিএনপিপন্থী আইনজীবী ছাত্রদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন। অন্যদিকে আওয়ামী লীগপন্থী আইনজীবীরা পাল্টা মিছিল করেন। বেলা সোয়া ৩টার দিকে আদালত চত্বর থেকে নিউমার্কেট মোড় পর্যন্ত একটি পদযাত্রার মধ্য দিয়ে চট্টগ্রামে বিক্ষোভ শেষ হয়।

বিক্ষোভের অংশ হিসেবে দুপুর ১২টা ২০ মিনিট থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। বিক্ষোভ চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ শিক্ষার্থীকে আটক করে পুলিশ। ১৩ দিন বন্ধ থাকার পর বিকেল ৩টায় ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপসহ অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলো আবার খুলে দেওয়া হয়। সরকার নিহতদের জন্য 'শোক দিবস' পালন করে কিন্তু ছাত্ররা তা প্রত্যাখ্যান করে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন অংশীদারিত্ব নিয়ে আলোচনা স্থগিত করে।

১ আগস্ট, বৃহস্পতিবার

সরকার জামায়াতে ইসলামী দল এবং এর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবিরের পাশাপাশি এর সহযোগী সংগঠনগুলোকে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের অধীনে নিষিদ্ধ করে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে। জাতিসংঘ সহিংসতা তদন্তে একটি স্বাধীন ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং দল পাঠানোর প্রস্তাব দেয়। আন্দোলনের ছয় সংগঠককে পুলিশ হেফাজত থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। বিক্ষোভকারীরা নিহতদের জন্য গণ মিছিল ও প্রার্থনা করে। পাঁচটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ সমাবেশ করে।

২ আগস্ট, শুক্রবার

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে জুমার নামাজের পর 'প্রার্থনা ও ছাত্র-জনতার গণমিছিল' কর্মসূচি পালিত হয়। ২৮ জেলায় এ কর্মসূচি পালিত হয়। বিক্ষোভকারীরা হত্যার প্রতিবাদ অব্যাহত রেখেছে; হাজার হাজার মানুষ বিচারের জন্য মিছিলে যোগ দেয়। রাজধানীসহ অন্যত্র আ.লীগ নেতাকর্মী ও পুলিশের হামলায় বিক্ষোভকারীরা আরও দুজন নিহত হন। বিক্ষোভকারীরা আগামী দিনের জন্য দেশব্যাপী বিক্ষোভ এবং ৪ আগস্ট থেকে অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দেয়। সাত ঘণ্টার জন্য আবারও বন্ধ হয়ে গেল ফেসবুক। ডিবি হেফাজতে থাকা ছয় সংগঠক বলেন, ডিবি অফিস থেকে প্রত্যাহারের বিবৃতি স্বেচ্ছায় দেননি। চলমান সহিংসতা ও নাশকতার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট মামলায় গ্রেপ্তার ৭৮ এইচএসসি পরীক্ষার্থী সারাদেশের বিভিন্ন আদালত থেকে জামিন পান। তাদের মধ্যে ঢাকা বিভাগের ৫৫ জন, চট্টগ্রাম বিভাগের ১৪ জন, খুলনা বিভাগের ছয়জন এবং রংপুর বিভাগের তিনজন রয়েছেন। এদিকে, শিশু ও সংস্কৃতি বিষয়ক জাতিসংঘের সংস্থা, ইউনিসেফ, জুলাই মাসে বাংলাদেশে ২০২৪ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনকে ঘিরে বিক্ষোভের সময় কমপক্ষে ৩২ শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে। ইউনিসেফের দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক সঞ্জয় উইজেসেকেরা শিশুরা যাতে আবার স্কুলে ফিরে আসে তা নিশ্চিত করতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান।

৩ আগস্ট, শনিবার

কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী নাহিদ ইসলাম ঘোষণা করেন যে তাদের সরকারের সাথে আলোচনার কোন পরিকল্পনা নেই এবং হাসিনার পদত্যাগ এবং 'সবার কাছে গ্রহণযোগ্য' একজন ব্যক্তির নেতৃত্বে 'জাতীয় সরকার' গঠনের দাবিতে লংমার্চ

টু ঢাকা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। হাসিনা আলোচনার প্রস্তাব দিলেও ছাত্ররা তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে, প্রধান সমন্বয়কদের একজন নাহিদ ইসলাম শহীদ মিনারে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন, যেখানে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার মন্ত্রিসভার পদত্যাগের জন্য একক দাবি ঘোষণা করে এবং আহ্বান জানায়। গত ৪ আগস্ট থেকে ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলন যা কোটা আন্দোলনের অবসান ঘটিয়েছে। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে রাজশাহীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা মিছিল করে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) সামনে জড়ো হয়ে স্লোগান দেয়। একক দাবিতে রাজপথে নেমেছে শিক্ষার্থীরা: প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ।

চট্টগ্রামে শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরীর বাসায় হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ সময় বাড়ির সামনে পার্কিং করা দুটি গাড়ি ভাঙচুর এবং একটিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এর আগে বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে লালখান বাজারে চট্টগ্রাম-১০ আসনের সংসদ সদস্য মহিউদ্দিন বাচ্চুর কার্যালয়েও হামলা হয়। হামলার সময় অফিসে আগুন দেওয়া হয়। অপর একটি ঘটনায় গাজীপুরের শ্রীপুরে পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন। সিলেটে পুলিশের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের সংঘর্ষে অন্তত শতাধিক মানুষ আহত হয়েছে। দুপুর দেড়টার দিকে কুমিল্লার রেসকোর্সে ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাকর্মীরা ছাত্র আন্দোলনের আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালায় এবং শিক্ষার্থীদের ওপর প্রকাশ্যে গুলি চালায়, এতে ১০ জন শিক্ষার্থী গুলিবিদ্ধ হয় এবং মোট ৩০ জন আহত হয়। আহত হচ্ছে বগুড়ায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এই সংঘর্ষ চলে প্রায় দুই ঘণ্টা। সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল, সাউন্ড গ্রেনেড, রাবার বুলেট ও শটগানের রাউন্ড নিক্ষেপ করে। নগরীর সাতমাথা, সার্কিট হাউস মোড়, রোমেনা আফাজ রোড, কালীবাড়ি মোড়, বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল বাকী সড়ক, জেলখানা মোড়সহ বেশ কয়েকটি এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এতে অন্তত ছয়জন শিক্ষার্থী গুলিবিদ্ধ হন এবং আরও পঞ্চাশজন শিক্ষার্থী আহত হন।

৪ আগস্ট, রবিবার

সরকার পদত্যাগের এক দফা দাবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা সর্বাত্মক অসহযোগ কর্মসূচির প্রথম দিনে সারা দেশে ২১ জেলায় ব্যাপক সংঘাতের খবর। ১১৪ জনের মৃত্যু। নিহতদের মধ্যে সিরাজগঞ্জে গণপিটুনিতে নিহত ১৩

পুলিশ সদস্য রয়েছে। বিক্ষোভকারীরা এবং পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়, যখন বিক্ষোভকারীরা প্রধান মহাসড়ক অবরোধ করে। পুলিশ স্টেশনের পাশাপাশি আওয়ামী লীগের কার্যালয়কে লক্ষ্য করে আন্দোলনরত ছাত্র-জনতা। পুলিশ বাহিনী কাঁদানে গ্যাস ছুড়েছে এবং রাবার বুলেট ছুড়েছে বলে দাবি করেছে যদিও কিছু লোক প্রকৃত বুলেটে আহত ও নিহত হয়েছে। নতুন করে বিক্ষোভের ফলে সরকার ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয় এবং সন্ধ্যা ৬টা থেকে দেশব্যাপী অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ ঘোষণা করে।

সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীরা দেশের সব প্রান্ত থেকে ঢাকায় পদযাত্রা করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। সেনাবাহিনী ও পুলিশ জনগণকে কারফিউ না ভাঙতে বা আইন লঙ্ঘন না করার আহ্বান জানায়।

সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল ইকবাল করিম ভূঁইয়া সেনা প্রত্যাহারের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান এবং হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানান। বর্তমান সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান বলেছেন, সশস্ত্র বাহিনী সর্বদা জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে।

আগস্ট ৫, সোমবার

'মার্চ টু ঢাকা' ডাকে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার শিক্ষার্থী ও দেশবাসী রাজধানী অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। দুপুর নাগাদ ভিড় ভিড় করে হাসিনার সরকারি বাসভবনে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ কারফিউ অমান্য করে রাজধানীর কেন্দ্রে একত্রিত হয়। অবশেষে শেখ হাসিনা ইন্ডিয়ায় পালিয়ে যান। সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের ঘোষণা।

চেকলিস্ট ৪- শহীদদের তথ্য সংগ্রহকারীদের অনুভূতি

মো: কামরুজ্জামান

প্রতিবার শহীদ পরিবারের সাক্ষাৎকার নিতে যাওয়ার সময় মনে হতো, ইশ! তাদের মুখোমুখি যদি হতে না হতো! সাক্ষাতকারের সময় মনে হতো, আমার করা প্রতিটি প্রশ্ন যেন তাদের মনের ব্যথা নতুন করে জাগিয়ে তুলছে। প্রত্যেক শহীদের বাবা-মায়ের চোখের পানি আর হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস আমার ভেতরে এক অসীম শূন্যতা ও হাহাকার সৃষ্টি করত।

শহীদ ভাইদের ঘটনাগুলো লিপিবদ্ধ করার সময় মনের অজান্তে কখন যে চোখ ভিজে যেত! নিজেকে এতো অসহায় মনে হতো। চোখের সামনে শহীদদের মায়ের দীর্ঘশ্বাসগুলো ভেসে উঠত। মহান আল্লাহ তাআলা শহীদদের জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন, শহীদ পরিবারের সদস্যদের ধৈর্য ধারণের তাওফিক দিন এবং আমাদের এই সামান্য প্রচেষ্টাটুকু কবুল করুন। আল্লাহ, এই ভূখণ্ডের মুসলমানসহ দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানকে নিরাপত্তার চাদরে আবৃত করুন।

এই কাজে যার নির্দেশনা, অনুপ্রেরণা ও পরামর্শ সবচেয়ে বেশি ছিল, তিনি আমাদের শ্রদ্ধেয় সরোয়ার স্যার। সত্যি কথা বলতে, সরোয়ার স্যারের একান্ত আগ্রহ ও উদ্যোগ ছাড়া এই বইটি কখনো আলোর মুখ দেখত না। স্যার এত ব্যস্ততার মাঝেও তিন মাসের বেশি সময় ধরে আমাদের কাজের প্রতিটি দিক তদারকি করেছেন। সাক্ষাৎকারের প্রশ্ন তৈরি করা থেকে শুরু করে বই প্রকাশনা পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে তিনি সরাসরি তদারকি করেছেন। লেখাগুলো প্রাথমিকভাবে লেখার পর, তিনি প্রতিটি লেখা দীর্ঘ সময় ধরে লাইন বাই লাইন দেখে সংশোধন করেছেন।

স্যার যদি আমাকে এই কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ করে না দিতেন, তাহলে এমন মহৎ একটি কাজ হয়তো কোনোদিনই আমি করতে পারতাম না। উদ্দেশ্যহীনভাবে কাজটি করার সংকল্প হয়তো গ্রহণ করতাম; কিন্তু অলসতা ও অজুহাতে কাজটি

হয়তো সম্পন্ন করা হতো না। তাই স্যারের আন্তরিক ও অব্যাহত তদারকি আমার জন্য অমূল্য অনুপ্রেরণা হয়ে কাজ করেছে। আল্লাহ তাআলা স্যারকে হায়াতে তাইয়্যেবা দান করুন, সুস্থতার জীবন ও ইমানি জিন্দেগি দান করুন। স্যার আমাদের দেশের জন্য এক নিয়ামত। আল্লাহ, স্যারের মাধ্যমে আমাদের আরও বেশি উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। স্যার ও তার পরিবারকে নিরাপদ, সুখী ও কল্যাণময় জীবন দান করুন। মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ সাহেবের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাই। কাজ করার সময় মাঝে মাঝে তার কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছি, যা আমাকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

মো: নাহিদ হাসান সজীব

জুলাইকে খুব কাছে থেকে দেখেছি। আন্দোলনের প্রতিটি রাত নির্ঘুম রাত পার করেছি।খুব কাছে থেকে দেখেছি পুলিশের গুলিতে আমার ভাইদের মৃত্যু। ১৬জুলাই থেকে ৫আগস্ট প্রতিদিন রংপুরের মাটিতে শহীদ হওয়ার স্বপ্নে আন্দোলনে গিয়েছি। রব আমাকে শহীদ হওয়ার জন্য হয়তো মনোনীত করেননি। তবে আমার ভাইদের রক্ত দেখিয়ে আমাকে করেছেন অসীম সাহসের অধিকারী।

আন্দোলনে আম্মু এবং আপু কোন ভাবেই যাইতে দিতো না। চুপ করে পালিয়ে লালমনিরহাটের বাসা থেকে রংপুর শহরে যেতাম আন্দোলনে যোগ দেয়ার জন্য। আপু বলতো তুমি হুজুর মানুষ তুমি যদি যাও এভাবে মাথায় টুপি আর শরীরে জুব্বা জরিয়ে তাহলে তোমাকে জঙ্গি, শিবির ট্যাগ দিয়ে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে রাখবে। পরিবারের হাজার বাধা উপেক্ষা করে যেতাম আন্দোলনে। কারন আমি জানতাম–এই পথই একমাত্র জালিমের হাত থেকে মুক্তির পথ।

আন্দোলনে পুলিশে রাবার বুলেট বা ছররা গুলির আঘাতে যখন কেউ আহত হতো, আন্দোলনরত অন্যান্য শিক্ষার্থীরা যেন সে আহত শিক্ষার্থীর পাশে নিজের পরিবারের আপনজন হয়ে দাড়াতো। আন্দলনে রংপুরে প্রতিদিন জমায়ত ছিলো ২০-৩০হাজার শিক্ষার্থীর। মুখ গুলো অপরিচিত হলেও যেন পরিচত মনে হতো আমার সেই সহযোদ্ধাদের।১৮ তারিখ রংপুর মর্ডান মোড় থেকে একটু সামনে বেশ কয়েকটা রাবার বুলেট এসে আমার মুখে এবং মাথায় লাগে মাটিতে পরে গেলে তৎক্ষণাৎ টিয়ার সেল এসে আমার সামনে মুখের কাছেই পরে।প্রচন্ড অসুস্থ হয়ে পড়ি। এক পর্যায়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। জ্ঞান ফেরার পর দেখতে পারি ২০-৩০জন ভাই আমাকে পাশের এক বাসায় নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে আমাকে সুস্থ

করে তুলছে। তখন মনে মনে বলে উঠলাম— আমাদের ভাইয়েরা সত্যি বিজয়ের সন্নিকটে অবস্থান করছে।

৫ আগস্ট কাঙ্খিত বিজয় অর্জনের পর শহীদের হিসাব গিয়ে দাঁড়ালো ১৬০০+। ড.সরোয়ার হোসেন স্যার একদিন মাগরিবের পর গ্রুপ মিটিংয়ে বললেন শহীদদের নিয়ে কাজ করতে চাও তোমরা? মিটিংয়ে উপস্থিত চার জনেই বলে উঠলাম জ্বী স্যার। শহীদদের নিয়ে কাজ করা দরকার। আমরা তো জীবন দিতে পারিনি। অন্তত আমাদের ভাইদের জীবনের প্রকৃত ইতিহাস এ জাতির জানা দরকার এবং আগামী প্রজন্ম যেন জানতে পারে আওয়ামীলীগের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গেলে নিরস্ত্র আমাদের ভাইদের তারা কিভাবে মেরে ফেলেছে।

কয়েকদিনের মধ্যে ঢাকায় এসে স্যারের সাথে মিটিং করে প্রজেক্ট শুরু করলাম আমি এবং কামরুজ্জামান। পুরো প্রজেক্টের টাকা স্যার নিজের পকেট থেকে ব্যায় করেছেন। প্রথম ধাপে আমরা বেশ কিছু শহীদ পরিবারের সাথে দেখা করেছি। শহীদদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে অনুভব করেছি, কিছু ব্যথা থাকে যা শব্দে প্রকাশ করা যায় না, কিছু কান্না থাকে যা চোখে দেখা যায় না। কিবোর্ডে টাইপ করার সময় কখনো থমকে গেছি, কখনো এতটাই আবেগে ভেসেছি যে গল্প টাইপ করার বদলে শুধু চোখের পানি ঝরেছে। শহীদদের মায়েদের দীর্ঘশ্বাস যেন আমার হৃদয়ে প্রবাহিত হয়েছে, প্রতিটি শব্দের মাঝে তাদের ব্যথা অনুভব করেছি। মনে হয়েছে, আমি কেবল লিখছি না, বরং একেকটি হাহাকারের প্রতিধ্বনি তুলছি। প্রত্যেকটি সাক্ষাৎকার নিতে যাওয়ার সময় বুকের ভেতর এক ধরনের চাপা যন্ত্রণা কাজ করত। প্রশ্ন করার আগেই মনে হতো—ইশ! যদি এই প্রশ্নটা এড়ানো যেত, যদি তাদের পুরনো ক্ষত নতুন করে জাগিয়ে তুলতে না হতো! কিন্তু সত্য তুলে ধরার দায়িত্ব যখন নিয়েছি, তখন শহীদদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই তুলে ধরতে হবে। সেই সত্য যতই বেদনাদায়ক হোক, আমি জানতাম—একদিন এটাই ইতিহাসের উজ্জ্বল সাক্ষ্য হয়ে থাকবে। মাঝেমাঝে মনে হতো, আমি আর আমার লেখা আলাদা নেই—আমি যেন শহীদদের মধ্যেই হারিয়ে গেছি। তাদের জীবনের গল্প শুনতে শুনতে মনে হতো, তারা আমার খুব চেনা কেউ, আমার আশপাশেই তারা আছে, তাদের কথা বলছে, তাদের স্বপ্নের কথা শুনিয়ে যাচ্ছে। তাদের আত্মত্যাগের গভীরতা বুঝতে গিয়ে আমি নিজেই যেন নতুন করে নিজেকে আবিষ্কার করছিলাম।

আরেকটি অদ্ভুত অনুভূতি কাজ করত—তাদের চরিত্রের উচ্চতা দেখে নিজের দিকেই প্রশ্ন ছুড়তাম। তাদের সাহস, দেশপ্রেম, সততা, ধৈর্য—এসব দেখে মনে

হতো, আহা! এই গুণগুলো তো আমার নেই! এগুলো কি আমার থাকা উচিত ছিল না? তাহলে কি আল্লাহ তাদের এই মহৎ গুণের কারণেই বেছে নিয়েছেন? তাদের নিয়ে লিখতে লিখতে কখনো কখনো মনে হতো, শহীদ হওয়া কি কোনো সৌভাগ্যের বিষয়? আল্লাহ কি তাদের তার কাছের বানিয়ে নিয়েছেন কারণ তারা সত্যিকার অর্থেই শ্রেষ্ঠ ছিলেন?

এই বইটি লেখা আমার জন্য শুধু একটি প্রজেক্ট ছিল না, এটি ছিল এক গভীর যাত্রা—একটি আত্মিক উপলব্ধি, একটি বেদনাময় সাধনা। বইটি লেখা মোটেও সহজ ছিলো না, শুধুমাত্র স্যারের ইচ্ছে শক্তি আমাকে শক্তি জুগিয়েছে এই বইটিতে কাজ করতে। আল্লাহ যেন শহীদদের মা-বাবাকে ধৈর্য ধরার শক্তি দেন, তাদের হৃদয়ের ব্যথা লাঘব করেন, আর আমাদের এই শহীদদের আত্মত্যাগ থেকে শিক্ষা নেওয়ার তৌফিক দান করেন।

অন্তর সফিউল্লাহ

চৌঠা আগস্ট, রুমমেট ফরহাদ নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের ছোড়া বুলেটে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মাগুরা শহরের পারনাদুয়ালিতে শহীদ হয়। তবে তার মৃত্যুর সংবাদ জানতে পারি স্বৈরাচারী হাসিনার পতনের দিন। তখন থেকেই শহীদদের জন্য কিছু করার তীব্র তাড়না অনুভব করি। নূর কাইয়ূম ভাইয়ের সাথে পরামর্শ করলে তিনি বলেন, 'বই লিখো।' কিন্তু আমার মতো আনাড়ি বই কীভাবে লিখবে?

দীর্ঘ এক মাস পর, সেপ্টেম্বরে ক্যাম্পাসে এসে 'বিআরএফ ইয়ুথ ক্লাব'-এর সাথে যুক্ত হই। ক্লাবের মাধ্যমে ড. মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন স্যারের সাথে পরিচয় হয়। স্যার আমাকে 'ডকুমেন্টেশন টিম' গ্রুপে যুক্ত করেন। সিয়াম স্যারকে অবগত করে যে, আমি তিন বছর ধরে ক্যাম্পাসে 'চবিয়ান ইসলামী পাঠাগার' পরিচালনা করছি। এরপর আমি, সিয়াম, নাহিদ ভাই ও কামরুজ্জামান ভাই—সবাই স্যারের তত্ত্বাবধানে পথচলা শুরু করি।

দীর্ঘ চার মাসেরও অধিক সময় ধরে আমাদের টিম স্যারের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করে। ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষার মাঝেও সাক্ষাৎকারের জন্য কক্সবাজারের পেকুয়া, নেত্রকোনার দুর্গাপুর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম শহরে যেতে হয়েছে। গল্প লিখতে গিয়ে কতবার যে অশ্রুসিক্ত হয়েছি, তার কোনো ইয়ত্তা নেই! শহীদদের জীবনের কত আশা-আকাঙ্ক্ষা, মায়ের প্রতি অগাধ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার গল্প আমাকে বারবার বাবার প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে। তবে মাঝে মাঝে অলসতা চেপে

বসতো। অলসতা দেখে একদিন স্যার জানালেন, 'নির্ধারিত তারিখ (ডেডলাইন) পার হলে কোনো গল্প বইয়ে রাখা হবে না।' স্যারের সেই কথা রিমাইন্ডার হিসেবে কাজ করত, আবারো উজ্জীবিত হতাম। এভাবেই শেষ পর্যন্ত কোনো রকম টিকে ছিলাম। আমাদের মতো আনাড়িদের ঘষে-মাজা করে একটি স্বতন্ত্র পরিচয় দেওয়ার জন্য স্যারের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ।

আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করেও শেষ হবে না—আমার মতো অধমকে তিনি ভালো কাজের অংশীদার করেছেন। আমার সবটুকু প্রচেষ্টা আল্লাহ কবুল করুন। যদি শহীদের গল্পগুলো কারও জীবনের পরিবর্তনের নিয়ামক হয়, তবে আমার 'আম্মা-আব্বার' আমলনামা ভারী হোক—এটাই চাওয়া।

সংকলক

ড. মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন ১৯৭৬ সালে জামালপুর জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রামে (ঘোষেরপাড়া, মেলান্দহ) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গত ২৪ বছরের অধিক সময় ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা এবং বায়োমেডিক্যাল ও জনস্বাস্থ্য সেক্টরে গবেষণার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। তিনি ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইক্রোবায়োলজি বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। ড. হোসেন National University of Singapore-এ পিএইচডি গবেষণা সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে তিনি DUKE-NUS Graduate Medical School এবং Singapore Cancer Centre-এ পোস্টডক্টরাল রিসার্চ ফেলো হিসেবে কাজ করেন। প্রবাসে এক যুগের বেশী সময়ের রিসার্চ ট্রেইনিং শেষে তিনি বাংলাদেশে ফিরে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। এরপর তিনি ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে বায়োটেক ডিভিশনের সিনিয়র ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (আইইউবি)-এর স্কুল অব এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড লাইফ সায়েন্স-ডিসিপ্লিনে সহযোগী অধ্যাপক। ইউনিভার্সিটি অব ওলংগং (অস্ট্রেলিয়া)-এ অনারারী সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে জড়িত আছেন। ড. হোসেন গত ১২ বছর ধরে থ্যালাসেমিয়া, শিশুদের স্থূলতা, ডেঙ্গু, এবং ক্যান্সারের মতো অবহেলিত জনস্বাস্থ্য সমস্যাগুলোর প্রতিরোধ নিয়ে গবেষণা করছেন। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ, এবং সামাজিক মূল্যবোধ বিষয়ে তিনি গত ২৮ বছর ধরে গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লেখালেখির মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করছেন। করোনা মহামারির সময় তিনি জনপ্রিয় গণমাধ্যম এবং টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নীতিনির্ধারণ আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ড. হোসেন তিনটি বইয়ের লেখক: 'সন্তান প্রতিপালনে এ যুগের চ্যালেঞ্জ', 'বিসিএস নাকি বিদেশে উচ্চশিক্ষা?' এবং 'সমতার আড়ালে সমকামিতা মিশন'।

জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানে ১,৫০০-এর বেশি ছাত্র-জনতা প্রাণ দিয়েছেন। অন্ধত্ব ও পঙ্গুত্বসহ আহত হয়েছেন অন্তত ১৯,০০০ মানুষ। এই বইতে ২৭ জন শহীদের জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো প্রত্যক্ষদর্শীদের তথ্যের আলোকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। শহীদদের দুর্লভ ছবি ও ভিডিও ক্লিপ QR কোডের মাধ্যমে সংযুক্ত করা হয়েছে। এত প্রাণ ও রক্তের বিসর্জনের অনুপ্রেরণা কী ছিল শহীদদের?

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও কলোনাইজারদের বিরুদ্ধে লড়াই করে টিকে থাকা এই ব-দ্বীপের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠী কয়েক শত বছর ধরে রক্ত ও প্রাণ বিসর্জন দিয়ে আসছে। এই জনপদের মানুষ যুগের পর যুগ ইংরেজদের শোষণ ও দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে—বুলেটের বিপরীতে বাঁশের লাঠি হাতে নিয়ে ইতিহাস রচনা করেছে। অসংখ্য প্রাণ ও রক্তের বিনিময়ে ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম হয়। মুসলিম পরিচয় শুধুই রাষ্ট্রগঠনের ভিত্তি ছিল না; এটি একটি ঐতিহাসিক প্রতিরোধের চেতনার প্রতিফলন।

এত ত্যাগের বিনিময়ে মানুষের চাওয়া ছিল সামান্যই; ইনসাফ (মুসলিম হিসেবে অধিকার, সুবিচার, সুশাসন) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এমন এক সমাজ, যেখানে তারা স্বাধীনভাবে জীবন-জীবিকা গড়তে পারবে এবং নিজেদের মানোন্নয়নে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হবে। কিন্তু নতুন দেশেও সাধারণ মুসলমানদের স্বপ্নভঙ্গ ঘটে। ক্ষমতা-কেন্দ্রিক রাজনীতির কারণে ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন, ভারতবেষ্টিত পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) মানুষ জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে নানাভাবে বৈষম্যের শিকার হয়। এরই ফলশ্রুতিতে, অনেক মানুষের আত্মত্যাগের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে এই জনপদ নতুন দেশ হিসেবে স্বাধীনতা অর্জন করে।

ইনসাফের দাবিতেই জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আবু সাঈদরা বুলেটের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে রচনা করেন নতুন এক অধ্যায়। হাজারো ছাত্র-জনতার রক্ত ও প্রাণের বিনিময়ে ৫ আগস্টে আবারও জেগে ওঠে এক নতুন স্বপ্ন। এত ত্যাগের পরও কি সেই স্বপ্ন, সেই ইনসাফ ভিত্তিক কাঙ্ক্ষিত সমাজব্যবস্থা আবারও অধরাই থেকে যাবে?

ISBN 978-984-3921-06-2

www.seanpublication.com